আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান

(Julkernine as Described in the Al-Quran : His Place in History)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মোঃ আবদুল হান্নান

এম.ফিল গবেষক

রেজি. নম্বর: ২১০

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০২০

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলা অনুষদ

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন, ২০২৩ খ্রি.

আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান

(Julkernine as Described in the Al-Quran : His Place in History)

(Thesis submitted for the award of the degree of M.Phil)

Researcher

Md. Abdul Hannan
M.Phil Researcher
Reg. No: 210
Session: 2019-2020
Dept. of Arabic
University of Dhaka

Supervisor

Dr. Muhammad Yousuf
Professor
Dept. of Arabic
University of Dhaka

Faculty of Art's
Dept. of Arabic
University of Dhaka

June, 2023

Dr. Mohammad Yousuf
Professor & Former Chairman
Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

الدكتور محمد يوسف
الأستاذ والرئيس السابق، قسم العربية
جامعة داكا
داكا-1000، بنغلاديش

Ref. No. …… Date…….....

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোঃ আবদুল হান্নান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান (Julkernine as Described in the Al-Quran : His Place in History)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব ও মৌলিক একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে উক্ত শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যান্ত পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করার চূড়ান্ত অনুমোদন করছি।

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

Tel: +88-02-9661920-73 Ext: 6100, 6101 Mob: +88-01718082595 E-mail: yousuf.arabic@du.ac.bd

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোঃ আবদুল হান্নান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান (Julkernine as Described in the Al-Quran : His Place in History)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব ও মৌলিক একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে উক্ত শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যান্ত পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করার চূড়ান্ত অনুমোদন করছি।

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান (Julkernine as Described in the Al-Quran : His Place in History)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এম.ফিল ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোনো অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়নি।

(মোঃ আবদুল হান্নান)
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নম্বর: ২১০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ; সমস্ত প্রশংসা ও লাখো কোটি সুজুদ সেই মহান রবের জন্য যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দুরুদ ও সালাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, যিনি মানব জাতিকে সিরাত্বাল মুস্তাকীম তথা সঠিক পথের দিশাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহ্‌লে বাইত, তাঁর আদর্শের জীবন্ত নমুনা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও যাঁরা দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ত্যাগের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

হামদ-ছানা, দরূদ ও সালাম পেশ করার সাথে সাথে সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি, যিনি আমাকে **আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান (Julkernine as Described in the Al-Quran : His Place in History)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনার তাওফীক দান করেছেন।

আমি গবেষণাপত্রটি উপস্থাপনের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞতা পেশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এর প্রতি, যারা আমাকে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন।

আমি অত্যন্ত বিনয়াবনত-চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান ড. মোহাম্মদ ইউছুফ স্যারের প্রতি, যিনি যথাযথ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে উক্ত গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহানুভূতি ও আন্তরিকতা দিয়ে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিজের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও আমার প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক এবং আমার আগ্রহের বাস্তবায়নের জন্য অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ স্বীকার ও শ্রম দিয়েছেন, নিয়মিত তদারকি করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন; সত্যিই তার তুলনা হয় না। তিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ আদ্যাপান্ত দেখে দিয়েছেন। এ গবেষণা পত্রের প্রতিটি ছত্র পাঠপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। মোটকথা এ অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছত্র তাঁর অবদানের স্বাক্ষ্য বহন করে। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুধু আজ কেন, কোনদিন তাঁর এ অবদানের ঋণ আমার পক্ষে পরিশোধ্য নয়। আমি মুহতারাম স্যার ও তাঁর পরিবারের সুস্থতা, সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত কামনা করছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক স্যারসহ অত্র বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণের প্রতি, যাঁরা আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহ যুগিয়েছেন। বিশেষ করে অত্র বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও ড. মু. নাসীর উদ্দীন স্যারের প্রতি, যারা আমাকে মূল্যবান পরামর্শ, আন্তরিক সহযোগিতা ও দু'আ করেছেন।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই আলহাজ্ব মাওলানা এ এম এম আবদুল কাদের, আলহাজ্ব মাওলানা মো: আনোয়ার হোসাইন মোল্লা, অধ্যক্ষ মো: আবু ইউসুফ, মাওলানা আ.ন.ম তাজুল ইসলাম, ড. মো: আমিনুল ইসলাম, আলহাজ্ব শাহ আলম মজুমদারসহ আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দের প্রতি, যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শিক্ষা জীবনের সকল উস্তাযকে, যাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহের কোলে বড় হয়েছি। বিশেষ করে আমি গবেষণায় এসে যাদেরকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় আদর্শবান বাবা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হানিফ, মমতাময়ী মা হাজেরা খাতুন, সহধর্মিনী ও প্রিয়তমা হাফসা আক্তার, পুত্রদ্বয় এ আর এম আবদুদ দাইয়্যান ও এ এম এম সাফওয়ান এবং কন্যাদ্বয় আতিকা হুমায়রা ও জুয়াইরিয়া আফরা এর প্রতি, যাদেরকে রেখে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরীসহ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে অবস্থান করেছি। তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতায় আমি এ মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছি। সেই সাথে মাগফিরাত ও জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান কামনা করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শশুর মাওলানা আব্দুল হাকিম, শাশুড়ি শামসুনন্নাহার এর।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আমার পরম স্নেহের ছোট বোনদের প্রতি, যারা আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতা যুগিয়েছেন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দু'আ করছি যে, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন এবং আমৃত্যু ইসলামের সঠিক পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করেন। আমীন॥

মোঃ আবদুল হান্নান

এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ পরিচিতি

অনু.	: অনুবাদ
অনূ.	: অনূদিত
আ.	: আলাইহি'স-সালাম
আল-কুরআন	: সূরা, আয়াত ০০ (প্রথম সূরার নাম, দ্বিতীয় আয়াতের সংখ্যা)
ই ফা বা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	: ইংরেজি
খ্রি.	: খ্রিস্টাব্দ
খ্রি. পূ.	: খ্রিস্ট পূর্ব
খ.	: খণ্ড
জ.	: জন্ম
ড.	: ডক্টর
ডা.	: ডাক্তার
তা. বি.	: তারিখ বিহীন
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
নং/ন.	: নম্বর
প্রাগুক্ত	: পূর্বোলিখিত/পূর্বোক্ত
পৃ.	: পৃষ্ঠা
বং	: বঙ্গাব্দ
বি. দ্র.	: বিশেষ দ্রষ্টব্য
মৃ.	: মৃত্যু
মাও.	: মাওলানা
(রহ.)	: রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
(রা.)	: রাদি আল্লাহু 'আনহু
লি.	: লিমিটেড
সম্পা.	: সম্পাদিত
সং.	: সংস্করণ/সংকলন
(সা.)	: সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম
হা. নং / হা.	: হাদিস নং
হি.	: হিজরি
Dr.	: Doctor
Ed.	: Edition
Ibid.	: Ibidem (in the same place)
N D	: No date
Op.cit.	: Opéra Citato (in the work cited)
loc. cit.	: Loco Citato (in the same place cited)
P.	: Page
P. P.	: Pages
Vol.	: Volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

অভিসন্দর্ভে অনুসৃত আরবী বর্ণমালার বাংলা

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণের নাম		বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণের নাম
ا	অ	أَلِف (আলিফ)		ض	দ	ضاد (দাদ)
ب	ব	باء (বা’)		ط	ত	طاء(তা’)
ت	ত	تاء (তা’)		ظ	য	ظاء(জা’)
ة	হ	تاء (তা’)		ع	আ	عين (‘আইন)
ث	ছ	ثاء (ছা’)		غ	গ	غين (গাইন)
ج	জ	جيم (জীম)		ف	ফ	فاء (ফা’)
ح	হ	حاء (হা’)		ق	ক	قاف (ক্বাফ)
خ	খ	خاء (খা’)		ك	ক	كاف (কাফ)
د	দ	دال (দাল)		ل	ল	لام (লাম)
ذ	য	ذال (যাল)		م	ম	ميم (মীম)
ر	র	راء (রা’)		ن	ন	نون (নূন)
ز	য	زاء (যা’)		و	ও	واو (ওয়াও)
س	ছ	سين (সীন)		ه	হ	هاء (হা’)
ش	শ	شين (শীন)		ء	অ	همزة (হাম্‌যা)
ص	স	صاد (ছাদ)		ي	ই	ياء (ইয়া’)

(উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রমও হয়েছে। যেমন- প্রচলিত নামের প্রথম অক্ষর ‘আইন হলে সেখানে (আ), (উ) ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব আরবী, উর্দু, ফার্সী ও অন্যান্য ভাষার শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষায় আত্মস্থ হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে)।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		প্রত্যয়ন পত্র	**I**
		ঘোষণা পত্র	**Ii**
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	**iii-iv**
		শব্দ সংকেত	**V**
		প্রতিবর্ণায়ন	**Vi**
		সূচিপত্র	**Vii**
		এ্যাবাস্ট্রাক্ট (সারসংক্ষেপ)	**viii-x**
ভূমিকা	**:**		**xi-xiv**
প্রথম অধ্যায়	**:**	**আল কুরআনের পরিচয়, সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস**	**০১-১৬**
প্রথম পরিচ্ছেদ		আল কুরআনের পরিচয়	০২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস	০৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	**:**	**ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পরিচিতি**	**১৭-২৮**
প্রথম পরিচ্ছেদ		ইতিহাস পরিচিতি	১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		ইসলামের ইতিহাস পরিচিতি	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	**:**	**আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন**	**২৯-৮৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ		যুলকারনাইন এর পরিচয়	৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		আল কুরআনুল কারীমে যুলকারনাইন	৪৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		আল হাদীসে যুলকারনাইন	৬৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		যুলকারনাইন এর সমকালীন ধর্মীয় ও অন্যান্য অবস্থা	৭৯
চতুর্থ অধ্যায়	**:**	**যুলকারনাইন: ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি**	**৮৮-১৪৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ		ইতিহাসের আলোকে যুলকারনাইন	৮৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		যুলকারনাইনের রাজত্বকাল ও রাজ্যের পরিধি: ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি	১২৯
পঞ্চম অধ্যায়	**:**	**যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ**	**১৪৬-১৯০**
প্রথম পরিচ্ছেদ		ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয়	১৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		কুরআন ও হাদিসে ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রসঙ্গ	১৫৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		ইয়াজুজ-মাজুজ দমনে যুলকারনাইন এর ভূমিকা	১৮১
	:	**উপসংহার**	**১৯১-১৯২**
	:	**গ্রন্থপঞ্জি**	**১৯৩-১৯৯**
	:	**পরিশিষ্ট**	**২০০-২০৪**

এ্যাবস্ট্রাক্ট

আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান

(Julkernine as Described in the Al-Quran : His Place in History)

২২০ পৃষ্ঠায় লিখিত অভিসন্দর্ভটিতে ০৫টি অধ্যায় ও ১৩টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। এতে যে সব বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পরিচয় এবং এর সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

- আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযাহ। যা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ঘটনা প্রবাহ এবং ভবিষ্যতের সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ।

- ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ইতিহাসের ভিত্তি, সূচনা-বিকাশ, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

- ইতিহাস চর্চায় আল কুরআন উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। আল কুরআনের দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো মানুষের সত্যের পাঠগ্রহণের মাধ্যম। মূল উদ্দেশ্য শিরক ও পাপাচারের ভয়াবহতা বর্ণনা এবং কাফির, মুশরিক ও অবাধ্যদের পরিণতি উপস্থাপন করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত জীবনব্যবস্থার দিকে আহবান করা।

- যুলকারনাইন এর পরিচয়, আল কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইনের বর্ণনা ও আল হাদীসে উল্লেখিত যুলকারনাইনের বর্ণনা এবং যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

- আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আল-কাহাফে 'যুলকারনাইন' এর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রাচীন আরবের একজন ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী ও শক্তিধর বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত বান্দার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তন্মধ্যে যুলকারনাইন অন্যতম।

- আল কুরআন যুলকারনাইনকে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী গুণে গুণান্বিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে পৃথিবীর কতৃত্ব, রাজত্ব ও বিভিন্ন উপায়-উপকরণ দান করেছিলেন। তিনি এসব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পরিভ্রমণের মধ্যে অন্যতম একটি দিক ছিল দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসী ইয়াজুজ-মাজুজের হিংস্রতা ও ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে সাধারণ মানুষের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করা।

- যুলকারনাইন ইবরাহিম (আ.) এর হাতে ইসলাম কবুল করেন এবং ইসমাঈল (আ.) এর সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন।

- যুলকারনাইন একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বাদশাহ। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা উপদেশ দিতেন, তিনিও সে উপদেশ গ্রহণ করতেন। তাঁকে আল্লাহ ভালবাসতেন, তিনিও আল্লাহকে ভালবাসতেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করতেন। তিনি তাঁর শাসনাধীন রাজ্যসমূহে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

- ইতিহাসের আলোকে যুলকারনাইনের অবস্থা উল্লেখসহ যুলকারনাইনের রাজত্বকাল ও রাজ্যের পরিধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

- যুলকারনাইন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ের আরব ও অনারবের সকল রাজা, বাদশাহ তাঁর অনুগত ছিলেন। তিনি মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সকল জাতির ভাষাজ্ঞান ছিল। তিনি যখন কোন জাতির সাথে যুদ্ধ করতেন তাদের ভাষায় তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হতেন।

- ইয়াজুজ-মাজুজ পরিচিতি, কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইয়াজুজ-মাজুজ এবং ইয়াজুজ-মাজুজ দমনে যুলকারনাইনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

- যুলকারনাইনের পূর্ণ জীবনই ছিল আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের পথে মেহনত, মানব-সেবা, ত্যাগ ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবনপথের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ৫শ বছর রাজত্ব করার পর দুমাতুল জান্দাল নামক জায়গায় তিনি ইন্তিকাল করেন। দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত তাঁর লোহা-তামার সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত প্রাচীর অনন্ত কাল ধরে তাঁর স্মৃতির সাক্ষী হয়ে থাকবে।

সর্বোপরি, এটি একটি জ্ঞান গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক বিষয়। আধুনিক ইতিহাসে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে যুলকারনাইন সম্পর্কে অনেক তথ্য, উপাত্ত ও অজানা তথ্যের উন্মেষ ঘটানো হয়েছে। যুলকারনাইনের পরিচয়, জীবনী ও কল্যাণমুখী জনহিতকর কর্মসমূহ, রাজ্য বিজয়, শাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অলৌকিক কার্যাবলী আলোচনার মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য আলোচ্য গবেষণাকর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে এই গবেষণাকর্মটি আধুনিক ইতিহাসে যুলকারনাইনের উদঘাটনের দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে। তাঁর জীবনী অনুসরণ ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যে কোনো গবেষক এ বিষয়টি আরও উন্নত, ফলপ্রসূ গবেষণা করে দেশ ও জাতির খেদমতে পেশ করতে পারবেন।

গবেষক

(মোঃ আবদুল হান্নান)
রেজি. নম্বর: ২১০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০২০
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিমে পূর্ববর্তী বহু জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এ বর্ণনা মানবরচিত ইতিহাসগ্রন্থের মতো নয়। মহান এ গ্রন্থে ইতিহাসের সেই অংশটুকুই স্থান পেয়েছে, যা মানবজাতি ও মানবসভ্যতার জন্য অপরিহার্য, শিক্ষনীয়, উপকারী ও কল্যাণকর। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "অতএব আপনি কাহিনী বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে।" (আল কুরআন, ০৭ : ১৭৬) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ "তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।" (আল কুরআন, ১২ : ১১১)

আল কুরআন মানবজাতিকে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে শিক্ষাগ্রহণের উপদেশ দিয়েছে। যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, তাদের নিন্দায় বলা হয়েছে, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল?' (আল কুরআন, ৪০ : ৮২)

ইতিহাস চর্চায় আল কুরআন উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। আল কুরআনের দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো মানুষের সত্যের পাঠ গ্রহণের মাধ্যম। বর্ণিত হয়েছে, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ "আমি আপনার নিকট সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করছি, এ কুরআন আমার ওহী হিসেবে আপনার কাছে প্রেরণ করার মাধ্যমে।" (আল কুরআন, ১২ : ০৩) আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দ্বারা শুধু ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো শিরক ও পাপাচারের ভয়াবহতা বর্ণনা করা এবং কাফির, মুশরিক ও অবাধ্যদের পরিণতি উপস্থাপন করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত জীবনব্যবস্থার দিকে আহবান করা। তার সাথে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে আস্থা বৃদ্ধি করা।

আল কুরআনুল কারিমে 'তারিখ' বা ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন: 'নাবা' (আল কুরআন, ০৫ : ২৭), 'কিস্‌সাহ বা কাসাস' (আল কুরআন, ১২ : ০৩), 'হাদিস' (আল কুরআন, ৭৯ : ১৫), 'সাওয়াল বা প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নের জবাব' (আল কুরআন, ১৮ : ৮৩) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি 'প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নের জবাব' সম্বলিত। মক্কার কুরাইশগণ দু'জন দূতের মাধ্যমে মদীনার ইহুদিদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তোমাদের ওহি সম্বলিত কিতাবে তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে কোনো আলোচনা বা সংকেত আছে কি? মদিনার ইহুদিগণ এ প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে তিনটি প্রশ্ন শিখিয়ে দিয়ে বলেন, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্ন তিনটির জবাব দিতে পারেন, তবে তিনি সত্য নবী; তাঁর আনুগত্য করা অত্যাবশ্যক। আর যদি জবাব না দিতে পারেন, তবে

তাঁর সাথে তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো। প্রশ্ন তিনটি হলো: ১. ওই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত জয় করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ২. ওই কয়েকজন যুবকের কী অবস্থা হয়েছিলো, যারা কাফের বাদশাহর ভয়ে পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন? ৩. রুহ বা আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তাদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-কাহাফ অবতীর্ণ করেন। যাতে মদিনার ইহুদি কর্তৃক শেখানো তিনটি প্রশ্নের জবাব অতিশয় সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য গবেষণাকর্মের বিষয় হলো প্রথম প্রশ্নটি। এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-কাহাফের আয়াত নং ৮৩-৯৯ পর্যন্ত মোট ১৭টি আয়াত বর্ণনা করেন। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا অর্থ: 'আর তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বল, 'আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি'। (আল-কুরআন, ১৮ : ৮৩)

আল কুরআন যুলকারনাইনকে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী গুণে গুণান্বিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে পৃথিবীর কতৃত্ব, রাজত্ব ও বিভিন্ন উপায়-উপকরণ দান করেছিলেন। যেমন সেনাবাহিনী, যুদ্ধাস্ত্র, কিল্লা ইত্যাদি দ্বারা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলন। তিনি এসব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। সূর্যোদয়ের স্থান থেকে সূর্যোস্তের স্থান পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পেয়েছেন। প্রয়োজন অনুপাতে তাদের চাহিদা পূরণ করেছেন। তাঁর পরিভ্রমণের মধ্যে অন্যতম একটি দিক ছিল দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসী ইয়াজুজ-মাজুজের হিংস্রতা ও ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে সাধারণ মানুষের জন্য প্রাচীর নিমার্ণ করা।

যুলকারনাইন আল্লাহ তা'আলার একজন নেককার বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি উপদেশ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহবান করেছেন। তারা তাঁর একটি শিং এর উপর সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাঁকে জীবিত করেন। আবারও তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা তাঁর অপর শিং এর উপর আঘাত করে। এ আঘাতেও তিনি মারা যান। এ কারণে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়।

কিন্তু আল কুরআনে বর্ণিত এ মহান ন্যায়পরায়ণ শাসকের পরিচিতি ও ইতিহাসে তাঁর অবস্থান নিয়ে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবেত্তা, গবেষকগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। কেননা যুলকারনাইন হলো তাঁর উপাধী। প্রকৃত নাম নিয়েও একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ১. আল-ইস্কানদার আল-মাকদুনী, ২. সা'ব যুলকারনাইন আল-হিমায়রী, ৩. ইবরাহিম (আ.) এর যুগের সৎ ব্যক্তি (যার পরিচয় জানা যায়নি), ৪. কাউরেস আল-আখমিনী আল-ফারেসী, ৫. সাইরাস দ্য গ্রেট বা খোরাস বা কায়খসরু এবং ৬. আখনাতুন।

যুলকারনাইন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ের আরব ও অনারবের সকল রাজা, বাদশাহ তাঁর অনুগত ছিলেন। তিনি মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সকল জাতির ভাষাজ্ঞান ছিল। তিনি যখন কোন জাতির সাথে যুদ্ধ করতেন

তাদের ভাষায় তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হতেন। যা আল কুরআনের বর্ণনায় প্রতিয়মান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا "আমি তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং সববিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।" (আল-কুরআন, ১৮ : ৮৪)

সর্বোপরি, এটি একটি জ্ঞান গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক বিষয়। আধুনিক ইতিহাসেও উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে যুল কারনাইন সম্পর্কে অনেক তথ্য, উপাত্ত ও অজানা তথ্যের উন্মেষ ঘটনো হয়েছে। যুলকারনাইনের পরিচয়, জীবনী ও কল্যাণমুখী জনহিতকর কর্মসমূহ, রাজ্য বিজয়, শাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অলৌকিক কার্যাবলী আলোচনার মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য আলোচ্য গবেষণাকর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল কুরআনের বর্ণনা ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির আদলে যুল কারনাইনের পরিচয় প্রদান, নির্ভরযোগ্য সূত্র, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল কুরআনে বর্ণিত যুল কারনাইন ও ইতিহাসে তাঁর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে **'আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ঃ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান'** শীর্ষক শিরোনামে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি ৫টি অধ্যায় ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচ্ছেদের আলোকে সম্পন্ন করা হয়েছে। অত্র অভিসন্দর্ভের অধ্যায়ভিত্তিক একটি সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রথম অধ্যায়ঃ আল কুরআনের পরিচয়, সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস। এ অধ্যায়কে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। **প্রথম পরিচ্ছেদে** আল কুরআনের আভিধানিক অর্থ, আল কুরআনকে কুরআন নামকরণের কারণ, কিতাবুল্লাহ এর আলোকে আল কুরআন পরিচিতি, আল হাদিসের আলোকে আল কুরআন পরিচিতি এবং মনীষীদের দৃষ্টিতে আল কুরআন পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** আল কুরআনুল কারিমের সংরক্ষণ পদ্ধতি তথা হিফয বা মুখস্তকরণ ও মাকতুব বা লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপনসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পরিচিতি। **এ** অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদে রয়েছে। **প্রথম পরিচ্ছেদে** ইতিহাসের আভিধানিক বিশ্লেষণ উল্লেখসহ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ইতিহাসের গ্রহণযোগ্য পারিভাষিক পরিচয় প্রদান, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** ইসলামের ইতিহাস পরিচয়, আলোচ্য বিষয়, ইসলামের ইতিহাস রচনার ভিত্তি, সূচনা, বিকাশ ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন। এ অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। **প্রথম পরিচ্ছেদে** যুলকারনাইনের মূল নাম ও বংশধারার পরিচয়, তাঁর গোত্রের পরিচয়, তাঁর উপাধি যুলকারনাইন হওয়ার কারণসমূহ, তিনি নবী নাকি অলী ছিলেন এ সংশয়ের সমাধান, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে যাঁদেরকে যুলকারনাইন হিসেবে ধারণা করা হয়েছে তাঁদের সাথে আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করে সঠিক সিদ্ধান্তে গবেষক পৌঁছার চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে তাঁর মৃত্যু ও দাফন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে**

কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন শিরোনামে তাঁর সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত এসেছে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত আয়াতগুলোর অনুবাদ, শানে নুযুল, মুফাসসিরদের মতামতের আলোকে যুলকারনাইনের সঠিক পরিচয়সহ তাঁর কর্মকাণ্ডসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** আল হাদীসের আলোকে যুলকারনাইনের বৃত্তান্ত অর্থাৎ সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য একাধিক হাদিসের গ্রন্থে যুলকারনাইন সম্পর্কে যে বিবরণ এসেছে সে সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। **চতুর্থ পরিচ্ছেদে** যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সবিস্তারে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ যুলকারনাইন: ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি। এটিকে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। **প্রথম পরিচ্ছেদে** যুলকারনাইন সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম পণ্ডিতদের বক্তব্য, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের বর্ণনাসহ একাধিক ইতিহাস গ্রন্থে যুলকারনাইন সম্পর্কে যে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** ঐতিহাসিকদের বর্ণনাভঙ্গিতে যুলকারনাইনের রাজত্বকাল ও রাজ্যের পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ। এ অধ্যায়টিকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। **প্রথম পরিচ্ছেদে** ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয়, বংশধারা আলোচনাসহ তাদের কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের বক্তব্য উল্লেখসহ ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হয়েছে। আর **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** দু'পবর্তের পাদদেশে অবস্থিত ইয়াজুজ-মাজুজের ক্ষতি, হিংস্রতা ও বর্বরতা থেকে সাধারণ মানুষদের রক্ষার্থে যুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে যে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন, তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, অধ্যায়সমূহের আলোচনান্তে গবেষণাকর্মের উপর একটি **উপসংহার**, একটি **গ্রন্থপঞ্জি** এবং পরিশেষে একটি **পরিশিষ্ট** সংযোজন করা হয়েছে।

গবেষক

প্রথম অধ্যায়

আল কুরআনের পরিচয়, সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদঃ আল কুরআনের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ
আল কুরআনের পরিচয়

আল কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার কালাম। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযাহ। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ। এটি মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিকসহ সকল জটিল সমস্যার প্রতিষেধক। এতে পৃথিবী ধ্বংস ও মহাপ্রলয়ের বিবরণ, জান্নাতের নান্দনিক সৌন্দর্যের অপূর্ব চিত্রাংকন, জাহান্নামের বীভৎস শাস্তির চুলচেরা বিবরণ, ভালো কাজের পুরস্কার আর মন্দ কাজের শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। মানবতার অনিবার্য প্রয়োজনে নাযীলকৃত অসংখ্য নবী রাসুলের দাওয়াতি কর্মকাণ্ড ও তার ফলাফলের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। অবাধ্য জাতিসমূহ ধ্বংসের করুণ ইতিহাস, নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাব্বে কারীমের যৌক্তিক ইনসাফপূর্ণ সমাধান, দুনিয়ার জীবনে মনুষ্য জাতির শান্তি, মুক্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির সুনিপুণ হিদায়াত এবং পারলৌকিক অনন্ত জীবনে কল্যাণ, মুক্তি ও শান্তির প্রাপ্তির জন্য করণীয় আলোচিত হয়েছে। সর্বদিক বিবেচনায় এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ একটি আসমানী নির্দেশনা বহি। পৃথিবীর সকল জ্ঞানের মূল উৎস হল এ আল কুরআনুল কারীম।

সাহিত্য বিচারে আল কুরআনুল কারীম অবিকল কোন সাহিত্য গ্রন্থ নয়; তবে গুণে-মানে এটি সাহিত্যের যে তথ্য-তত্ত্ব, রুপ-রস, সরল-প্রাঞ্জল, আকর্ষণ, আলোড়ন, উচ্ছ্বাস, বিপ্লবী চেতনা, দ্রোহের বর্ণনা দিয়েছে তা সত্যি অদ্বিতীয় ও অনন্য। এতে রয়েছে মানবতার আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের সমস্ত উপকরণ। ভাব, ভাষা, গাঁথুনি, বুনন, বক্তব্যের পরম্পরা, অলংকার, অনুপ্রাস, ব্যঞ্জনা, ইলমুল বালাগাত, ফাসাহাত, বায়ান, বাদীই, মা'আনিসহ সবদিক থেকেই এটি এক অনন্য গ্রন্থ। বিশেষ করে এটি নব পদ্ধতির সাহিত্যিক বাচনভঙ্গী, সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এক অপূর্ব আবেগময় কথামালা। সতেজ বাক্যবিন্যাস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এ গ্রন্থ সজ্জিত হয়েছে। নিম্নে এ মহাগ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

আল কুরআনের আভিধানিক অর্থঃ

- ✓ আল-কুরআন (القرآن) শব্দটি ইসমে মাসদার। এটি مشتق (ধাতু থেকে উৎপন্ন) বা مهموز নয়। এটি আল-কুরআনের সুনির্দিষ্ট নাম, যা শুধু রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কালামের জন্য সুনির্দিষ্ট। যেমন- التورات এবং الإنجيل দুটি ঐশী গ্রন্থের নাম।[১]
- ✓ আল-কুরআন শব্দটি فعلان -এর ওযনে গঠিত এবং قرء ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ, সন্নিবেশ করা। পানি হাওযে জমা করা হলে বলা হয় قرأ الماء في الحوض অর্থাৎ- পানি

[১] আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রো: আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাতি লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.১৮১।

হাওযে জমা হয়েছে।[২] কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারবস্তু জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়।[৩] মূলতঃ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানই কুরআনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ 'আমি আপনার নিকট প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ কিতাব নাযিল করেছি।'[৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ "কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দিইনি।"[৫]

- ✓ আল কুরআন (القرآن) শব্দটি হামযাযুক্ত এবং 'قرأ' এর মাসদার। قرآن শব্দটি غفران এর ওজনে এবং 'قرأ' শব্দ থেকে গঠিত। যার অর্থ- পাঠ করা। আর মাসদারকে (اسم مفعول) এর অর্থে গ্রহণ করে مقروء বা পঠিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[৬] আরবী ভাষায় মাসদার কখনও কখনও ইসমে মাফউল (اسم مفعول) এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই কুরআনকে 'কুরআন' (مقروء) বা পঠিত গ্রন্থ বলা হয়।[৭] যেমন আল্লাহর বাণী–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أي قِرَاءَته

অর্থ: 'এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করবার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।'[৮]

জাহিলী যুগে আরবগণ قرأ শব্দ তিলাওয়াত অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করত। যেমন তারা বলত, هذه الناقة لم تقرأ سلى قط - এ উষ্ট্রীটি কখনও গর্ভবতী হয়নি এবং বাচ্চা জন্ম দেয়নি।" 'আমর ইবনে কুলসূমের কবিতায়ও শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: هجان اللون لم تقرأ جنينا -'নিম্নমানের ঘোড়া বাচ্চা প্রসব করেনি।'[৯]

অতঃপর আরবগণ قرأ শব্দটিকে আরবী ভাষা থেকে تلاوة (পাঠ করেছে) অর্থে গ্রহণ করে এবং এ অর্থেই শব্দটি তাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে।"[১০]

---

২ মান্না আল কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন* (কায়রো: মাকতাবাতু ওহাবাহ, তা.বি.), পৃ.১৪; ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল ইলমি লিল মালায়িন, ১০ম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ১৯; *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২।

৩ ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৪ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন নাহল, ১৬ : ৮৯।

৫ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আনআম, ০৬ : ৩৮।

৬ মান্না আল কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪-১৫; *আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২।

৭ *আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২; ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।

৮ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫:১৭-১৮।

৯ ইবন মানযুর, মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম আল আফরীকী, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬।

১০ ড. সুবহী সলেহ, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

আল-কুরআনকে 'আল-কুরআন' নামকরণের কারণঃ

- ✓ القرآن অর্থ মিলানো বা একত্রিত করা। আল-কুরআনকে এ নামে নামকরণ করার কারণ–তাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিভিন্ন ঘটনাবলী, আদেশ-নিষেধ, অঙ্গীকার-সতর্ককরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং আয়াত ও সূরাসমূহের পরস্পরকে পরস্পরের সাথে একত্রিত ও মিলিত করেছে।[১১]
- ✓ قرن শব্দ থেকে قرآن শব্দটি উদ্ভুত। قرن الشئ بالشئ যার অর্থ- একটি বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়েছে। আল-কুরআনের সূরা, আয়াত ও হরফসমূহ পরস্পরের সাথে সংযোজিত বলে তাকে আল-কুরআন বলা হয়।[১২]
- ✓ আল-কুরআন (القرآن) নামটি القرائن থেকে উদ্ভুত। এটি قرينة এর বহুবচন, যার অর্থ অনুরূপ। যেহেতু আল-কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করে এবং এর এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে তাকে আল-কুরআন বলা হয়।"[১৩]
- ✓ আল-কুরআনকে কুরআন বলার কারণ হল, এতে পূর্ববর্তী সব আসমানী গ্রন্থের শিক্ষা ও সারবস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৪]

সুতরাং বলা যায় যে, আল কুরআন পৃথিবীর সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলেই তাকে আল-কুরআন বলা হয়।

কিতাবুল্লাহ এর আলোকে আল কুরআনের পরিচয়

আল-কুরআন আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ কিতাব। এর ভাব ও ভাষা আল্লাহ তাআলার। এটি মানব জাতির সার্বিক জীবনের পথনির্দেশক। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ভাষায়:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

অর্থ: আর নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা[১৫] এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[১৬]

---

১১ ইবন মানযূর, মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম আল আফরীকী, *লিসানুল আরব* (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রি.), ৯ম খণ্ড, পৃ.২৮৫; ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।

১২ ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮; *আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২।

১৩ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২; রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ.৫২০; ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮।

১৪ *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০; *আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯; ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯ ।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল-কুরআনুল কারীমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

ক. কুরআন আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে নাযিলকৃত।

খ. রূহুল আমীন অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কুরআন পৌছিয়ে দেন।

গ. কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়।

ঘ. কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এজন্য নাযিল হয়, যাতে তিনি কুরআনের দ্বারা উম্মতকে সর্তক করেন। অতএব, কুরআন জগৎবাসীর জন্য সর্তককারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

-'রাসূলগণ আসার পর যাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।'[১৭]

ঙ. কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল হয়।

আল হাদীসের আলোকে আল কুরআনের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজীদের সংজ্ঞায় বলেন,

بُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، مَنْ كَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَ اللهُ ، هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَهُوَ الَّذِي لا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ ، وَلا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ ، وَلا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، وَلا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ، هُوَ الَّذِي لَمْ يَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى ، قَالُوا : إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"আল্লাহর কিতাব তাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতীসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ আছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। তা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী। তাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু নেই। অহংকার বশতঃ যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। যে এটা ভিন্ন অন্য কিছুতে হেদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন। এটি আল্লাহ প্রদত্ত মজবুত রজ্জু। এটি বিজ্ঞপূর্ণ স্মরণিকা এবং একটি সরল সহজ পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন না। অন্য কিছু এর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে

---

১৫ এখানে 'বিশ্বস্ত আত্মা' দ্বারা জিবরীল (আ.) কে বুঝানো হয়েছে।

১৬ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আশ-শু'আরা : ১৯২-১৯৫, এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ১০:৩৭, ৪:৮২, ২:২৩, ৮১:১৯, ৬৯:৪০-৪২।

১৭ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন নিসা, ০৪ : ১৬৫।

না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জিনগণ যখন এ কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি। বরং তারা বলে উঠেঃ আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে।'[১৮] যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুসারে কথা বলবে সে সত্যকথা বলবে। আর যে এর অনুসারে আমল করবে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যে এর অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে সে ন্যায়বিচার করবে। আর যে এর প্রতি আহবান জানাবে সে সঠিক পথের দিশাপ্রাপ্ত হবে।"[১৯]

মনীষীদের দৃষ্টিতে আল কুরআন পরিচিতি

القرآن هو كلام الله المنزل على محمد ﷺ المتعبد بتلاوته

অর্থাৎ, "আল-কুরআন হল আল্লাহর কালাম যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ, যা তিলাওয়াত করা ইবাদত।"[২০]

এ সংজ্ঞায় উল্লিখিত **الكلام** শব্দটি সকল প্রকার বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু পরবর্তী শব্দ **لله** দ্বারা মানুষ, জিন এবং ফেরেশতাগণের কথা কালামের আওতা থেকে বহির্ভুত হয়ে যায়।

الْمُنَزَّلُ (অবতীর্ণ) শব্দটি আল্লাহ পাকের এমন সব কালামকে কুরআন হওয়া থেকে খারিজ করে দেয়, যে সকল কালাম তিনি তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার এ ধরণের কালাম সীমাহীন। যেমন তিনি বলেন,

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

অর্থ: 'বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কালাম শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।'[২১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: 'পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র তার সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[২২]

الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّد صلّى الله عليه وسلّم (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ) শর্ত দ্বারা তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহ যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি কুরআনের সংজ্ঞা থেকে খারিজ হয়ে যায়।

---

১৮ আল কুরআনুল কারীম, সূরা জিন, ৭২ : ১-২।

১৯ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী, *আস সুনান* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), ৫ম খন্ড, হাদসি নং ২৯০৬, পৃ. ১৭২।

২০ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

২১ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ১০৯।

২২ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা লুকমান, ৩১ : ২৭।

الْمُتَعَبَّدُ بتلاوته (তার তিলাওয়াত করা ইবাদত) শর্তের প্রেক্ষিতে আহাদ কিরাআত সমূহ এবং হাদীসে কুদসী কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে খারিজ হয়ে যায়।

وأما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.

অর্থাৎ, "মূলত: কিতাব হল আল-কুরআন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির সনদে সন্দেহমুক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"[২৩]

القرآن هو كلام الله المعجز، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء **بسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس.**

অর্থাৎ, "আল-কুরআন আল্লাহর কালাম যার মোকাবেলায় সবাই অক্ষম। জিব্‌রাইল আমিন আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে সর্বশেষ নাবী ও রাসূলের উপর এটি অবতীর্ণ। মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ। মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট পর্যন্ত বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত এবং এর আরম্ভ সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা এবং সমাপ্তি সূরা আন-নাস এর মাধ্যমে।"[২৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, আল কুরআনুল কারীম বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী নির্দেশনা। যা জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর নবুওয়াতি জিন্দেগীর ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিনে ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। এর প্রতিটি বর্ণ, বাক্য, সূরা, সূরার নামকরণ, সজ্জায়ন ও উপস্থাপনা সবকিছুই ভাব এবং ভাষাগত দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার একান্ত নিজস্ব।

---

[২৩] আহমাদ মোল্লাজিওন, *নূরুল আনোয়ার* (পাকিস্তান: জামি'আ ইসলামিয়া, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ.১৯-২১।

[২৪] মুহাম্মদ আলী সাবুনী, *আত তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন* (পাকিস্তান: মাকতবাতুল বুশরা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ.০৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস

কুরআন মাজীদ শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। মানব জীবনের পথ প্রদর্শক ও মুত্তাকীগণের জন্য হিদায়াত। অন্যান্য সকল আসমানী গ্রন্থ নবীগণের ওপর একসাথে লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ একসাথে এবং লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাযিল হয়নি। বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতী জীবনে তা ধীরে ধীরে খণ্ডাকারে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে নাযিল হতে থাকে। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তা মুখস্থ করে বক্ষে ধারণ করতেন এবং বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করাতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.) কুরআন মাজীদকে গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর ওসমান গণী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় কুরআন মাজীদ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে আলোকে আলোচ্য পরিচ্ছেদটি দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এক. আল কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস; দুই. আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস। নিম্নে এ দু'টির বিবরণ তুলে ধরা হলো।

এক. আল কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

বর্তমান সমাজে বিদ্যমান যে কুরআন রয়েছে, এটি হুবহু সে গ্রন্থ, যা আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে কুরআনকে নিজের সামনে লিখিয়েছেন, যেভাবে সাহাবিগণকে মুখস্ত করিয়েছেন, তিনি নিজে পাঠ করেছেন সাহাবিগণকে পাঠ শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক সে অবস্থায় সে বিন্যাসেই এখনো তা বিদ্যমান আছে। এর বিন্যাসে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়নি বা কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি। কোন অক্ষর, শব্দ, বাক্য এবং আয়াতে বা তিলাওয়াত পদ্ধতিতেও কোন প্রকার রদবদল ঘটেনি। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।[২৫] তাই কিয়ামাত পর্যন্ত এতে কোনরূপ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। আল কুরআন দু'টি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তা হলো:

ক. মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করণের মাধ্যমে বক্ষে ধারণ করে সংরক্ষণ করা:

হিফয বা মুখস্তকরণের পদ্ধতিকে ইসলামের পরিভাষায় জাম'উ সুদুর বলা হয়। হৃদয়ে ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 'বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটি স্পষ্ট নিদর্শন।'[২৬]

কুরআন মাজীদ এক সাথে নাযিল হয়নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতী জীবনে তা খণ্ডাকারে নাযিল হতে থাকে। এ কারণে প্রথম থেকে কুরআন মাজীদকে গ্রন্থাকারে

[২৫] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৭।
[২৬] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল আনকাবুত, ২৯ : ৪৯

সন্নিবেশ করা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া কুরআন মাজীদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলা কুরআন পাককে অন্যান্য আসমানী কিতাবের মত শুধু কলম-কাগজ দ্বারা হিফাযত না করে হাফিযগণের সিনায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মুসলিম শরীফে উল্লিখিত একটি হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ অর্থাৎ, 'আমি আপনার ওপর এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানি ধৌত করে মুছে ফেলতে পারবে না।'[২৭]

খ. লিপিবদ্ধ ও অংকনের মাধ্যমে কাগজে সন্নিবেশ করাঃ

লিখিতভাবে সংরক্ষণ করাকে জাম'উ মাকতুব বলা হয়েছে। আরবদের স্মৃতির ওপর ভর করে কুরআন সংরক্ষণের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখিতভাবে কুরআন সংকলন, সংরক্ষণ ও একত্রিত করণের ব্যবস্থা করে গেছেন। সেই যুগে আরবদের নিকট যেহেতু কাগজের প্রচলন খুবই কম ছিল, তাই বেশির ভাগ আয়াত পাথরের উপর, চামড়ার উপর, খেজুর গাছের ছালের উপর, বাঁশের উপর এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে কুরআনের একটি খণ্ড লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। যদিও তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা ছিল না।[২৮] এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের অনেকের নিকট ব্যক্তিগভাবে কুরআনের সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ কপি বিদ্যমান ছিল। ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -□- أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নিয়ে (অর্থাৎ কুরআনের কপি নিয়ে) শত্রুদের ভূ-খণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।[২৯]

আল কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।[৩০] অতঃপর লাওহে মাহফুজ থেকে মোট দু'পর্যায়ে কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে।[৩১] প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গে ক্বদরের পুন্যময়ী রাত্রে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল ইয্যাতে' নাযিল হয়।[৩২] দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনে পর্যায়ক্রমে সময়ের পরিক্রমায় নাযিল হয়। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল কুরআনের অবতরণ সমাপ্ত হয়।[৩৩]

আল কুরআনের সংরক্ষণের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ- فِي كِتَابٍ□مَكْنُونٍ

'নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে।'[৩৪]

---

[২৭] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ মুসলিম আল কুশায়রী আন নিসাবুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূতঃ দারুল আফাকিল জাদিদ, তা.বি.), ৮ম খণ্ড, হাদিস নং ৭৩৮৬, পৃ. ১৫৮।

[২৮] আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৯ খ্রি), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১।

[২৯] মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ আল-কুযাওয়ীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), ২য় খণ্ড, হাদিস নং-২৮৭৯, পৃ.৯৬১; আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল আশআস আশ-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.), ২য় খণ্ড, হাদিস নং-২৬১২, পৃ.৩৪০।

[৩০] আল কুরআনুল কারীম, ২২ : ২১- ২২; ৪৩ : ০৪।

[৩১] *আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০-৪১।

[৩২] আল কুরআনুল কারীম, ৪৪ : ০৩; ৯৭ : ০১।

[৩৩] আল কুরআনুল কারীম, ১৭ : ১০৬ ; ২৫ : ৩২ ; ৭৬ : ২৩।

[৩৪] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-ওয়াক্বিয়া, ৫৬:৭৭-৭৮।

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ - فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

'বরং তা সম্মানিত কুরআন। সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।'[৩৫]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল কারিম মহান রাব্বুল আলামিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ফাতহুল মাজিদের ব্যাখ্যাকার বলেন- কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়া মহান উদ্দেশ্য মূলত মহান আল্লাহ তা'আলা নিজে কুরআনকে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে করে মুমিন বান্দারা কুরআনকে আকড়ে ধরে থাকে এবং সার্বিক জীবনে অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সফল হয়।[৩৬]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ এ সুমহান কিতাবের প্রতিটি আয়াত বিশুদ্ধতার সংরক্ষণে প্রচেষ্টার কোন কমতি নেই। আল কুরআনের আয়াতাংশ, সূরা যখনই যা নাযিল হতো তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তেলাওয়াত করতেন এবং উপস্থিত সাহাবাদের শুনাতেন। সাহাবিরা তা বার বার তেলাওয়াত করে মুখস্থ করে ফেলতেন। নাযিলের সূচনাকাল থেকেই মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাহাবিরা মুখস্থ করা ও লেখার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ শুরু করেন। কোনো ভুল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ধরিয়ে দিতেন এবং তাদের সংশোধন করে দিতেন। তৎকালীন তত্ত্ব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার দু'টি মৌলিক পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। প্রধানত এ দুটি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে আল কুরআন সংরক্ষণ হতো। ফলে আল কুরআন দ্রুত মুখস্ত হয়ে যেতো। এভাবেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ কুরআন লেখা হয়েছিল।[৩৭] আসমানি গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে এ বিশেষত্ব দান করেছেন যে, কলম কাগজের চেয়েও একে অগণিত সংখ্যক হাফেজের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছেন, আমি আপনার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করব, যাকে পানি ধুয়ে নিতে পারবে না।[৩৮]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অলৌকিক ভাবে হাজারো বছর ধরে অত্যন্ত বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় এ গ্রন্থকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পাথরে খোদাই তথা লিখার পাশাপাশি হাজার বছর ধরে হৃদয় থেকে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুরআনের লাখো কোটি হাফেজ সাহেবগণ মুখস্ত করে কুরআনকে তাদের হৃদয়ে ধারণ করেছেন। মানব ইতিহাসে আর কোনো গ্রন্থ এভাবে মুখস্ত করে রাখার ইতিহাস নেই।[৩৯]

কাতিবে ওহি বা লিপিকারদের পরিচয়

---

[৩৫] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-বুরুজ, ৮৫:২১-২২।

[৩৬] মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম, *তাফসিরে ফাতহুল মাজিদ* (ঢাকা: আল-ফুরকান পাবিলকেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ.২, পৃ. ৪২০।

[৩৭] শহীদ আল-বুখারি মহাজাতক, *আল কুরআনের বাংলা মর্মবাণী* (ঢাকা: কোয়ান্টাম ফাউণ্ডেশন, ২০১৪ খ্রি), পৃ. ১৫; এইচ. এ. আর গিব, *ইসলাম ধর্ম* (লণ্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ২৫।

[৩৮] আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন* (সৌদি আরব: মাজমুউল মালাকি ফাহাদ, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪।

[৩৯] গোলাম রাব্বানী, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, সম্পা. মাও. আহসান উল্ল্যাহ (ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪০-৪৩।

ওহির ইলম লিপিবদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশজন 'কাতেবে ওহি' বা ওহি লিপিকার নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে যায়দ ইবনে সাবিত (মৃ. ৪৫/৪৮ হি.) (রা.), আবু বকর সিদ্দিক (৫৭৩-৬৩৪ খ্রি.) (রা.), ওমর (৫৮৩-৬৪৪ খ্রি.) (রা.), ওসমান (৫৭৬-৬৫৬ খ্রি.) (রা.), আলী ইবনে আবু তালিব (৬০১-৬৬১ খ্রি.) (রা.), উবাই বিন কা'ব (মৃ. ১৯ হি.) (রা.), যুবায়র বিন আওয়াম (৫৯৪-৬৫৬ খ্রি.), (রা.), মুআয ইবনে জাবাল (মৃ. ১৮ হি.) (রা.), মুআবিয়া ইবনে আবী সুফীয়ান (৬০৬-৬৮০ খ্রি.), (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৫৯৪-৬৫০ খ্রি.) (রা.) ও মুগীরা ইবনে শু'বা (মৃ. ৫০ হি.) (রা.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪০]

মোটকথা আল কুরআন বর্তমানে যেভাবে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়েও ঠিক সে ভাবেই ছিল। এরমধ্যে বিন্দুমাত্র কোনরূপ পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন হয়নি। পৃথিবীর কারো পক্ষে তেমনটি সম্ভবও নয়। কারণ, এ কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব এবং এটিকে অবিকল সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর বিশেষ কুদরাতে এর মুদ্রণ জনিত সামান্য কোন ত্রুটিকেও বিশ্বের কোন প্রান্তের কোন সাধারণ মুসলিম কুরআন হিসেবে গ্রহণ করেনি। অনিবার্য ব্যর্থতার পরিণতির কথা ভেবে কোন ইসলাম বিদ্বেষি শক্তিও সেরূপ দুঃসাহস দেখায়নি। এটি আল কুরআনের অন্যতম মু'জিযা।

দুই. আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়াতি জিন্দেগীর সুদীর্ঘ সময়ে কুরআনুল কারিম নাযিল হয়। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন্দশায় আল কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ঐ সময় আল কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তাও ততটা প্রকট আকারে অনুভূত হয়নি। সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনে শুনে মুখস্ত করে রাখতেন; কিংবা গাছের পাতায়, চামড়া, পাথর প্রভৃতিতে লিখে রাখতেন।

আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) কর্তৃক আল কুরআন সংকলন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর[৪১] (রা.) এর শাসনামলে সংগঠিত রিদ্দার যুদ্ধে তথা ইয়ামামার যুদ্ধ[৪২] বিপুল সংখ্যক আল

---

[৪০] শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী, *মাদারেজুন নবুওয়াত*, অনু. মাওলানা মমিনুল হক (ঢাকা: সিরহিন্দ প্রকাশনা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি), ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

[৪১] আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খালিফা। মূল নাম 'আব্দুল্লাহ্। সিদ্দিক ও 'আতিক হচ্ছে উপাধি। পিতা হচ্ছেন কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি আবু কুহাফা (রা.)। মাতা সালমা উম্মুল খায়ের। তিনি দারুল আরকামে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মক্কায় পূর্ণ বয়স্ক স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলের দা'ওয়াত গ্রহণকারী এ মহান সাহাবি ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণে নিজের সকল সম্পত্তি উৎসর্গ করেছিলেন। মাদিনা হিজরতে রাসূলের একমাত্র সঙ্গি হযরত আবু বকরকে খালিফাতুর রাসূলুল্লাহুল্লাহ বলা হতো। তিনি উম্মুল মোমিনিন আয়েশা (রা.) এর পিতা। রাসূলের ইন্তিকালের পর যাকাত দানে অস্বীকারকারী গোত্রদ্বয় এবং নাবুয়তের মিথ্যা দাবীদারদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বন জীবন যাপনে অভ্যস্ত এ মহান সাহাবির দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সীমাহীন দৃঢ়তা ও অসীম সাহসীকতা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে রাসূলের ওফাতের পর ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। জামেউল কুরআন বা কুরআন সংকলনকারী তাঁর অন্যতম উপাধী। দু'বছর তিন মাস দশম দিন খিলাফাতের দায়িত্ব পালনকালে জ্বরে আক্রান্ত

কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়ে গেলে আবু বকর (রা.)সহ সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা এভাবে হাফেজে কুরআনদের ইন্তেকাল হলে আল কুরআনের আয়াত সংরক্ষণ রাখা দুষ্কর হয়ে পড়বে। এর ফলে মক্কা ও মদিনায় হাফিজে কুরআনের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাওয়ায় 'ওমর[৪৩] (রা.) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন এবং খালিফা আবু বকর (রা.) এর নিকট আল কুরআন সংকলনের সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। অনেক চিন্তা ভাবনা ও আলোচনার পর খালিফার পক্ষ থেকে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এর উপর কুর'আন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি দীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম এবং জীবিত হাফিজ ও ক্বারিগণের সম্মিলিত সহযোগিতা, শুনানি ও প্রচেষ্টায় একটি একক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এটি ছিল সর্বজন স্বীকৃত সরকারি পাণ্ডুলিপি।[৪৪] মূলত এ পাণ্ডুলিপিটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর সামনেই লিখিত পাণ্ডুলিপির একটি নকল কপি। যদিও রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সংকলিত করার প্রাথমিক উদ্যোগের সূচনা করে গিয়েছিলেন বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪৫] বিরে মাউনার[৪৬] যুদ্ধে সত্তরজন হাফেজে কুরআন সাহাবি (রা.), ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় পাঁচশ, অন্য বর্ণনায় সাতশ হাফেজ সাহাবি শহীদ হয়েছেন।[৪৭]

হয়ে ১৩ হি. ৭ জমাদিউল উখরা সিদ্দিকে আকবর (রা.) ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সপ্তদশ সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১-২৮

৪২ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা:) এর শাসনামলে ৬৩২/৬৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সংঘটিত হয়। মূলত ধর্মত্যাগী ও মিথ্যা নবী দাবীদার মুসায়লামাতুল কাজ্জাব, আসওয়াদ আনসি তুলাযহা প্রমুখ ভন্ড নবীদের বিরূদ্ধে এ যুদ্ধ পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। ইয়ামামা স্থানটি বর্তমানে সৌদী আরবের আকবাবার সমভূমিতে অবস্থিত। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৩০০০ (তের হাজার)। ধর্মত্যাগী ভণ্ড নবীদের পক্ষে ছিল ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)। এ যুদ্ধে ১০,০০০ (দশ হাজার) বিদ্রোহী নিহত এবং ৬০০ মুসলমান কারো কারো মতে, ১২০০ মুসলমান শহীদ হন। তাদের মধ্যে অনেকেই হুফফাজুল কোরআন ছিলেন। [দ্র. মুহাম্মদ ত্বকী উসমানী, *"এন এফরোছ টু দ্য কুরআনিক সাইন্স"*, অনু. আবদুর রহমান রফিক (ঢাকা: দারুল ইসআত বারমিংহাম, ২০০০ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৯১।]

৪৩ 'উমর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খালিফা। উপাধি হচ্ছে ফারুক আর কুনয়িাত আবু হাফ্স। পিতা খাত্তাব ও মাতা হানতামা। নবুয়াতের ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নাটকীয়ভাবে আল্লাহ্র মহিমায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলাম প্রচারে বাধাদানকারী দুশমনদেরকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেন। 'উমরের দুঃসাহসিক দা'ওয়াতি অভিযানের কারণেই ইসলাম প্রকাশ্য রূপলাভ করে। রাসূলের নির্দেশে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মাদিনায় হিজরত করেন। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র দশ বছরের শাসনামলে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে অর্ধ্ব পৃথিবীর অধিক অঞ্চল জুড়ে আল্লাহ্র খিলাফাত ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন। হযরত 'আলি (রা.) বলেছেন, নবিজীর পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তার পর 'উমর। আবু লুলু নামক অগ্নি উপাসক এক কৃতদাসের ছুরিকাঘাতে ২৩ হি. ২৭ জিলহজ্জ ফজরের সময় এ মহান বীর ও বিশ্বনায়ক শাহাদাত বরণ করেন। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩৮; দ্র. ইবনে সা'দ, *তাবাকাতুল কুবরা*, ২৬৭ হি. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯

৪৪ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০

৪৫ মুফতি শাহেদ রহমানী, 'পবিত্র কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস', দৈনিক কালের কণ্ঠ (২০১৫, ৩১ জুলাই), পৃ.৭ (ধর্মীয় ফিচার পাতা)।

৪৬ চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে কিলাব গোত্রের সর্দারদের অন্যতম আবু বারা আমির ইবনে মালিক আল কিলাবী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য কয়েকজন মুসলিম ধর্ম প্রচারককে প্রেরণের অনুরোধ জানান। তাদের এ অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কর্তৃক আল কুরআন সংকলন

আবু বকর (রা.) এর নেতৃত্বে মজলিসে শুরার বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কে কুরআন সংকলনের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাতে উপস্থিত সকল সাহাবিগণ ঐক্যমত পোষণ করেন। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) নিজেও হাফেজ ছিলেন। এরপরও তিনি এককভাবে কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেননি; বরং তিনি চার পদ্ধতিতে কুরআন সংকলনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

ক) কোনো আয়াত পাওয়া গেলে প্রথমে তা নিজের হিফজ করা আয়াতের সাথে তিলায়াত করে মিলিয়ে নিতেন।

খ) ওমর (রা.)সহ সকল হাফেজদের তেলায়াতের সাথে মিলিয়ে নিতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি যায়েদের সাথে সংকলনের কাজে সহযোগিতা নিতেন।[৪৮]

গ) কোনো আয়াত গ্রহণ করা হতো না, যতক্ষণ দুইজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি একথা স্বাক্ষ্য না দিত যে, এ আয়াত রাসুলের সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একমাত্র সূরা তাওবার শেষ আয়াতটি যখন কেবল আবু খুজাইমার কাছে পাওয়া গেছে, তখন এ সূত্রে সেটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সাহাবির একক স্বাক্ষ্যকে দুজনের স্বাক্ষ্যের সমতুল্য ঘোষণা করে গেছেন।[৪৯]

ঘ) অবশেষে চুড়ান্ত পর্যায়ে সে আয়াতগুলোর সমষ্টিকে বিভিন্ন সাহাবির ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত কুরআনের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া হতো।[৫০] এভাবে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কুরআনের একটি নমুনা (কপি) তৈরী করে আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) এর নিকট হস্তান্তর করেন। আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) ইন্তেকালের পর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ওমর

বললেন, انى اخاف عليهم اهل النجد নাজদবাসীদের থেকে নিজ সাহাবিগণ সম্পর্কে আমি ভয় করছি। আবু বারা বললেন তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন। সহীহুল বোখারীর তথ্য মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গে ৭০ জন সাহাবাকে প্রেরণ করেন। ৭০ জনের মুসলিম দলটি এক পর্যায়ে বিরে মাউনার কূপের নিকট পৌঁছলেন। এ কুপটি বনু আমির এবং হাররাহ বনু সুলাইমের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। সেখানে শিবির স্থাপনের পর এ সাহাবিগণ (রা.) উম্মু সুলাইমের ভ্রাতা হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পত্র সহ আল্লাহর দুশমন "আমির বিন তোফায়েলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা তার ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি হারামকে পিছনের দিক থেকে এত জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, দেহের অপর দিক দিয়ে ফুটো হয়ে বের হয়ে গেল। বর্শা বিদ্ধ রক্তদেহী হারাম বলে উঠলেন, "আল্লাহ মহান! কা'বার প্রভুর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি। এর পরই আল্লাহর দুশমন আমির অবশিষ্ট সাহাবাদের (রা.) আক্রমন করার জন্য তার গোত্র বনু আমিরকে আহবান জানাল। কিন্তু যেহেতু তারা আবু বাবার আশ্রয়ে ছিলেন সেহেতু তারা সেই আহবানে সাড়া দিলেন না। আহবানে সাড়া না দিয়ে সে বনু সুলাইমকে আহবান জানাল। সুলাইমের তিনটি গোত্র সাহাবিদের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন বাদে (কাব বিন যায়েদ (রা) সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। [দ্র. আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯]

৪৭ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর, *তাফসীর ইবনে কাসীর* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.৪০।

৪৮ *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৮।

৪৯ *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৫০ আয-যারকাশী, আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে বাহাদুর, *আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন*, সম্পা. মুহাম্মাদ আবুল ফযল (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৩৯১ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

(রা.) এর অসিয়ত মোতাবেক ওমর (রা.) এর মেয়ে হাফসা (রা.) এর কাছে সুরক্ষিত থাকে। মারওয়ান বিন হাকাম[৫১] তাঁর রাজত্বকালে এ কপিটি চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। হাফসা (রা.) এর ইন্তেকালের পর মারওয়ান এ কপিটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর কাছে নিয়ে যান। পরবর্তীতে ওসমান (রা.) এর তৈরী কপির প্রচলন শুরু হয়।[৫২]

আবু বকর (রা.) কর্তৃক সংকলিত কুরআনকে পরিভাষায় 'উম্ম' বা আদি কুরআন বলা হয়। কেননা এটিই প্রথম লিখিত সুবিন্যস্ত কুরআন। এ কুরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এ কপির আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত ধারাবাহিকতা অনুসারে লেখা হলেও সুরাগুলো সে অনুসারে বিন্যস্ত ছিলো না। তবে এ কপির মধ্যে কুরআনের সাত ক্বেরাতকেও জমা করা হয়েছিলো। এ কপিটি হিরার হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। এখানে কেবল সেসব আয়াত লেখা হয়েছে যেগুলোর তেলাওয়াত রহিত হয়নি। এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিলো একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থিত কুরআনের কপি সংগ্রহ করা। যাতে প্রয়োজনের সময় এর দ্বারস্থ হওয়া যায়। এটি ১৩ হিজরীতে শুরু হয়ে পূর্ণ এক বছর মতান্তরে প্রায় দুই বছরে সমাপ্ত হয়।[৫৩]

---

[৫১] মারওয়ান বিন হাকাম: জন্ম ২৮ মার্চ ৬২৩ খ্রি: মক্কায়। তার পূর্ণ নাম ছিল মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনে আবু আল ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদি শামস ইবনে আবদি মানাফ আল কুরাশি আল উমামি। তার কুনিয়ত ছিল আবুল হাকাম। আবার কেউ কেউ বলেন আবুল কাসিম। অনেকের মতে, তিনি একজন সাহাবি ছিলেন। হুদাইবিয়ার চুক্তি সংক্রান্ত হাদিসটি তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উসমান (রা:) এর সচিব (কাতিব) ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা:) ও উসমান (রা:) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। তার থেকে তার পুত্র আবদুল মালিক, সাহল ইবনে সা'দ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব উরওয়া ইবনে যুবাইর প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তার বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। তিনি ৭ই মে ৬৮৫ খ্রি: সিরিয়ার দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। দ্র. আবদুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর, **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া** (ঢাকা: ইফাবা, ১ম প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ-৪৬৬।

[৫২] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬।

[৫৩] তাহের আল-কুরদী, *তারিখুল কুরআনিল কারীম*, সম্পা. মুস্তফা মুহাম্মাদ ইয়াগমুর (জেদ্দা: মাকতাবাতুল ফাতহ, ১৯৪৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

ওসমান (রা.) কর্তৃক আল কুরআন সংকলন

ওসমান ইবনে আফফান (রা.)[৫৪] এর খিলাফতকালে আবার আল কুরআন সংকলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইতোমধ্যে খিলাফত অনেক বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বিচ্ছিন্ন মতবাদের বিভিন্ন সভ্যতার অনেক নতুন নতুন মানুষ ইসলামের পরিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হচ্ছিল। এ নব মুসলিমরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু তারা আরবি ভাষা ভালো জানতো না। তাই আল কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত গ্রন্থ সংকলন করতে হয়েছিল। তা ছাড়া কুরআন সংকলনের আরেকটি কারণ হলো, যারা কুরআন আত্মস্থ করে রেখেছিলেন, তাদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হয়েছিলেন। তাই ওসমান (রা.) হাফসা (রা.) এর কাছে বার্তা পাঠালেন, "আপনি আমাদের নিকট কুরআনের হস্তলিপিটা পাঠিয়ে দিন। আমরা সেটা যথার্থ কপিতে লিপিবদ্ধ করবো এবং সেটা আপনাকে আমরা ফিরিয়ে দেব।" হাফসা (রা.) সেটাকে ওসমান (রা.) এর নিকট পাঠিয়ে দেন। অতঃপর ওসমান (রা.) যায়েদ বিন সাবেত (রা.), ইবনে যুবায়র (রা.), সাঈদ ইবনেুল 'আস (রা.), 'আবদুর রহমান ইবনে হারিস (রা.) কে সেই হস্তলিখিত গ্রন্থের অনুলিপি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ওসমান (রা.) প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রে একটি করে মুসহাফ প্রেরণ করলেন। এ নির্দেশ জারি করলেন যে, যার কাছে এটা ছাড়া পূর্ণ আল কুরআন বা আল কুরআনের কোনো অংশ লিখিত আকারে রয়েছে, তা জ্বালিয়ে দেয়া হোক।[৫৫] অতএব ওসমান (রা.) এর নির্দেশেই সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে আল কুরআন জনসমক্ষে এসেছিল।[৫৬] কুরআনের বেশ কিছু পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়েছিল এবং সেগুলো হাফসা (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে হয়েছিল। অতঃপর সে অনুলিপিগুলো মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়েছিলো। যেমন- মদিনা, সিরিয়া, ইয়ামান, মিশরের কায়রো, তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও তাশখন্দ প্রভৃতি। তিনি আরো উদ্যোগ নেন যে, সাত

---

[৫৪] ওসমান ইবনে আফফান: নাম-ওসমান, পিতার নাম- আফফান, মাতার নাম- উরওয়া বিনতে কুরাইজ, তিনি বনু উমাইয়া যা কুরাইশ বংশের একটি শাখা। এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৭৩ খ্রি: হস্তীসনের ৬ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়ে বয়সে ছয় বছরের ছোট। তিনি একজন কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর মুহাম্মদ (সা:) তার কন্যা রুকাইয়ার সাথে তার বিয়ে দেন। ৯ম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধের পর রুকাইয়া ইন্তেকাল করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলছুমের সাথে তার বিয়ে দেন। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর নিকট জুননুরাইন বা দুই জ্যোতির অধিকারী হিসেবে খ্যাত। মক্কার সমাজে ওসমান (রা:) একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। যার কারণে তার উপাধি ছিল গণী অর্থ্যাৎ ধনী। মিসর ও বসরার একদল বিপদগামী বিদ্রোহী সমবেত হয়ে ৬৫৬ খ্রীঃ তার পদত্যাগ দাবী করে। পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে তাঁরা তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। অতঃপর আলী, তালহা ও জুবায়ের (রা.) এর ছেলেদের ১৮ জন নিরাপত্তা রক্ষী বিপদগামী বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় ব্যর্থ হন। অবশেষে তারা ৬৫৬ খ্রি. ১৭ জুন, ৩৫ হিজরী ১৮৯ জিলহাজ্ব শুক্রবার আসরের নামাযের পর ৮২ বছর বয়সে খলিফাকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় বর্বরভাবে হত্যা করে। [দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩৮; *তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯।

[৫৫] আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর নেতৃত্বে পবিত্রাত্মা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কঠোর সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক সর্বসম্মতভাবে কুরআনুল কারীমের যে সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন, তা ছিল ভ্রান্তি ও ত্রুটির সামান্যতম সম্ভাবনা হতেও মুক্ত ও পবিত্র। বলা নিষ্প্রয়োজন, ওসমান (রা.) কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত অনুলিপি আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর নেতৃত্বে প্রস্তুত সংকলনের হুবহু অনুলিপি। পক্ষান্তরে এতদভিন্ন অন্যান্য সংকলনের ত্রুটিমুক্ত হওয়া সন্দেহাতীত ছিল না। এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা মোটেই বিচিত্র ছিল না। এমতাবস্থায় সেগুলো বিনষ্ট করে দেয়া ছাড়া কুরআনুল কারীমকে বিকৃতির হাত থেকে পবিত্র রাখার অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল না। ওসমান (রা.) এর উপরোক্ত সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থার ফলেই কুরআনুল কারীম আজ একমাত্র আসমানী গ্রন্থ যাতে কোনরূপ বিকৃতি নাই। দ্র. *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪-৪৫।

[৫৬] তাক্বী উসমানী, *'উলূমুল কুরআন* (করাচি: মাকতাবা দারুল উলুম, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৮৬-১৮৭।

ক্বেরাতের পরিবর্তে এক ক্বেরাত বা আঞ্চলিক একাধিক ভাষার পরিবর্তে প্রমিত এক ভাষায় আল কুরআনের একটি কপি তৈরি করতে হবে। এ সাতটি কপির পর ৭টি প্রসিদ্ধ মুসলিম জনবহুল অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। প্রথম কপিটি মক্কায় পাঠানো হয়। এটি ৬৫৭ হিজরী পর্যন্ত মক্কায় ছিলো। বর্তমানে সংরক্ষিত কুরআনুল কারিম সংকলন করেছেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা.)। তাঁর শাসনকালে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) এর পরামর্শে তিনি আল কুরআন সংকলনের মতো সুমহান কাজে হাত দেন। কুরায়শী উপভাষার এ কপিটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে চলমান রয়েছে।

সর্বোপরি, আবু বকর (রা.) এর জীবদ্দশায় সর্বজন স্বীকৃত সরকারি পাণ্ডুলিপিটি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটি উমর (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। উমর (রা.) এর ইন্তিকালের পর এটি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রা.) এর কাছে রক্ষিত থাকে। খিলাফাতকালে উমর (রা.) এক লক্ষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন।[৫৭] সে সময় সৈন্যগণও আল কুরআনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে রাখতেন। এত বিপুল সংখ্যক মুসলিমের জন্য এ সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল ছিল।

পরবর্তীতে ওসমান (রা.) এর খিলাফাত কালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় আল কুরআন লিখন ও অধ্যয়নের আশংকা দেখা দিলে হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানের প্রস্তাবে ওসমান (রা.) কুরআনের আরো অধিক পাণ্ডুলিপি সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি হাফসা (রা.) এর নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর কাছে রক্ষিত আল কুরআনের পাণ্ডুলিপিখানা প্রেরণ করেন। তাহলে সে পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে আরো বহুসংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করে তাঁর পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেয়া হবে। হাফসা (রা.) তাঁর পাণ্ডুলিপি খালিফার কাছে পাঠিয়ে দেন। খলিফা ওসমান (রা.) কয়েকজন লেখকের মাধ্যমে আল কুরআনের প্রতিলিপি তৈরি করে মূললিপি হাফসা (রা.) এর নিকট ফেরত পাঠান।

আল কুরআনের প্রতিলিপি প্রস্তুতকারী সাহাবিগণ হচ্ছেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.), 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.), সা'দ ইবনে আবিল আস (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম (রা.)। যায়েদ ছিলেন আনসার সাহাবি আর বাকী তিনজন ছিলেন কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সাহাবি। নকলকৃত সকল পাণ্ডুলিপি সরকারিভাবে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণ করা হয়।[৫৮] ওসমান (রা.) কে আল কুরআনের সংকলক বা জামেউল কুরআন বলা হয়। তিনি তাঁর খিলাফতকালে লেখকগণকে একই লিখন ও পঠন পদ্ধতি ও রীতিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

আল কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

---

[৫৭] *'উলূমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১।

[৫৮] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইতিহাস পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামের ইতিহাস পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইতিহাস পরিচিতি

বর্তমান কালে ইতিহাস বলতে বুঝায় অতীত সম্পর্কীত মানবীয় ঘটনা, যা ঐতিহাসিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সময় ও স্থানের প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে লিখিত বিবরণটি বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতিহাস শব্দের আরবি, উর্দু, ফারসি পরিভাষা 'তারিখ' এবং বাংলা পরিভাষা 'ইতিহাস'। এর পারিভাষিক অর্থ হলো, ঐ বিদ্যা যার মাধ্যমে রাজা-বাদশা, নবি-রাসুল, বিজেতা ও বিখ্যাত মনীষিগণের জীবন-কাহিনী এবং অতীত যুগের বড় বড় ঘটনা ও রীতিনীতি সম্পর্কে জানা যায় এবং যা বিগত যুগসমূহে সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে।

ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও শাব্দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রকৃত অর্থ উপলব্দি করা যায়। বাংলায় ইতিহাস 'ঐতিহ্য' শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে 'অতীতে যা ঘটেছে'।[১] কিন্তু ইতিহাসের প্রতিশব্দ হিসেবে History ব্যবহার করা হয়।[২] History মূলত গ্রিক শব্দ যার আভিধানিক অর্থ হলো গবেষণা বা সযত্ন অনুসন্ধান।[৩] গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস সর্ব প্রথম তাঁর গবেষণা কর্মের নামকরণে History বা ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করেন এবং আজ পর্যন্ত বিষয়টি সমগ্র বিশ্বে এ নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ইতিহাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ History যা গ্রিক ভাষার শব্দ Historia থেকে এসেছে।[৪] যার আভিধানিক অর্থ হলো- 'সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পিত অনুসন্ধান' (An inquiry designed to elicit the truth.)[৫]

'ইতিহাস' এর আরবী প্রতিশব্দ خبر বা تاريخ। তবে বহুল প্রচলিত تاريخ (তারিখ)। এর অর্থ সময়, কাল লিপিবদ্ধকরণ বা সময়ের চিহ্নিতকরণ।[৬]

'ইতিহ' সংস্কৃত শব্দ থেকে বাংলায় 'ইতিহাস' শব্দটি এসেছে। 'ইতিহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐতিহ্য। ইতিহাস শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো, ইতি + হ = ইতিহ এবং অস্ + ঘঞ = আস। এখানে 'ইতিহ' শব্দের অর্থ সমাচার বা ব্যাপার, আর আস শব্দের অর্থ হচ্ছে নিক্ষেপ করা।[৭] অতএব, ইতিহাস শব্দের অর্থ হচ্ছে- অতীতের যাবতীয় কার্যকলাপকে বর্তমানে নিক্ষেপ করা। ইতিহাস মানবসমাজের জীবনযাত্রার সামগ্রিক ঘটনাবহুল অতীত ও বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপকে সঠিক ও সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন

---

১ ড. এম. দেলওয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭ খ্রি.), পৃ.০৫; মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, *ইতিহাসতত্ত্ব* (ঢাকা: আবিস্কার পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ.১৫-১৬।

২ Sailendra Biswas, *Samsad English Bangla Dictionary* (Calcata: Shahitha Songsod, 22nd edition, 1988 AD), p. 471.

৩ মোহাম্মদ এনায়েত রহমান, *ইতিহাস পরিচিতি* (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, পূর্ণমুদ্রণ ২০২২ খ্রি.), পৃ.০৩; ড. এম. দেলওয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৫।

৪ ড. এম. দেলওয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৫; *ইতিহাস পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৩।

৫ *ইতিহাস পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৩।

৬ ড. মো: আখতারুজ্জামান, *মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি.), পৃ.২২।

৭ ড মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ.২৬৩; *ইতিহাস পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৩।

করে। এটি মানব গোষ্ঠীর অতীত কার্যাবলির একটি দর্পণ স্বরূপ। তাই ইতিহাসের অর্থ বলতে আমরা মানবজাতির অতীত ঘটনার সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিক বিবরণের সত্য অংশটিকে বুঝি।[৮]

ইবনে খালদুন ইতিহাসের পরিচয়ে বলেন, 'ইতিহাস অর্থগতভাবে কেবলমাত্র রাষ্ট্র বা ধর্ম নয়, ইতিহাস হলো মানুষের কার্যাবলীর বিবরণী, সভ্যতা বিকাশের অমর কাহিনী।'[৯] R-Flint এবং C.H Oman এর দৃষ্টিতে 'মানুষের কার্যাবলি লিপিবদ্ধকরণে মানুষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকেই ইতিহাসের সর্বোত্তম সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।'[১০]

ড. মো: আখতারুজ্জামানের মতে, 'আধুনিক যুগে ইতিহাসের সাধারণ ধারণা, যুক্তিসঙ্গভাবেই সমস্ত জীব ও জড় জগতকে অন্তর্ভুক্ত করে।'[১১]

ইংরেজি HISTORY শব্দটি বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা উর্পযুক্ত বিষয়টির সাথে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: HISTORY = H + 1 + S + T + 0 + R+ Y.

H = Human = মানুষ।

I = Investigation = অনুসন্ধান।

S = Society = সমাজ।

T = Truth = সত্য।

O = Origin = উৎস

R = Record = বিবরণ

Y = Yore = প্রাচীনকাল বা অতীত।[১২]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস বলতে অতীত সমাজের মানুষের কর্মকাণ্ডের উৎস ভিত্তিক বিবরণ যা থেকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়াকে বুঝায়।

ইতিহাসের পারিভাষিক পরিচয়

ইতিহাস গোষ্ঠীবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতের কর্মকাণ্ডের বিবরণী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ কিভাবে তার পারিপার্শ্বিক সমস্যাকে মোকাবেলা করে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং অর্থনীতি গড়ে তুলেছে তা ইতিহাসে আলোচিত হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু বহুমাত্রিক হওয়ায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগে একে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যে সব সংজ্ঞা

---

[৮] *ইতিহাস পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৩।

[৯] মো: আয়েশ উদ্দিন, *রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি* (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ.০৭।

[১০] R-Flint, *History of Philosophy of History* (New York, 1894), p.7; C.H. Oman, *On the Writing of History* (New York, 1939), p.v.

[১১] *মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ.০২।

[১২] *ইতিহাস পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৩।

এ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ বা পণ্ডিত মহলে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে সেগুলো আলোকপাত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর গ্রন্থ Histories এর প্রারম্ভেই বলেছেন, This is an account of the investigations (Historia) made by Herodutus of Halicarnassus. অর্থাৎ এটি হলো হলিকারনাসাসের হেরোডোটাসের[১৩] অনুসন্ধানের বিবরণ।[১৪] অন্যত্র বলেছেন, "ইতিহাস হলো অতীত ঘটনার সত্য ও সুন্দর বর্ণনা।"[১৫]

ঐতিহাসিক অশীনদাস গুপ্ত ইতিহাস ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয় ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস'।[১৬]

التاريخ: معرفة الآجال وحلولها وانقضاء العدد وأوقات التاليف ووفات الشيوخ ومواليدهم والرواة عنهم فيعرف بذلك كذب الكذابين وصدق الصادقين.

অর্থাৎ, ইতিহাস হলো, নির্দিষ্ট সময়সীমার পরিচয়, তার সমাধান, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেষ হওয়া ঘটনা, বিভিন্ন সমাপ্ত রচনাপুঞ্জি, শায়েখদের মৃত্যু, তাদের জন্ম, সেই সাথে তাদের মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা এবং সত্যবাদীদের সত্যের পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।[১৭]

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, "নবী, খলিফা, বাদশা এবং দীনদুনিয়ার কীর্তিমান লোকদের জীবন ও কর্মের সংবাদ ইতিহাস।"[১৮]

---

[১৩] **হেরোডোটাস:** হেরোডোটাস ছিলেন প্রখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক। তবে তাঁর জীবন সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসে কোন কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বাইজেনটাইন নগরে সংকলিত 'সুদা' (Suda) নামে অভিধানে (Lercon) তাঁর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে। তবে তার রচিত কালজয়ী গ্রন্থই তার সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য যথেষ্ট। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ অব্দে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে গ্রীস বসতি হেলিকারনাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় হেলিকারনাস পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। পারস্য যুদ্ধকালে হেলিকারনাস এর রাণী আর্টেমিসিয়া সালামিসে জারক্সেস এর সহায়তা করেছিলেন। হেলিকারনাস হেরোডোটাসের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় তারই আত্মীয় এবং কবি পানইয়াসিস এর সাহচর্যে। পানইয়াসিস এর জীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কাজেই হেরোডোটাস অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এ থেকে অনুমান করা যায়। পানইয়াসিস এর নেতৃত্বে হেরোডোটাস সেখানকার টাইরেন্ট (স্বৈরাচারী) লিগডিমাস এর কবল থেকে জন্মভূমিকে মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে পানইয়াসিস নিহত হলে হেরোডোটাস প্রাণভয়ে স্যামস-এ পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে টাইরেন্ট লিগডিমাসের পতন হলে হেরোডোটাস জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। কোন ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী হেরোডোটাসকে শত্রু ভেবে তার প্রতি সন্দেহপ্রবণ হলে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে এথেন্স চলে যান এবং এথেন্স তার দ্বিতীয় জন্মভূমিতে পরিণত হয়। তিনি কর্মজীবনে এথেন্সের আত্মিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। এথেন্সে তিনি নাট্যকার ও কবি সোফোক্লিস এবং রাষ্ট্রনেতা পেরিক্লেসের বন্ধুত্ব লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে সুরীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এটি ছিল দক্ষিণে ইতালিতে গ্রীসের উপনিবেশ। তার পরবর্তী জীবন ও ভ্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব ৪২৮ অব্দে তার মৃত্যু হয়। দ্র. মোবাশ্বের আলী, *গ্রীসের ঐতিহাসিক* (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রি.), পৃ.১০; মো: রমজান আলী আকন্দ, *ইতিহাস পরিচিতি* (ঢাকা: প্রগতি পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ.১৯০।

[১৪] মোবাশ্বের আলী, *গ্রীসের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ.৯।

[১৫] শাহেদ আলী, *ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২য় সংস্করণ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ.১১; *ইতিহাস পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.০৫।

[১৬] অশীনদাস গুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য* (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ.১২।

[১৭] জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, *আস-সামারিখী ফী ইলমিত তারিখ* (বৈরূত: মাকতাবাতুল আদব, তা.বি.), পৃ.১৭।

[১৮] জিয়াউদ্দীন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ১ম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ.৭।

ঐতিহাসিক R.G. Collingwood এর মতে, The subject matter of history is not the past as such but the past for which we have evidence. "অতীত শুধু অতীত বলেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয় বরং সেই অতীতই ইতিহাস- যার সাক্ষ্য প্রমাণাদি আমাদের হাতে আছে।"[১৯]

V.D Ghate এর মতে, History is a scientific study and a record of our complete past. "ইতিহাস হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পাঠ বা অনুধ্যান এবং মানবজাতির সম্পূর্ণ অতীতের একটি জীবন্ত প্রমাণ চিত্র।"[২০]

প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক অধ্যাপক E. H. Carr 'What is History' গ্রন্থে ইতিহাস সম্পর্কিত যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা হলো, My first answer, therefore, to the question what is history? Is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past. "ইতিহাস কি এ প্রশ্নের জবাবে আমার প্রথম বক্তব্য: এটা ঐতিহাসিক ও তথ্য উপাত্তের মধ্যকার নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।"[২১]

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, ইতিহাস হলো অতীতকালের ঘটনাবলি ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ মাত্র। এটি আমাদের সামনে এমন সব উদাহরণ ও বক্তব্যসহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যাতে আমরা অতি সহজেই এসব বিষয়কে আমাদের আলোচনা ও দৃষ্টান্তদানের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, কালচক্রের আবর্তন সব বিষয় এবং বস্তুকে নিয়ত পরিবর্তন করতেছে। একটি রাষ্ট্র শক্তির উদ্ভব ঘটতেছে, এর ব্যাপক বিস্তৃতি পৃথিবীর সমৃদ্ধি আনয়ন করতেছে, আবার কালের অমোঘ বিধানে এর পতন আসন্ন হচ্ছে এবং পরিণামে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শক্তি এ বাহ্য বিবরণের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এটি আমাদের সম্মুখে বিষয় ও ঘটনাবলির কারণ এবং বিকাশ ও বিনাশের মৌলিক উপাদানসমূহকে উৎঘাটিত করে। এ কারণেই ইতিহাস যথার্থভাবে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং একে বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত।[২২]

---

[১৯] R.G. Collingwood, *The Idea of History* (London: Oxford Paperbacks, 1973), p.13

[২০] V.D. Ghate, *Suggestions for the teaching of History in India*, Bombay, p.7.

[২১] E.H. Carr, *What is History* (Cambridge: a Pelican Book, 1961).

[২২] 'History is no more than information about political events, dynasties and occurrences of the remote paste, diligently presented and spiced with proverbs. It serves to entertain large. Crowded gatherings and brings to us an understanding of human affairs. (It shows). How changing conditions affected (human affairs). How certain dynasties came to occupy and ever wider space in the world, and how they settled the earth until they heard the call their time was up. The inner meaning of history, on the other hand, involves speculation and an attempt to get at the truth, subtle explanation of the causes and origins of existing things, and deep knowledge of the how and why of events, (History) therefore, is firmly rooted in philosophy. It deserves to be accounted a branch of (philosophy). Ibn Khaldun, *The Muqaddimah* (United State: Princeton University Press, 1st Princeton Classics edition, 2015), p.6.

ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে রবার্ট ভি. ডেনিয়েলস লিখেছেন, The record of history is far more than a chronicle of events. It not only records what people have done but what they have tried to do, the motives and goals that impelled them to strive for something better. History is a repository of human values and aspirations, the accumulation efforts, experience, hopes and achievements that have gradually civilized humanity. "ইতিহাস ঘটনাবলির ধারাবাহিক বিবৃতি মাত্র নয়। এতে মানুষ কী করেছে সে কথাই লেখা থাকে না, তারা কী করতে চেয়েছে এবং কী মনোভাব ও লক্ষ তাদের আরো ভালো কিছু করতে অনুপ্রাণিত করছে তাও লেখা থাকে। ইতিহাস মানুষের মূল্যবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি ভাণ্ডার, এতে জমা হয়ে আছে তার প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা, আশা এবং সাফল্যসমূহ যা ধীরে ধীরে মানুষকে সভ্য করে তুলেছে।[২৩]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় ইতিহাসের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, The term history may be used in two quite different senses; it may mean (i) The events and actions that together make up the human past or (ii) The account given of that past and the modes of investigation whereby they are arrived at or constructed. When used in the first sense, the word refers to what as a matter of fact happened, while when used in the second sense it refers to the study and description of those happenings. "দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বুঝাবার জন্য ইতিহাস শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম অর্থটি হলো মানুষের সকল বিষয় ও ঘটনার মিলিত রূপ যা দিয়ে তার অতীত গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অর্থে ইতিহাস সে অতীতের প্রদত্ত বর্ণনা এবং অনুসন্ধানের পদ্ধতি যার দ্বারা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে অথবা যে পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। প্রথম অর্থে যখন ব্যবহৃত হয় তখন অতীতে বস্তুতপক্ষে কী ঘটেছিল তা বুঝান হয় এবং দ্বিতীয় অর্থে যখন বুঝান হয় তখন ঐসব ঘটনার বিবরণ ও পঠন-পাঠনকে বুঝান হয়।"[২৪]

অক্সফোর্ড ইংরেজি ভাষার অভিধানে ইতিহাসের ৮টি সংজ্ঞা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাটি হলো, "That branch of knowledge which deals with past events, as recorded in writings or otherwise ascertained, the formal record of the past especially of human affairs or actions, the study of the formation and growth of countries and nations." "ইতিহাস মানব জ্ঞানের ঐ শাখা যা অতীত ঘটনাবলি নিয়ে চর্চা করে, ঐসব ঘটনাবলি হয় লিখিত থাকে অথবা অন্যকোনভাবে সত্য হিসেবে গৃহীত হয়। এটা অতীতের আনুষ্ঠানিক রেকর্ড যা মানুষের কাজ ও বিষয়াবলির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং কীভাবে বিভিন্ন দেশ ও জাতি গঠিত ও বিকশিত হয়েছে এটা তারই বিবরণ।"[২৫]

---

[২৩] মো. গোলাম কিবরিয়া, *ইতিহাসতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[২৪] *Encyclopedia Britannica*, Vol-8, Chicago-1973, 15th Edition, p.961.

[২৫] *The Oxford English Dictionary*, Vol-5, 3rd Edition, p.305.

ঐতিহাসিক আবুল ফজল ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "History is a unique pearl of science which quiets perturbations, physical and spiritual, and gives light to darkness external and internal. Chronicles are records of festivities and convivial parties as well as an account of battles and campaigns. They embody the knowledge of mankind, the wisdom of the wise, the mistakes of the learned, the vicissitudes of life, vain endeavor and empty yearnings and other wonderful singularities of human existence." [২৬]

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায় যে, ইতিহাস গোষ্ঠীবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিবরণী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমাজ, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও রাষ্ট্রের আদ্যপান্তের চিত্তাকর্ষক ও প্রামাণ্য সমীক্ষা হলো ইতিহাস। মানুষের জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, এমনকি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে সংঘটিত ও প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত ঘটনাসমূহের ধারাবাহিক বিবরণই হলো ইতিহাস। মূলত: ইতিহাস হলো সকল প্রকার অধ্যয়নের শেকড়।

মানুষের একত্রে বসবাসকে 'তামাদ্দুন' বা সংস্কৃতি এবং সে সমাজবদ্ধ জনপদকে 'মদিনা' বা নগর বলে। এদের ওপর দিয়ে স্বভাবসিদ্ধভাবে অবস্থাদি অতিক্রান্ত হয় তাকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের মুখ থেকে শুনে শুনে সে ঘটনাবলিকে সংকলন করা এবং শিক্ষণীয় উপদেশস্বরূপ তা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাওয়াকে ইতিহাস বলে।

ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য দু'টি। যথা:-

১. অতীতের বিভিন্ন প্রজন্মের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ।

২. জাতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা থাকা এবং সেগুলোকে সমুন্নত রাখা।

উক্ত উদ্দেশ্যদ্বয় এতটাই গুরুত্ব রাখে যে, এ দুটিকে সামনে রাখলে কোনো মুসলমানের পক্ষে নিজের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন থাকা মানায় না। বিশেষত দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ইতিহাসের গুরুত্ব অনেকটা বৃদ্ধি পায়।[২৭]

ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

ইতিহাস পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের কাহিনীসমূহ সম্পর্কে অবহিত করে মন-মস্তিস্কে একটি শুভ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। মানুষের প্রকৃতিতে একটি বিশেষ ধরনের তৃষ্ণা এবং স্পৃহা থাকে যা অজানা দেশের

---

[২৬] C.H. Philips, *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, Journal of the American Oriental Society, Vol.82, No.2 (Apr.-Jun., 1962), p-146.

[২৭] ইসমাঈল রেহান, *তারিখে উম্মত 'ইতিহাস পাঠের পূর্বকথা'*, অনু. মহিউদ্দিন কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১; *আল-ইলান বিত তাওবিখ লিমান জাম্মাত তারিখ*, পৃ. ৫০-৮০; আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, *ইতিহাস কথা কয়* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ১ম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ.১৬।

ভ্রমণে, বাগবাগিচা ও পুষ্পোদ্যান বিচরণে এবং দুর্গম গিরি-পর্বত ও মরুপ্রান্তরে পরিভ্রমণে উদ্দীপ্ত করে। এ সহজাত প্রবৃত্তিই শিশুদেরকে রাতের বেলা পাখ-পাখালির গল্প শুনায়, যুবকদেরকে তোতা-ময়নার উপাখ্যান শুনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: 'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।'[২৮]

আল্লাহ তা'আলার এ সুস্পষ্ট নির্দেশ পালন করার মধ্যেই ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের এ সহজাত প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রবৃত্তিসমূহের স্রষ্টা আসমানি কিতাবসমূহে মধুময় আস্বাদন রেখে দিয়েছেন। বনি ইসারাইলের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বজনবিদিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বারবার তাদেরকে এ বলে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا .....

অর্থ: 'হে বনি ইসরাইল! স্মরণ করো.....'।[২৯]

ইতিহাস পাঠে পাঠকের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়। সৎকর্মের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারের প্রবণতা হ্রাস পায়। ইতিহাস পাঠে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়। বহুদর্শিতা, সৎসাহস ও সতর্কতার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও চিন্তাক্লিষ্টতা দূরীভূত হয় এবং নব-উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে সত্যান্বেষণের এবং মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে ধৈর্যস্থৈর্য বৃদ্ধি পায় এবং মন-মগজ সর্বদা সতেজ ও প্রফুল্ল থাকে। মোদ্দাকথা, ইতিহাস-শাস্ত্র হলো হাজার হাজার ধর্মোপদেশ বিতরণকারীর মধ্যে অন্যতম এবং শিক্ষা গ্রহণের সর্বোত্তম মাধ্যম। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে পাঠক সর্বদা নিজেকে রাজা-বাদশা, দিগ্বিজয়ী নবি-রাসূল, ওলি-আওলিয়া, জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, পণ্ডিত ও কৃতী মনীষীদের দরবারে উপবিষ্ট দেখতে পায় এবং এসব মনীষীদের নিকট থেকে সে অহরহ জ্ঞানার্জন করতে থাকে। বড় বড় রাজা-বাদশা, উজির-উজারা ও সেনাপতিদের দ্বারা সংঘটিত ভুলত্রুটির কথা অবগত হয়ে সে নিজেকে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়। অন্য কোনো বিদ্যা পাঠ মানুষ এত সানন্দে ও অবসন্নতামুক্ত হৃদয়ে অব্যাহত রাখতে পারে না, যতটুকু পারে ইতিহাস পাঠে।

[২৮] আল কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৪৩; সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:০৭।
[২৯] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ০২ : ৪০, ৪৭ ও ১২২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামের ইতিহাস পরিচিতি

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র মুসলিম জাতিই এমন এক জাতি এবং ইসলাম ধর্মই এমন একটি ধর্ম, যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আনুপূর্বিক সুসংরক্ষিত রয়েছে। এর কোন একটি অংশ বা অধ্যায়ও এমন নয়, যাতে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ আছে। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত সংঘটিত যাবতীয় ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদাসীনতা প্রদর্শন করেননি। মুসলমানদের জন্যে এটি সঙ্গতভাবেই গর্বের কারণ যে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তথা প্রত্যেকটি ঘটনার সমসায়িক ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার সাহায্যে তারা বিন্যাস ও রচনা করতে পারেন এবং যেসব সমসায়িক ঐতিহাসিক ও বিশ্বস্ত রাবিদের বর্ণনা অনস্বীকার্য ধারাবাহিকতাও তারা সপ্রমাণিত করতে পারেন। মোদ্দাকথা, পৃথিবীতে কেবল মুসলমানই এমন এক জাতি যারা তাদের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি এ ব্যাপারে মুসলমানদের সমকক্ষ নয়। ইসলামের ইতিহাসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে এতই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, প্রতিটি ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে নিজেরা মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা তাতে সন্দেহ হতে পারত যে, ইতিহাস লেখকের নিজস্ব খেয়ালখুশি ও প্রবণতার ছাপ পড়ায় পাঠকের মনে তার প্রভাব পড়েছে এবং ঘটনা সম্পর্কে তার নিরপেক্ষ বিচারের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। ফলে মনের অজান্তেই পাঠক ইতিহাস লেখকের বিশেষ প্রবণতার অন্ধ অনুসারী সেজে বসেছে। ইসলামের ইতিহাসের মাহাত্ম্য এখন অন্তরে আরও বেশি রেখাপাত করে, যখন দেখা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়কে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ও যুক্তির বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করলেও তাতে কোনরূপ ত্রুটি বৈকল্য বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র পাওয়া যায় না।

পরিভাষায় বলা যায় যে,

التاريخ الإسلامي هو تاريخ الشعوب والدول الإسلامية منذ بدء الإسلام وحتى العهد الحاضر، ويمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي. ولدى الدين الإسلامي فرصة لمزيد **من الانتشار**؛ فإنه يتصل بأرض بكر ومن المكن أن نجذب الكثيرين للإسلام، لو ربينا جيلاً من الدعاة، يحسن تقديم الإسلام للناس، وعلى هذا فخريطة العالم الإسلامي مفتوحة قابلة للامتداد.

অর্থাৎ, "ইসলামের ইতিহাস হল ইসলামের শুরু থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলামী জনগণ এবং দেশগুলির ইতিহাস এবং আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলাম ধর্মের আরও প্রসারের সুযোগ রয়েছে। এটি একটি কুমারী ভূমির সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং আমাদের পক্ষে অনেককে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব, যদি আমরা প্রচারকদের একটি প্রজন্ম গড়ে তুলি, যারা ইসলামকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে পারদর্শী এবং এর মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বের মানচিত্র উন্মুক্ত এবং প্রসারিত হয়।"[৩০]

---

[৩০] আহমদ মা'আরুফ আল-উসায়রী, *মুজিযুত তারিখীল ইসলামী মুনজু আদম আলাইহিস সালাম ইলা আসরিনাল হাদীর* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মুলুক, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ.৭।

إن من إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما في وقائع التاريخ من سيرة أهل الجور والعدوان، وما ترتب عليها من فساد وخراب وهلاك، استقبحوها وأعرضوا عنها. وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها، وما فيها من الذكر الجميل بعد ذهابهم، وأن بلادهم وممالكهم عمرت، وأموالهم درت، استحسنوا ذلك ورغبوا فيه، وثابروا عليه.

অর্থাৎ, "যাদের কাছে হুকুম ও নিষেধ আছে, তারা যদি ইতিহাসের ইতিহাসে মানুষের নিপীড়ন ও আগ্রাসন এবং এর ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি, ধ্বংস ও ধ্বংসের ঘটনা খুঁজে পায়, তারা তা ঘৃণা করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যদি তারা দেখে যে ন্যায়পরায়ণ শাসকদের জীবন এবং তাদের ভালবাসা, এবং তারা চলে যাওয়ার পরে তাদের মধ্যে সুন্দর স্মরণ, এবং তাদের দেশ এবং রাজ্যগুলি বিকাশ লাভ করেছে এবং তাদের অর্থ বিস্তৃত হয়েছে, তারা এটিকে অনুমোদন করবে, এটি কামনা করবে, এবং এটার অধ্যবসায় করবে।"[৩১]

التاريخ مدرسة الأجيال يتعلم فيه الأحياء ما ينفعهم فيعملونها وما يضرهم فيجتنبونه، وهو الجسر الذي يصل ماضي الأمة بحاضرها.

অর্থাৎ, "ইতিহাস হল প্রজন্মের পাঠশালা, যেখানে জীবিতরা শিখে কী তাদের উপকার করে, তাই তারা তা করে, এবং কী তাদের ক্ষতি করে, তাই তারা এটিকে এড়িয়ে চলে, এবং এটি সেই সেতু যা জাতির অতীতকে তার বর্তমানের সাথে সংযুক্ত করে।"[৩২]

ইতিহাস লেখার সাধারণ পদ্ধতি

ইসলামের ইতিহাস রচনায় দুটি পদ্ধতি আবির্ভূত হয়:

পুরানো পদ্ধতি: ভাষ্য বা বিশ্লেষণ ছাড়াই ঘটনা পুনঃগণনা করা।

আধুনিক শৈলী: ভাষ্য এবং বিশ্লেষণে আগ্রহ, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনাকে উপেক্ষা করা।

এটা স্পষ্ট যে দুটি পথ একে অপরের পরিপূরক এবং তাদের মধ্যে একটি একা সঠিক নয়।[৩৩]

ইসলামের ইতিহাস সংকলনের সূচনা:-

মুসলমানদের লেখা প্রথম কিতাব হল আল্লাহর কিতাব। তারা এটি লিখতে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু রিদ্দার যুদ্ধ বা ধর্মত্যাগের যুদ্ধ এবং ভন্ড নবীদের সাথে যুদ্ধে বেশিরভাগ হাফেজকে হত্যা করা হয়। তাই তাদের হারিয়ে যাওয়ার এবং ভুলে যাওয়ার ভয়ে এটি লিখতে বাধ্য করেছিল।

- ✓ নবীর হাদিস সংযোজন করার ক্ষেত্রে, দ্বিধা বেশি ছিল, এবং তিনি কুরআনের সাথে মিশে যাবে এই ভয়ে এটি লিখে রাখেননি। আবু বকর (রা.) লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা না লিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং উমর (রা.)ও তার পথ অনুসরণ

[৩১] *মুজিযুত তারিখীল ইসলামী মুনজু আদম আলাইহিস সালাম ইলা আসরিনাল হাদীর*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

[৩২] উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাসীর, *কিতাবু উনওয়ানুল মাজীদ* (সৌদি আরব: মাতবাআতু দারাতুল মালেক আব্দুল আজিজ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ.২১।

[৩৩] আহমদ শিবলী, *আত তারিখ আল ইসলামী* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৩১।

করলেন। খ্রিস্ট্রীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি কিংবা ৮ম খ্রি. পর্যন্ত হাদীস রচনা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।

- ✓ তদানুসারে, অন্যান্য ইলম বা জ্ঞান-বিজ্ঞানগুলোকে একত্র বা সংকলন করতে মুসলমানদের দ্বিধা ছিল বেশি। তাই, ইতিহাসবিদরা যে সংবাদগুলি লিখেছিলেন সেগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ প্রথম ঘটনাগুলি লিখিতভাবে ঐতিহাসিকদের কাছে পৌঁছায়নি, তবে তারা বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে তাদের কাছে পৌঁছেছিল।
- ✓ ইসলামী ইতিহাসের সংকলন শুরু হয় তৃতীয় শতাব্দী হিজরি এবং এর প্রথমগুলির মধ্যে ছিল 'সিরাত ইবনে হিশাম' (২১৩ হিজরী / ৮২৮ খ্রিস্টাব্দ)।
- ✓ ইসলামের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন বইগুলির মধ্যে: 'তারিখুত তাবারী' (৩১০ হিজরী / ৯২২ খ্রিস্টাব্দ), 'আল-কামিল ফীত তারীখ' লি ইবনে আছীর (৬৩০ হিজরী / ১২৩২ খ্রিস্টাব্দ), 'আল-বিদায়াহ আন-নিহায়াহ' ইবনে কাছীর (৭৭৪ হিজরি / ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ) এবং এরকম অন্যান্যগুলো।
- ✓ সাধারণত ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সাম্প্রতিক খুব কম লেখালেখি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ড. আহমেদ শালাবি 'মাওসুআতু আত-তারিখীল ইসলামী' (ইসলামী ইতিহাসের বিশ্বকোষ) এবং মাহমুদ শাকের 'আত-তারীখু আল-ইসলামী' (ইসলামের ইতিহাস)।[৩৪]

ইসলামের ইতিহাস রচনার ভিত্তি

দু'টি শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে ইসলামের ইতিহাস রচিত হয়েছে-

১. সিরাত রচনা এবং ২. রিজাল শাস্ত্র অর্থাৎ হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী-বিষয়ক শাস্ত্র। হাদিস শাস্ত্রের সঙ্গে এ দু'টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হাদিস শাস্ত্রের একটি শাখা হলো সিরাত রচনা, যাকে 'সিয়ার' ও 'মাগাযি' বলা হয়। সিরাতবিদরা অনেক আলোচনার পর একে একটি আলাদা শাস্ত্রে রূপ দিয়েছেন।[৩৫]

আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইতিহাসের গুরুত্ব

আল-কুরআনুল কারীমের আলোকে ইতিহাসের গুরুত্ব প্রমাণিত। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলের ইতিহাস অত্যন্ত সারগর্ভ, অলঙ্কারমণ্ডিত ও প্রভাবময় শৈলীতে তুলে ধরেছে কুরআনুল কারিম। যাতে করে সত্যের ঝাণ্ডাবাহীরা মনোবল বাড়াতে পারে এবং অস্বীকারকারীরা তাদের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

অর্থ: "আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যা দ্বারা তোমার অন্তরকে শক্ত করছি।"[৩৬]

---

[৩৪] *মুজিযুত তারিখীল ইসলামী মুনজু আদম আলাইহিস সালাম ইলা আসরিনাল হাদীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

[৩৫] মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, কাসিম আবদুল্লাহ ইবরাহিম, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সালিহ, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: মুহাম্মদ পাবলিকেশন, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩৩-৩৪।

কুরআনুল কারিমের অনেক সূরা পূর্ববর্তী জাতিদের ঘটনা বর্ণনা করেছে, যাতে করে তাদের মন্দ পরিণতি থেকে মানুষরা শিক্ষা পায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থ: "তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।"[৩৭]

আল-কুরআন কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়; হেদায়েতের বাণী। কুরআনে ইতিহাস এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন মানবজাতি হেদায়াত লাভ করে এবং আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

তদ্রুপহাদিসেও ইতিহাসের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তী জাতি ও নবিদের বহু ঘটনা বলেছেন, যা হাদিসে সংরক্ষিত রয়েছে। এসব বর্ণনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো- উপদেশদান ও শিক্ষাগ্রহণ। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ও কাজ ছাড়াও সে যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যাতে কিয়ামত অবধি আগত মানুষের জন্য তা হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়। তেমনি তাবেয়িগণ ও হাদিস বর্ণনাকারীগণ সিরাত ও সাহাবিদের জীবনী সংরক্ষণ করেছেন। সিরাত ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের বিবরণের বড় ভাণ্ডার হাদিসের কিতাব থেকেই পাওয়া যায়। হাদিস ইতিহাসের সমষ্টি না হলেও পরোক্ষভাবে তাতে ইতিহাসের অনেক কাহিনী এসেছে। হাদিসের কিতাবে ইসলামী ইতিহাসের যে অংশ রয়েছে, নির্ভরযোগ্যতা বিবেচনায় তা ইতিহাসের সকল উৎস থেকে সেরা ও উৎকৃষ্ট। হাদিসের ভাণ্ডারে ইতিহাস থাকা এ কথার প্রমাণ বাহক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও শ্রেষ্ঠযুগের ওলামায়ে কেরামের নিকট ইতিহাসের গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক।

---

[৩৬] আল-কুরআনুল কারীম, সূরা হুদ, ১১ : ১২০।

[৩৭] আল-কুরআনুল কারীম, সূরা ইউসুফ, ১২ : ১১১।

তৃতীয় অধ্যায়
আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন

প্রথম পরিচ্ছেদঃ যুলকারনাইন এর পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আল কুরআনুল কারীমে যুলকারনাইন

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আল হাদিসে যুলকারনাইন

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় ও অন্যান্য অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ
যুলকারনাইন এর পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আল-কাহাফে যুলকারনাইন এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি প্রাচীন আরবের একজন ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী ও শক্তিধর বাদশাহ ছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য ও সহযোগিতা বলে সমস্ত ভূ-খণ্ডের উপর তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন। এসব দেশের যালিম ও কাফিরদের তিনি কঠোর হাতে দমন করে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন। সকল দেশের অধিবাসীরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তাদের মধ্যে তিনি পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি দিগ্বিজয়ে বের হন। বস্তুত তিনি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত এক সফলকামী ও বিজয়ী বীর এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহ। তিনি ইবরাহীম (আ.) এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন; পাশ্চাত্যে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরের পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। ইয়াজুজ-মাজুজের বর্বরতা ও লুটতরাজ হতে এলাকার অধিবাসীদের নিরাপদ রাখার জন্য তিনি দু'পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি বিশাল লৌহ ও তামা মিশ্রিত প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দেন।

যুলকারনাইন এর পরিচয়

যুলকারনাইন (ذو القرنين) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। **القرن** (কারন) অর্থ: শিং। ذُوْ الْقَرْنَيْنِ (ফুল করনাইন)-এর অর্থ : দু'শিং এর মালিক বা অধিকারী। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মাথার চুলে দু'টি গুচ্ছ, তাই যুলকারনাইন (দু'গুচ্ছের অধিকারী) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন, রোম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়। কেউ এমনও বলেছেন যে, তাঁর মাথায় শিংয়ের অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল।[১] আলী (রা.) যুলকারনাইন নামকরণের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তিনি যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিমের প্রান্তসীমা পরিভ্রমণ করেন সেহেতু তাঁকে যুলকারনাইন নামে অভিহিত করা হয়।[২]

---

[১] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াজিদ আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলি আইল কুরআন* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮-৩৭১; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরূত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৩; জালালুদ্দিন আল-মহল্লী ও জালালুদ্দিন আস-সূয়ুতী, *তাফসীরুল জালালাইন* (কায়রো: দারুল হাদিস, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), পৃ.৩৯৩-৩৯৫; মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪শ সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১৬-৬১৯।

[২] আবুল কাশেম মাহমুদ ইবনে আমর ইবনে আহমদ আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল* (বৈরূত: দারুল কিতাবীল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ.৭৪৩; আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন আল কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন* (রিয়াদ: দারু আলিমিল কুতুব, ২০০৩ খ্রি.), ১১তম খণ্ড, পৃ.৪৬-৪৮; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (বৈরূত: তাবিয়্যাতি লিন-নাশরি ওয়াত

তাঁর (যুলকারনাইন) ইতিহাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে তিনশত বছর পূর্বের ইতিহাস। কেউ কেউ বলেন, যুলকারনাইন এর ইতিহাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের এক হাজার বছর বা তার অধিক সময় পূর্বের ইতিহাস। এছাড়াও অন্যান্যরাও একাধিক বর্ণনা উপস্থাপন করেন।[৩]

ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী, ১৬০০ বছর দুনিয়াতে জীবিত থেকে যুলকারনাইন দীনের তাবলীগ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসী (রহ.) মতে, যুলকারনাইন ৫০০ বছর রাজত্ব করেন।[৪]

সুতরাং তিনি কে?..... এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো আলিমগণ যুলকারনাইনের পরিচয় প্রদানে ঐতিহাসিক তিনজন বিখ্যাত পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন:

১. আল-ইস্কানদার আল-মাকদুনী

২. সা'ব যুলকারনাইন আল-হিমায়রী

৩. ইবরাহিম (আ.) এর যুগের সৎ ব্যক্তি; যার পরিচয় জানা যায় নি।

এছাড়া আরেকটি অভিমত হচ্ছে: যুলকারনাইনের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "কাউরেস আল-আখমিনী আল-ফারেসী"।[৫] যুলকারনাইনকে ইহুদিরা (হিব্রু ভাষায়) 'খোরাস' বলে, গ্রিকরা 'সাইরাস', পারসিকরা 'গোরাশ' ও 'কায়আরশ' এবং আরবাসীরা 'কায়খসরু' বলে।[৬] আলিমগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর অন্যান্য নামও উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য অভিমতগুলো থেকে আমরা প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রের আদলে যুলকারনাইন এর পরিচয় প্রদান করবো। নিম্নে সে অভিমতগুলো তুলে ধরা হলো:

তাওযী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ.০৬; আহমদ আলী সাহারানপুরী, *আল-হাশিয়া আলা সহীহ আল-বুখারী* (পাকিস্তান: কদীমী কুতুবখানা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.৪৭২, টীকা:০৮।

[৩] মুহাম্মদ খয়রু রমাদান ইউসুফ, *যুলকারনাইন আল-ক্বাইদ আল ফাতেহ ওয়াল হাকেমুস সালেহ দিরাসাতান তাহলিলিয়্যাতান মুকারাতান আলা দুইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াত তারিখ* (দামেশক: দারুল ক্বলাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ.২৫।

[৪] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৯; আবু সানা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল হুসাইনী আল-আলুসী, *রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াল সাবউল মাসালী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ.৩৪৬।

[৫] *যুলকারনাইন আল-ক্বাইদ আল ফাতেহ ওয়াল হাকেমুস সালেহ দিরাসাতান তাহলিলিয়্যাতান মুকারাতান আলা দুইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াত তারিখ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬; মানসুর আব্দুল হাকিম, *যুলকারনাইন আল-মালিকুল আদিল আল্লাযি থ্বফা বিলআরদ* (কায়রো: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ.২৯।

[৬] মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি, *কাসাসুল কুরআন*, অনু. মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ২০১৫ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ.১৬৪।

ইবনে মারদাওয়াইহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, যা যুবায়ের (রহ.) তাঁর কিতাব 'আন-নসব' এ ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে যাহহাক ইবনে মা'আদ।[৭]

وَالإِسْكَنْدَرُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الضحَاكِ بْنِ مَعْدٍ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مِنْ حِمْيَرَ وأُمُّهُ رُوْمِيَّةٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الفَيْلَسُوفِ لِعَقْلِهِ

অর্থাৎ, 'যে মুমিন ইসকান্দার প্রসঙ্গ আল্লাহ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনুয যাহ্হাক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ তথ্য বর্ণিত। যুলকারনাইন হিময়ার গোত্রভুক্ত এবং তাঁর মাতা রোম দেশীয়। বুদ্ধিবৃত্তির কারণে তাঁকে দার্শনিক-তনয় বলা হয়।'[৮]

আবী খায়সামা (রহ.) এর বর্ণনা মতে, তিনি আস-সাআব ইবনে জাব্বিয আল-ক্বলমিস।[৯] কতেকের মতে, তাঁর নাম হলো 'ইয়াস।[১০]

حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر، اسمه مرزبان بن مرذبه اليوناني، من ولد يونان بن يافث بن نوح.

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অনারবদের থেকে হাদীস বর্ণনা করে সে আমাকে তার জ্ঞান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা বলেছেন তা হলো, যুলকারনাইন মিসরের লোক ছিলেন। তার নাম মারজাবান ইবন মারযাবাহ আল-ইউনানী। তাঁর বংশধারা 'ইউনান ইবনে ইয়াফাস ইবনে নুহ (আ.)' এর সাথে সম্পৃক্ত।"[১১]

ইবনে আবী হাতেম সহীহ সূত্রে ইকরামার কাছ থেকে ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (যুলকারনাইন) হলেন 'আন-নুহাস'।[১২] আল্লামা দারে কুতনী ও ইবনে মাকুলা উল্লেখ করেন, নিশ্চয়ই

---

[৭] ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদিসের সনদ খুবই দুর্বল। দ্র. আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৩৭৯ হি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২৭২; আলী (রা.) এর সূত্রেও এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। দ্র. ইমাম আশ-শায়েখ বদরুদ্দীন আবী মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আল-আইনী, *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), ১৫তম খণ্ড, পৃ.২৩৩; আবু হাইয়ান মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে হাইয়ান আসীরুদ্দীন আল আনদালুসী, *আল-বাহরুল মুহীত* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪২০ হি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১৫৮।

[৮] *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

[৯] *আল-বাহরুল মুহীত*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১৫৮।

[১০] সাইয়েদ নেয়াতুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জাযাইরী, *আন-নুরুল মুবীন ফী কাসাসিল আনবিয়ায়ী ওয়াল মুরসালীন* (বৈরূত: মুআসসাসাতুল আলামী লিল-মাতবুয়াহ, ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ.১৪০।

[১১] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর, *আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ লিত-তাবা'আতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৯৭৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.৩০৭; *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১১তম খণ্ড, পৃ.৪৫।

[১২] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২৭৩।

তাঁর নাম হরমুস। তাঁকে বলা হত, হারবীস ইবনে কায়তুন ইবনে রামী ইবনে লান্তী ইবনে কাশলুখীন ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফিছ ইবনে নূহ (আ.)।[১৩]

কেউ কেউ বলেন, তিনি (যুলকারনাইন) হলেন আশক ইবনে সেলুকস।[১৪] আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হলেন আফ্রিদুন বিন আসকায়ান বিন জামশিদ, পারস্যের পঞ্চম রাজা।[১৫]

'তাওরাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "দানিয়াল (আ.) কাশফের মধ্যে দেখলেন ইরানের একজন বাদশাহকে দুই শিং বিশিষ্ট ভেড়ার আকৃতিতে দেখা যাচ্ছিলো। জিবরাইল (আ.) দুই শিং বিশিষ্ট (যুলকারনাইন) ভেড়ার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, এর দ্বারা সেই বাদশাহ উদ্দেশ্য যিনি পারস্য ও মেডিয়া এই দুটি রাজ্যের অধিপতি হবেন। আর নবী হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ. এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইতিহাস উভয়ই এ ব্যাপারে একমত যে, ইরানের এই বাদশাহ ছিলেন খোরাস, যিনি পারস্য ও মেডিয়া রাজ্যকে একত্র করে সাম্রাজ্যের রূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ইহুদিদের আগ্রহ ও অনুরাগের কারণ এটাই ছিলো যে, তাদের নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই বাদশাহ ছিলেন তাদের মুক্তিদাতা। ফলে ইহুদিদের প্রদত্ত উপাধি 'যুলকারনাইন'। ইরাকের রাজবংশের মতটাই বিখ্যাত ও প্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তারা বাদশাহ খোরসের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছিলো। তাতে ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দানিয়াল (আ.)-এর স্বপ্নকে খোদাই করে প্রদর্শন করেছে।"[১৬]

যুলকারনাইনের গোত্র পরিচিতি

وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ مِنْ حِمْيَرِ، وَأُمُّهُ رُومِيَّةٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْفَيْلَسُوفِ ; لِعَقْلِهِ. وَقَدْ أَنْشَدَ بَعْضُ الْحِمْيَرِيِّينَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا يَفْخَرُ بِكَوْنِهِ أَحَدَ أَجْدَادِهِ فَقَالَ:

অর্থাৎ, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলকারনাইন হিমইয়ার গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন রোম দেশীয়। প্রখর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় যুলকারনাইনকে ইবনুল ফায়সালুফ বা মহাবিজ্ঞানী বলা হত। হিমইয়ার গোত্রের জনৈক কবি তাদের পূর্ব-পুরুষ যুল-কারনাইনের প্রশংসায় নিম্নরূপ গৌরবগাঁথা লিখেন:

قَدْ كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ جَدِّيَ مُسْلِمًا ... مَلِكًا تَدِينُ لَهُ الْمُلُوكُ وَتَخْشُدُ

بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ يَبْتَغِي ... أَسْبَابَ أَمْرٍ مِنْ حَكِيمٍ مُرْشِدِ

فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا ... فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وَثَأْطٍ حَرْمَدِ

---

[১৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১০৫।

[১৪] শিহাবুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আর-রুমী আল-হুমাওয়ী, *মুজামুল বুলদান* (বৈরূত: দারু সাদির, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.১৮৪।

[১৫] আল্লামা আবুল ফযল সিহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনুল আজীম ওয়া আস-সাবউল মাসানী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.), ১২তম খণ্ড, পৃ.২৫।

[১৬] তাওরাত, ৪৬তম অধ্যায়, আয়াত-৯-১১; উদ্ধৃতি, *কাসাসুল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮।

مِنْ بَعْدِهِ بَلْقِيسُ كَانَتْ عَمَّتِي ... مَلَكَتْهُمُ حَتَّى أَتَاهَا الْهُدْهُدُ

অর্থাৎ, "যুলকারনাইন ছিলেন আমার পিতামহ, মুসলমান ও এমন একজন বাদশা, অন্যান্য রাজন্যবর্গ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করেন। তিনি অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেন এবং মহাজ্ঞানী পথপ্রদর্শক আল্লাহর প্রদত্ত উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করেন। পশ্চিমে সূর্যের অস্তাচলে গিয়ে সেখানে সূর্যকে এক কর্দমাক্ত কালো জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেন। তাঁর পর আসেন সম্রাজ্ঞী বিলকিস। তিনি ছিলেন আমার ফুফু। বিশাল রাজ্যের অধিকারী হন তিনি। সুলায়মানের হুদহুদ পাখির আগমন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন।"[১৭]

যুলকারনাইন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণসমূহঃ

যুলকারনাইন কোনো নাম নয়, বরং তাঁকে দেয়া একটি উপাধি.. এই উপাধির কারণ কী? এ সম্পর্কে কোন সত্য খবর রয়েছে কি? এ মতামতের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি? আলোচ্য প্রশ্নগুলোর জবাবে যুলকারনাইনকে 'যুলকারনাইন' বলার কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. তিনি (যুলকারনাইন) তাঁর জাতিকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান করলেন। তাঁর জাতি তাঁকে মাথার ডান দিকের শিং-এ আঘাত করে ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবিত করলেন। পুনরায় তিনি তাদেরকে আহবান করলেন। আবারো তারা তাঁর মাথার বাম দিকের শিং-এ আঘাত করল ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আবারো আল্লাহ তাঁকে জীবিত করলেন। সুতরাং এ কারণেই তাঁকে যুলকারনাইন ও রাজার রাজা বলা হয়।[১৮]

وَرَوَى النَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَقَالَ: كَانَ عَبْدًا نَاصَحَ اللَّهَ فَنَاصَحَهُ، دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ فَمَاتَ، فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَدَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْآخَرِ فَمَاتَ، فَسُمِّيَ ذَا الْقَرْنَيْنِ. وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بِهِ. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلَا مَلَكًا، وَلَكِنْ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا.

অর্থাৎ, সুফিয়ান ছাওরী ..... আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আলী (রা.) কে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যুলকারনাইন আল্লাহর এক সৎ বান্দা। আল্লাহ তাঁকে উপদেশ দেন। তিনি উপদেশ কবুল করেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তারা তাঁর একটি শিং এর উপর সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাঁকে জীবিত করেন। আবারও তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা তাঁর অপর শিং এর উপর আঘাত করে। এ আঘাতেও তিনি মারা যান। এখান থেকে তাঁকে যুলকারনাইন

[১৭] আব্দুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে আস-সাদী, *তাফসীরুস সাদী* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ.৪৮৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪০।

[১৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

বলা হয়।[১৯] শু'বা আল-কাসিমও ..... আলী (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুত্ তুফায়ল আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যুলকারনাইন নবী, রাসূল বা ফেরেশতা কোনটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি।[২০]

২. কেউ কেউ বলেন, কেননা তিনি পূর্ব ও পশ্চিমে পৌঁছেছেন। যুবায়ের ইবনে বাকর তরীক সুলায়মান ইবনে আসীদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: তাঁকে যুলকারনাইন নামকরণ করা হয়। কেননা তিনি সূর্যের অস্তগমন স্থলে এবং সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছেছেন।[২১] আল্লামা জামাখসারী বলেন, এ বর্ণনাটি মারফু সূত্রে বর্ণিত।[২২]

واستدل لهذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل بلغ ملكه إلى أقصى المغرب، وأقصى المشرق، وجهة الشمال، وذلك تمام المعمورة من الأرض.

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল-কুরআন প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি (যুরকারনাইন) সর্ব পশ্চিমে ও সর্ব পূর্বের দেশসমূহে পৌঁছেছেন। উত্তর দিকেও। এভাবে পৃথিবীর সমগ্র স্থানে পৌঁছেছেন।"[২৩]

অনুরূপভাবে 'তাজুল ওরস" গ্রন্থ প্রণেতা আলী (রা.) এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী দ্বারা এ কথাটি প্রমাণ করেন।

ان لك في الجنة بيتا ويروى كنزا وانك لذو قرنيها أي ذو طرفي الجنة وملكها الاعظم تسلك ملك جميع الجنة كما سلك ذو القرنين جميع الارض

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আপনার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি রয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে ধন-ভাণ্ডার রয়েছে। আর আপনি যুলকারনাইন অর্থাৎ জান্নাতের দুই প্রান্ত এবং এর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজত্ব হলো সমগ্র জান্নাতে পৌঁছা বা হাটা। যেমন যুলকারনাইন সমস্ত পৃথিবীতে পৌঁছেছিলেন বা হেঁটেছিলেন।"[২৪]

'রুহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' প্রণেতা 'কাসাসুল আম্বিয়া' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেন, নিশ্চয় যুলকারনাইন স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি আঁকড়ে ধরে রয়েছেন সূর্যের উদয়স্থল ও অস্তস্থল।

---

[১৯] শায়েখ সাইয়েদ মুঈনুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হাসানী আল-হুসাইনী আল-ইজী আশ-শাফিয়ী, *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

[২০] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯।

[২১] *ফাতহুল বারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

[২২] মাহমুদ ইবনে ওমর আয যামাখসারী, *আল-কাশশাফ* (মিসর: আল-মাতবুয়াতিল শিরকিয়্যাহ, ১৩০৭ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ.৫৭৮।

[২৩] *রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনুল আজীম ওয়া আস-সাবউল মাসানী*, ১৬তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।

[২৪] মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক আল-হুসাইনী, *তাজুল ওরস* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামেলাহ), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১৩৮।

অতঃপর তিনি যখন তাঁর স্বপ্নের ঘটনা জাতির কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তাঁর জাতি এ নামকরণ করেন।"[২৫]

৪. তাঁর (যুলকারনাইন) মাথায় দু'টি শিং ছিল দুই খুরের ন্যায়। আর তিনি প্রথমত এ দু'টিকে পাগড়ি দ্বারা ঢেকে রাখতেন। এ বর্ণনাটি উবায়দ ইবনে ইয়ালী থেকে বর্ণিত।[২৬] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এ বর্ণনাটি অপছন্দ করেন আলী (রা.) আল-কাসেম ইবনে আবী বাজ্জাহ এর বর্ণনায়।[২৭]

৫. তাঁর মাথায় দু'টি শিং এর অনুরূপ কিছু ছিল।

৬. তাঁর চুলের দু'টি বিনুনি (বা দু'টি গ্রন্থি) ছিল যা তার কাপড় দ্বারা লুকানো ছিল এবং বলা হয় যে সেগুলো এত লম্বা ছিল যে তিনি তাতে পা রাখতেন।[২৮]

৭. তাঁর মাথা তামার তৈরি। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর মাথায় দুটি তামার শিং ছিল। ইবনে কাসীর বলেন, এ বর্ণনাটি দুর্বল।[২৯]

৮. তাঁর টুপিতে দুটি শিং ছিল।

৯. তিনি রোম ও পারস্য এ উভয় সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন।

১০. তাঁর সময়ে আলো ও অন্ধকার উভয়টিই প্রবেশ করেছিল।

১১. তাঁকে ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেন উভয় প্রকার ইলমই দান করা হয়েছিল।

১২. তিনি পারিবারিক দিক থেকে পিতা ও মাতার উভয়দিক থেকে সম্মানিত ছিলেন।

১৩. যুদ্ধ করার সময় তিনি দু'হাতে অস্ত্র চালনা করতেন।[৩০]

১৪. তাঁর সাহসিকতার জন্য তাঁকে এসকল উপাধি প্রদান করা হয়েছে।[৩১]

---

[২৫] শায়েখ ইসমাঈল হাক্কী, *রুহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ.৫১২।

[২৬] *রুহুল মা'আনী*, ১৬তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪।

[২৭] *ফাতহুল বারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২।

[২৮] আবুল হাসান আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল-মাসউদী, *মারুজুজ জাহবী ওয়া মাআদিনুল জাওহার* (বৈরূত: আল-মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.২৮৮।

[২৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩।

[৩০] আল-কুস্তানী, *দায়িরাতুল মা'আরিফ* (বৈরূত: মাতবাআতুল মা'আরিফ, ১৮৮৩ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ.৪১১।

[৩১] *আল-কাশশাফ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৮; *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২৭২; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; *রুহুল মা'আনী*, ১৬তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪; শায়েখ আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন-নাফসী, *তাফসীরে নাফসী* (বৈরূত: দারুল কাতিবিল আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি.), ১১তম খণ্ড, পৃ.৪৭৭; *তাফসীরে জালালাইন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫।

যুলকারনাইন নবী না কি অলী

'যুলকারনাইন নবী ছিলেন নাকি অলী ছিলেন' এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

১ম অভিমত: যুলকারনাইন নবী ছিলেন।

ইবনে তায়মিয়া (রহ.) ও ইবনে কাসীর (রহ.) যুলকারনাইন নবী ছিলেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩২]

আল্লাহ তা'আলার বাণী {قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ} (আমি বললাম, হে যুলকারনাইন!)[৩৩] এ সম্বোধন দ্বারা যদি ধরে নেয়া যায়, তিনি নবী ছিলেন তা হলে বিপত্তীর কিছু নেই। কারণ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তা বলা হয়েছে। আর যদি তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করা হয়, তা হলে মনে করতে হবে কোন পয়গম্বরের মধ্যস্থাতায় তাঁকে এ সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন- বর্ণিত আছে, খিযির (আ.) তাঁর সাথী ছিলেন। অধিকন্তু এটা নবুওয়াতের ওহী না হয়ে আভিধানিক অর্থে ওহী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى} (মুসার মাতার নিকট ওহী পাঠিয়েছি)[৩৪] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আল-কুরআনে। অথচ তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন না।

আল কুরআনে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ সাধারণত নবুওয়াতের ওহী ছাড়া দেয়া যায় না। কাশফ, ইলহাম অথবা কোন উপায়ে এটি হতে পারে না। সুতরাং যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে অথবা তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।[৩৫]

শায়খ মুজাহিদ ইবনে জাবের আল-মক্কী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সরাসরী যুলকারনাইনকে সম্বোধন করেন এবং ওহী প্রেরণ করেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নবী ছিলেন ও ওহীয়ে ইলাহীর বাহক ছিলেন।[৩৬]

২য় অভিমত: যুলকারনাইন নবী ছিলেন না। তিনি সৎ বান্দা ছিলেন। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) বলেন, তিনি নবী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সৎ বান্দা। যিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মানুষদের আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান করেছেন।

---

[৩২] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, *তারজুমানুল কুরআন* (পাকিস্তান: ইসলামী একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ.৪৫৩।

[৩৩] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৮৬।

[৩৪] আল কুরআন, সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭।

[৩৫] *আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ.২১৮-২২৪; আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী, *তাফসীরে মাজিদী* (পাকিস্তান: পাক কোম্পানি), পৃ.৬১৯।

[৩৬] কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী* (পাকিস্তান: মাকতাবাতুর রাশিদিয়্যাহ, ১৪১২ হি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৪-৬৫।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذِي ْنَيْنِ فَقَالَ: كَانَ عَبْدًا نَاصَحَ اللَّهَ فَنَاصَحَهُ، دَعَا قَوْمَهُ لَى اللَّهِ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ فَمَاتَ، فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَدَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْآخَرِ فَمَاتَ، فَسُمِّيَ ذَا الْقَرْنَيْنِ. وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بِهِ. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلَا مَلَكًا، وَلَكِنْ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا.

অর্থাৎ, আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আলী (রা.) কে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যুলকারনাইন আল্লাহর এক সৎ বান্দা। আল্লাহ তাঁকে উপদেশ দেন। তিনি উপদেশ কবুল করেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তারা তাঁর একটি শিং এর উপর সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাঁকে জীবিত করেন। আবারও তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা তাঁর অপর শিং এর উপর আঘাত করে। এ আঘাতেও তিনি মারা যান। এখান থেকে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়।[৩৭] অন্যত্র আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যুলকারনাইন সম্পর্কে আলী (রা.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যুলকারনাইন নবীও নন, বাদশাহও নন। তিনি এমন এক পুণ্যবান আল্লাহর বান্দা যিনি আল্লাহকে ভালোবাসতেন। আল্লাহও তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁকে অনেক অত্যাশ্চর্য বরকত দান করেন। মেঘ ও বাতাসকে তাঁর হুকুমের অধীন করে দেয়া হয়, ফলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি পূর্ব হতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম হতে পূর্ব প্রান্ত পরিভ্রমণ করতে পারতেন। রাত্রি ও দিন তাঁর জন্য সমান। অন্ধকার রাতেও তিনি আলোকরশ্মির সাহায্যে চলাফেরা করতে পারতেন। সমস্ত সড়ক ও জনপদ থাকত তাঁর জন্য উন্মুক্ত। মৌসুমের পরিবর্তনের ফলে তাঁর যাত্রাপথ বিঘ্নিত হত না।[৩৮]

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا 'যুলকারনাইন নবী কি না তা আমি জানি না।'[৩৯]

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لَ: كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نًا، وَكَانَ مِنَ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ ضَخْمٍ، وَكَانَ قَدْ مَلَكَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَكَانَ لَهُ خَلِيلٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَافِيلُ، وَكَانَ يَأْتِي ذَا الْقَرْنَيْنِ يَزُورُهُ، فَبَيْنَا هُمَا ذَاتَ يَوْمٍ يَتَحَدَّثَانِ، إِذْ قَالَ لَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ: حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ عِبَادَتُكُمْ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، وَمَا عِبَادَتُكُمْ عِنْدَ عِبَادَتِنَا فِي السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ قِيَامٌ لَا يَجْلِسُونَ أَبَدًا، وَمِنْهُمْ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ أَبَدًا، وَرَاكِعٌ لَا يَسْتَوِي

---

[৩৭] *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

[৩৮] *আল-কাশ্‌শাফ আলন হাকায়িফি গাওয়ামিযিত তানযীল*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৪৩; *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫২; *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১২৩; *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৮৩।

[৩৯] আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাবুরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), ২য় খণ্ড, হাদীস: ২১৭৪, পৃ.১৭; *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৮৩।

অর্থাৎ, "আবু জাফর থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, যুলকারনাইন আল্লাহর নেককার বা সৎ বান্দাদের মধ্য থেকে একজন সৎ বান্দা ছিলেন। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপুল মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। তিনি সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্য অস্ত পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। ফেরেশদের মধ্য থেকে তাঁর একজন বন্ধু ছিল তাঁর নাম হলো যিয়াফিল। তিনি যুলকারনাইনের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। একদা উভয়ের মাঝে কথোপকথন হচ্ছিল। যুলকারনাইন তাঁকে বললেন, আমাকে বলো! আসমানে তোমাদের ইবাদতের ধরন কী? ফেরেশতা বললেন: অতঃপর সে কেঁদে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে যুলকারনাইন! তোমাদের ইবাদতের মতো আসমানে আমাদের ইবাদত নয়। যে সমস্ত ফেরেশতাগণ দাঁড়িয়ে ইবাদত করেন তাঁরা কখনো বসে না। আর তাঁদের (ফেরেশতাদের মধ্যে) মধ্যে যারা সেজদাকারী তাঁরা কখনো মাথা উঁচু করে না। আর যারা রুকুকারী তাঁরা সোজা হয় না।"[৪০]

بَعَثَهُ اللهُ إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ تُحْمَلَ الْبَعْثُ عَلَى غَيْرِ رِسَالَةِ النُّبُوَّةِ

অর্থাৎ, 'যুলকারনাইন আল্লাহর পক্ষ হতে একটি জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এ কথা সত্য, তবে তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।'[৪১]

বিশুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না। ওহীর অর্থ হচ্ছে এখানে ইলহাম, যা আল্লাহর ওলীদের নিকট আসে।[৪২]

সম্ভবত কোন পয়গাম্বরের মাধ্যমে তিনি এ বাণী লাভ করেন। বনী ইসরাঈলের কোন পয়গাম্বরকে তাঁর সাথে দেয়া হয়েছিল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।[৪৩]

যুলকারনাইন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা জানতেন এবং প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান ছিল তাঁর নখদর্পণে। জমিনের সমস্ত ছোট-বড় নিদর্শনসমূহের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেন। যে জনগোষ্ঠীর সাথে তিনি যুদ্ধ করতেন তিনি তাঁদের ভাষাও জানতেন এবং সে ভাষায় তিনি কথোপকথন করতেন।[৪৪]

আবু ইসহাক সাবীয়ী হতে বর্ণিত,

عن أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله الوادعي قال كتاب سمعت معاوية يقول : ملك الأرض أربعة : سليمان بن داود و ذو القرنين و رجل من أهل حلوان و رجل آخر فقيل له : الخضر ؟ فقال : لا

---

[৪০] শায়েখ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-উযমাহ* (রিয়াদ: দারুল আসিমাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৪৬১।

[৪১] *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৮৩।

[৪২] মহিউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন* (রিয়াদ: দারু তাবিয়্যাতু লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১২-২১৩।

[৪৩] *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১২-২১৩।

[৪৪] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.০৬।

অর্থাৎ, '..... মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী ৪জন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। (১) সুলায়মান ইবনে দাউদ (২) যুল-কারনাইন, (৩) হুলওয়ানের জনৈক অধিবাসী (৪) অন্য একজন। জিজ্ঞেস করা হলো, তিকি কি খিযির? বললেন, না।"[৪৫]

যুবায়র ইবনে বাক্কার ..... সুফিয়ান ছাওরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন এমন বাদশাহ ছিলেন চারজন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন মুমিন দু'জন কাফির। মুমিন দু'জন হলেন সুলায়মান (আ.) ও যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন হলেন নমরুদ ও বুখতে নাসার।[৪৬]

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায় যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না। বরং তিনি একজন আল্লাহর সৎ বান্দা ছিলেন। যাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসতেন। তিনিও আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসতেন। তাঁকে আল্লাহ উপদেশ দিতেন। তিনিও সে উপদেশ গ্রহণ করতেন।

যুলকারনাইন ও মহামতি আলেকজান্ডার : সংশয় ও সমাধান

ইতিহাসে যুলকারনাইন নিয়ে বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মহামতি আলেকজান্ডারকে যুলকারনাইন বলছেন। আবার কতিপয় ঐতিহাসিক তা অস্বীকার করছেন। এর সুস্পষ্ট কারণ বিদ্যমান। তা হলো: কুরআন মাজিদের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে যুলকারনাইন ঈমানদার ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আর আলেকজান্ডার ছিলেন মূর্তিপূঁজক, অত্যাচারী ও জালিম।

ইতিহাসবিদ হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.) উপর্যুক্ত অভিমত খণ্ডন করে বলেন, গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ও কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন পৃথক দু'ব্যক্তি। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় গ্রিসের আলেকজান্ডারের বংশতালিকা উপস্থাপন করেন, যা উপরে গিয়ে ইবরাহীম (আ.) এর সাথে মিলে যায়।

فَأما ذُو الْقَرْنَيْنِ الثَّانِيْ فَهُوَ إِسْكَنْدَرُ بْنُ فِلِبْسَ الْمَقْدُونِ الْيُوْنَانِي الْمِصْرِيُّ بَانِيُّ إِسْكَنْدَرِيَّةَ الَّذِي يُؤَرِّخُ بِأَيَّامِهِ الرُّوْمُ، وَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الأَوَّلِ بِدَهْرٍ طَوِيْلٍ، كَانَ هَذَا قَبْلَ **الْمَسِيْحِ بِنَحْوِ مَنْ ثَلاثِمائَةِ سَنَةٍ،** وَكَانَ أَرِسْطَاطَالِيسُ الْفَيْلَسُوفُ وَزِيْرَهُ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ دَارَ **ابْنَ دَارَا، وَأَذَلَّ مُلُوكَ الْفُرْسِ وَأَوْطَأَ** أَرْضَهُمْ. وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ **يَعْتَقِدُ** أَنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الَّذِي كَانَ أَرِسْطَاطَالِيسُ وَزِيرَهُ، فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ **خَطَأٌ** كَبِيرٌ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ طَوِيْلٌ كَثِيرٌ، فَإِنَّ الأَوَّلَ كَانَ **عَبْدًا مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَلِكًا عَادِلًا،** كَانَ وَزِيْرُهُ الْخَضِرَ، وَقَدْ كَانَ نَبِيًّا عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا. وَأَمَّا **الثَّانِيْ: فَكَانَ مُشْرِكًا، وَكَانَ** وَزِيْرُهُ فَيْلَسُوْفًا، وَقَدْ كَانَ بَيْنَ زَمَانَيْهِمَا أَزْيَدُ **مِنْ** الْفَيْ سَنَةٍ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا، لَا يَسْتَوِيَانِ وَلَا يَشْتَبِهَانِ

[৪৫] *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদিস নং-৪১৪৩, পৃ.৬৪৫।

[৪৬] *আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৪৩; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৪০।

অর্থাৎ, 'দ্বিতীয় যুলকারনাইন ছিলেন ফিলিপের পুত্র সিকান্দার (আলেকজান্ডার) যিনি মাকদুনী, ইউনানি ও মিসরী নামে পরিচিত। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা এবং রোমের ইতিহাস তাঁর যামানায় খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে। তিনি প্রথম সিকান্দার হতে সুদীর্ঘ কাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। ঈসা (আ.) এর ৩০০ বছর পূর্বে তিনি জন্মলাভ করেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটল। দারাকে তিনি হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে বিপুল এলাকা করায়ত্ত করেন। অনেকের বিশ্বাস যে, উভয়ই এক এবং তিনিই আল-কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন, যার মন্ত্রী এরিস্টটল। এটা মূলত বিরাট বিভ্রান্তি ও দীর্ঘমেয়াদি বিতর্কের অন্যতম কারণ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন নেককার, মুমিন ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যার মন্ত্রী ছিলেন খিযির (আ.)। তিনি নবী ছিলেন বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন মুশরিক, যার মন্ত্রী এরিস্টটল। দু'জনের মধ্যখানে দুই হাজার বছরের অধিক ব্যবধান। কোথায় ইনি আর কোথায় তিনি। সুতরাং সিকান্দার বা যুলকারনাইন যে একই ব্যক্তি নন এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।[৪৭]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, যুলকারনাইন নামে পরিচিত সিকান্দার আল-মার্কদুনী মুশরিক ও যালিম ছিলেন। নিজেকে খোদা দাবি করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি, এমনকি শত্রুর বক্ষে বর্শাবিদ্ধ করে তিনি আনন্দ পেতেন। শরীরিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাঁর বন্ধুগণ যখন আর্তচিৎকার করত, তখন তিনি তাচ্ছিল্যভরে মুচকি হাসতেন। প্লুটারক বলেন, মানুষ শিকারের মাধ্যমে স্বস্তি ও সুখানুভূতি লাভ করার পুরাতন অভ্যাস ছিল তাঁর। প্যাসারগ্যাডা দখল করার পর ১ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ডের সহায়-সম্পত্তি তিনি লুট করেন এবং শহরের সব পুরুষ সদস্যকে হত্যা করে নারীদের দাসীতে পরিণত করেন।[৪৮]

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর পক্ষ থেকে তিন ধরনের পার্থক্য বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, আলেকজান্ডার কোনোভাবেই কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন হতে পারেন না। তিনি আরো পরিষ্কার করেছেন যে, ইমাম তাবারি তাঁর তাফসিরে এবং মুহাম্মদ বিন রবি আল-জিযি 'কিতাবুস সাহাবা'য় এ সম্পর্কে সম্পর্কে যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং যাতে যুলকারনাইনকে রোমক ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে, যারা আলেকজান্ডারকে যুলকারনাইন বলেছেন, তাঁরা খুব সম্ভব এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল এবং নির্ভরযোগ্য নয়।[৪৯]

আর হাফেয ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির যুলকারনাইনের নাম নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলছেন:

---

[৪৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৬; *আল-হাশিয়া আলা সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২, টীকা: ৮।

[৪৮] *The Encyclopaedia Britannica*, Ibid, v. 1, p. 493-495

[৪৯] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২৯৪।

‘আর ইসহাক বিন বিশর সাঈদ বিন বশির থেকে, তিনি কাতাদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসকানদারই হলেন (প্রথম) যুলকারনাইন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রথম কায়সার (রোমক সম্রাট)। তিনি সাম বিন নুহ আ.-এর বংশধর।[৫০]

আর দ্বিতীয় যুলকারনাইন হলেন ইসকানদার বিন ফিলিপস; তিনি ম্যাসাডোনিয়ান, গ্রিক ও মিসরি, আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা;[৫১] তিনি প্রথম যুলকারনাইন থেকে দীর্ঘকাল পর জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত ইসা আ.-এর জন্মের প্রায় তিনশো বছর পূর্বে তিনি গত হয়েছেন। দার্শনিক এ্যারিস্টটল তাঁর মন্ত্রী ছিলেন।[৫২] তিনিই (আলেকজান্ডারই সেই সম্রাট যিনি) দারা বিন দারাকে হত্যা করেছিলেন, পারস্যের রাজাদেরকে অপদস্থ করেছিলেন, তাদের ভূমিকে পদদলিত করেছিলেন।[৫৩]

ইমাম রাযি (রহ.) সেকান্দার মাকদুনি বা আলেকজান্ডার গ্রেটকে যুলকারনাইন আখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন-

كان ذو القرنين نبيا وكان الاسكندر كافرا وكان معلمه ارسطاطاليس وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلاشك

অর্থাৎ, (কুরআনে উল্লেখিত) যুলকারনাইন ছিলেন নবী। আর ইসকানদার ছিলেন কাফের। তাঁর শিক্ষক ছিলেন এ্যারিস্টটল; ইসকানদার তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন। আর সন্দেহাতীতভাবে এ্যারিস্টটল ছিলেন কাফের।[৫৪]

সুতরাং এ ভ্রান্তির কারণ হলো, কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তা ছাড়া তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। আর অন্যদিকে, ইসকানদার ইউনানিও (আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটও) ছিলেন দিগ্বিজয়ী ও বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। ফলে তাঁকেও যুলকারনাইন বলা হতে লাগলো। অথবা, তিনি রোম ও পারস্য এই দুটি সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, কাজেই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হতো।

যুলকারনাইন ও ইয়ামানের বাদশাহ

আরবের বিখ্যাত কবিগণ- ইমরুউল কায়স, আওস বিন হাজার, তারফা বিন আবদুহু প্রমুখ কবির কবিতায়ও হিমইয়ারি বাদশাহগণকে যুলকারনাইন বলা হয়েছে।[৫৫] একইভাবে আরববাসীরা ইরানি

---

[৫০] তাঁর কথাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫১] আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

[৫২] এ্যারিস্টটল মহামতি আলেকজান্ডারের কেবল মন্ত্রীই ছিলেন না, তাঁর প্রধান শিক্ষকও ছিলেন।

[৫৩] এ-কারণে ইরানে আলেকজান্ডারকে দ্য গ্রেটকে ‘অভিশপ্ত আলেকজান্ডার’ বলা হয়।

[৫৪] ইমাম ফখরুদ্দিন আর রাযী, *আত তাফসির আল কাবির* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), ২১তম খণ্ড, পৃ.৪৯৩-৪৯৪।

[৫৫] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২৯৪।

বাদশাহগণের মধ্যে কায়কোবাদ ও ফারিদোঁকে তাঁদের প্রতাপমণ্ডিত বিজয়সমূহের কারণে যুলকারনাইন বলতো।[৫৬]

কিন্তু তাঁরা সবাই উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতেই যুলকারনাইন নামে আখ্যায়িত হতেন। কুরআন মাজিদে উল্লেখিত যুলকারনাইন তাঁদের মধ্যে কেউই নন। যেমন: আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

والراجح انه ليس من اذواء اليمن ولا كيقباد من ملوم العجم ولا هو اسكندر بن فيلفوس بل ملك أخر من الصالحين ينتهى نسبه إلى العرب السامين الأولين **ذكره صاحب النلسخ**

অর্থাৎ, 'আর প্রণিধানযোগ্য মত এই যে, কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন ইয়ামানের বাদশাহদের মধ্যে কেউ ছিলেন না এবং পারস্যের বাদশাহদের মধ্যেও কেউ ছিলেন না। তিনি অনারব সম্রাটদের মধ্যে কায়কোব্বাদ ছিলেন না এবং ইসকানদার বিন ফিলিপসও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ-সকল ব্যক্তি থেকে ভিন্ন; ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের মধ্যে একজন। তাঁর বংশপরম্পরা প্রাচীন সামি বংশোদ্ভূত আরবদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। নাসিখুত তাওয়ারিখ এমনই লিখেছেন।[৫৭]

সুতরাং বলা যায় যে, আল-কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহওয়ালা ও প্রজারঞ্জক বাদশাহ। মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ পারস্য ও মিডিয়ার রাজা সাইরাস (কায়খসরু, খোরাস মৃত্যু: ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্ব) আল-কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসি (রহ.) ও ইয়ামানের বাদশাহগণের মধ্যে কাউকেও যুলকারনাইন বলে স্বীকার করেন নি এবং এ ধরনের বক্তব্যকে তিনি নিছক ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছেন। সাইরাস প্রাচীন কালের খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিযান পরিচালনায় যুলুম ও অত্যাচারের চিহ্ন ছিল না, বরং তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান।[৫৮]

সাইরাস বা খোরাস: যুলকারনাইন

আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا "আর (হে মুহাম্মাদ!) তারা আপনার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তাদেরকে বলে দিন, আমি তার সম্বন্ধে কিছু কথা তোমাদের শুনাচ্ছি।"[৫৯] ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সাইরাস বা খোরাস বা কায়খসরু হলেন আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত 'যুলকারনাইন'। এ অভিমতটি ব্যক্ত করেছে মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য জন।

---

[৫৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৪০।

[৫৭] আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, *আকিদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম* (আল-মাজলিসুল উলামা বিল জামিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ), পৃ.১৯৫।

[৫৮] *কাসাসুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৩৪।

[৫৯] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৮৩।

আল্লাহর বাণী: وَ يَسْئَلُوْنَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَيْنِ এ বাক্যটির শুরুতে যে "(واو) আর" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সম্পর্কে অবশ্যই পূর্ববর্তী কাহিনীগুলোর সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এ থেকে স্বতঃফূর্তভাবে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা ও খিযিরের কাহিনীও লোকদের প্রশ্নের জবাবে শোনানো হয়েছে। একথা আমাদের এ অনুমানকে সমর্থন করে যে, এ সূরার এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আসলে মক্কার কাফেররা আহলি কিতাবদের পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল।

আলোচ্য আয়াতাংশে যে যুলকারনাইনের কথা বলা হচ্ছে তিনি কে ছিলেন, এ বিষয়ে প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মতবিরোধ চলে আসছে। প্রাচীন যুগের মুফাস্সিরগণ সাধারণত যুলকারনাইন বলতে আলেকজাণ্ডারকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে তাঁর যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, আলেকজাণ্ডারের সাথে তার মিল খুবই কম। আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে মুফাসসিরগণের অধিকাংশ এ মত পোষণ করেন যে, তিনি ছিলেন ইরানের শাসনকর্তা খুরস তথা খসরু বা সাইরাস। এ মত তুলনামূলকভাবে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য। তবুও এখনো পর্যন্ত সঠিক ও নিশ্চিতভাবে কোন ব্যক্তিকে যুলকারনাইন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারেনি। কুরআন মাজীদে যেভাবে তার কথা আলোচনা করেছে তা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে চারটি কথা জানতে পারি:

এক. তার যুলকারনাইন (শাব্দিক অর্থ "দু' শিংওয়ালা") উপাধিটি কমপক্ষে ইহুদীদের মধ্যে, যাদের ইঙ্গিত মক্কার কাফেররা তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, নিশ্চয়ই পরিচিত হওয়ার কথা তাই একথা জানার জন্য আমাদের ইসরাঈলী সাহিত্যের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় থাকে না যে, তারা "দু'শিংওয়ালা" হিসেবে কোন্ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে জানতো?

দুই. এ ব্যক্তি অবশ্যই কোন বড় শাসক ও এমন পর্যায়ের বিজেতা হওয়ার কথা যার বিজয় অভিযান পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিচালিত হয়েছিল এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকেও বিস্তৃত হয়েছিল। কুরআন নাযিলের পূর্বে এ ধরনের কৃতিত্বের অধিকারী মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির কথাই জানা যায়। তাই অনিবার্যভাবে তাঁর সাথে তাঁদের সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখতে হবে।

তিন. তাকে অবশ্যই এমন একজন শাসনকর্তা হতে হবে যিনি নিজের রাজ্যকে ইয়াজুজ মা'জুজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোন পার্বত্য গিরিপথে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ বৈশিষ্ট্যটির অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের একথাও জানতে হবে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে কোন জাতিকে বুঝানো হয়েছে এবং তারপর এও দেখতে হবে যে, তাদের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের কোন প্রাচীর পৃথিবীর কোথায় নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেটি কে নির্মাণ করেছেন?

চার. তার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোসহ এ বৈশিষ্ট্যটিও উপস্থিত থাকা চাই যে, তিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা হবেন। কারণ আল কুরআন এখানে তার এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে সবচেয়ে সুস্পষ্ট করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনার মধ্যে থেকে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি সহজেই খুরসের (বা সাইরাস) বেলায় প্রযোজ্য। কারণ বাইবেলের দানিয়েল পুস্তকে দানিয়েল নবীর যে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তিনি ইরানীদের উত্থানের পূর্বে মিডিয়া ও পারস্যের যুক্ত সাম্রাজ্যকে একটি দু'শিংওয়ালা মেষের আকারে দেখেন। ইহুদীদের মধ্যে এ "দু'শিংধারী"র বেশ চর্চা ছিল। কারণ, তার সাথে সংঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত বেবিলনের সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং বনী ইসরাঈল দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও বেশীর ভাগ তার সাথে খাপ খেয়ে যায় কিন্তু পুরোপুরি নয়। তার বিজয় অভিযান নিঃসন্দেহে পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সমুদ্রসীমা এবং পূর্বে বখ্তর (বলখ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু উত্তরে বা দক্ষিণে তার কোন বড় আকারের অভিযানের সন্ধান এখনো পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়নি। অথচ কুরআন সুস্পষ্টভাবে তার তৃতীয় একটি অভিযানের কথা বর্ণনা করছে। তবুও এ ধরনের একটি অভিযান পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, খুরসের রাজ্য উত্তরে ককেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বলা যায়, একথা প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে রাশিয়া ও উত্তর চীনের এমনসব উপজাতিদের বুঝানো হয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত এবং প্রাচীন যুগ থেকে সভ্য দেশগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে আসছিল। তাছাড়া একথাও জানা গেছে যে, তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু খুরসই যে, এ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তা এখনো প্রমাণিত হয়নি।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি প্রাচীন যুগের একমাত্র খুরসের সাথেই সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। কারণ তার শত্রুরাও তার ন্যায়বিচারের প্রশংসা করেছে। বাইবেলের ইষ্রা পুস্তক একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন আল্লাহভীরু ও আল্লাহর অনুগত বাদশাহ ছিলেন। তিনি বনী ইসরাঈলকে তাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রিয়তার কারণেই বেবিলনের দাসত্বমুক্ত করেছিলেন এবং এক ও লা-শরীক আল্লাহর ইবাদাতের জন্য বাইতুল মাকদিসে পুনর্বার হাইকেলে সুলায়মানী নির্মাণ করার হুকুম দিয়েছিলেন।

এ কারণে আমি একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে, কুরআন নাযিলের পূর্বে যতজন বিশ্ববিজেতা অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে একমাত্র খুরসের মধ্যেই যুলকারনাইনের আলামতগুলো বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু একেবারে নিশ্চয়তা সহকারে তাকেই যুলকারনাইন বলে নির্দিষ্ট করার জন্য এখনো আরো অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। তবুও কুরআনে উপস্থাপিত আলামতগুলো যত বেশী পরিমাণে খুরসের মধ্যে বিদ্যমান, ততটা আর কোন বিজেতার মধ্যে পাওয়া যায় না।

সারকথা হচ্ছে যে, খুরস ছিলেন একজন ইরানী শাসনকর্তা। খৃস্টপূর্ব ৫৪৯ অব্দের কাছাকাছি যুগ থেকে তাঁর উত্থান শুরু হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মিডিয়া (আল জিবাল) এবং লিডিয়া (এশিয়া মাইনর) রাজ্য জয় করার পর ৫৩৯ খৃস্টপূর্বাব্দে বেবিলন জয় করেন। এরপর তার পথে আর কোন রাজশক্তির বাধা ছিল না। তার বিজয় অভিযান সিন্ধু ও সুগদ (বর্তমান তুর্কিস্তান) থেকে শুরু করে একদিকে মিসর

ও লিবিয়া এবং অন্যদিকে থ্রেস ও ম্যাকডোনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আবার উত্তর দিকে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে ককেশিয়া ও খাওয়ারিযাম পর্যন্ত। বলতে গেলে সেকালের সমগ্র সভ্য জগত তাঁর শাসনাধীন ছিল।

যুলকারনাইনের মৃত্যু

যুলকারনাইনের পূর্ণ জীবনই ছিল আল্লাহর দীনের পথে মেহনত, মানব-সেবা, ত্যাগ ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবনপথের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ৫শ বছর রাজত্ব করার পর যুলকারনাইন ইন্তিকাল করেন। দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত তাঁর লোহা-তামার সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত প্রাচীর অনন্ত কাল ধরে তাঁর স্মৃতির অম্লান সাক্ষী হয়ে থাকবে।

وَلَمَّا فَاتَهُ عَيْنُ الحَياةِ وَحُظِي بِهَا الخَضِرَ عليه السلام **اغتم غَمًّا** شَدِيدًا، فَأَيْقَنَ بِالمَوْتِ، فَمَاتَ **بِدُوْمَةِ** الجَنْدَل، وَكَانَ مَنْزِلُهُ، هَكَذَا رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه

অর্থাৎ, 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, অমৃত-ঝর্ণা যখন যুলকারনাইনের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং খিযির (আ.) তা লাভ করে ধন্য হলেন, তখন তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন। দুমাতুল জান্দাল নামক জায়গায় তিনি ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁর অন্তিম বিশ্রামস্থল।"[৬০]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ صَافَحَ، ذُو القَرْنَيْنِ. وَرُوِيَ عَنْ **كَعْبِ** الأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ ذَا القَرْنَيْنِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ أَوْصَى أُمَّهُ ; إِذَا هُوَ مَاتَ أَنْ تَصْنَعَ طَعَامًا، وَتَجْمَعَ نِسَاءَ أَهْلِ المَدِينَةِ وَتَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ، وَتَأْذَنَ لَهُنَّ فِيهِ، إِلَّا مَنْ كَانَتْ **ثَكْلَى، فَلَا تَأْكُلْ** هُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ تَضَعْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ يَدَهَا فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ! **لَكُلُّكُنَّ ثَكْلَى! فَقُلْنَ:** وَاللهِ مَا مِنَّا إِلَّا مَنْ أَثْكِلَتْ. فَكَانَ ذَلِكَ تَسْلِيَةَ لِأُمِّهِ. وَ رَ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، وَصِيَّةَ ذِي القَرْنَيْنِ وَمَوْعِظَتَهُ أُمَّهُ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً طَوِيلَةً، فِيهَا **حِكَمٌ وَأُمُورٌ** نَافِعَةٌ، وَأَنَّهُ مَاتَ وَعُمْرُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ سَنَةٍ، وَهَذَا غَرِيبٌ.

অর্থাৎ, "আবু দাউদ আত-তায়ালিসী (রহ.) সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সর্বপ্রথম যিনি মুসাফাহার প্রবর্তন করেন, তিনি হলেন, যুলকারনাইন। কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়া (রা.) কে বলেছেন, যুলকারনাইনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি তাঁর মাকে ওসিয়ত করেন যে, আমার মৃত্যু হয়ে গেলে আপনি ভোজের ব্যবস্থা করবেন এবং মহিলারা ব্যতীত অন্যদেরকে আহার করতে বলবেন। যে সব মহিলা সন্তান হারিয়েছে তারা যেন উক্ত খাদ্য ভক্ষণ না করে। ওসিয়ত অনুযায়ী মা সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে উক্তরূপে আহার গ্রহণের আহবান জানালেন। কিন্তু একজন মহিলাও খাবার স্পর্শ করলেন না। যুলকারনাইনের মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার তোমরা সকলেই কি সন্তান হারা? তারা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা প্রত্যেকেই সন্তান হারিয়েছি। তখন এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি সান্তনা পেলেন। ইসহাক ইবেন বিশর আব্দুল্লাহ ইবনে যিনাদের

[৬০] *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৩৩

মাধ্যমে জনৈক আহলে কিতাব থেকে বর্ণনা করেন যে, যুলকারনাইনের ওসিয়ত ও তাঁর মায়ের উপদেশ একটি সুদীর্ঘ মূল্যবান উপদেশ। বহু-জ্ঞানপূর্ণ ও কল্যাণকর কথা তাতে আছে। যুলকারনাইন যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল তিন হাজার বছর। এ বর্ণনাটি 'গরীব' বা দুর্বল পর্যায়ের।"[৬১]

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: وَبَلَغَنِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ عَاشَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: كَانَ عُمُرُهُ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَكَانَ بَعْدَ دَاوُدَ بِسَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ بَعْدَ آدَمَ بِخَمْسَةِ **آلَافٍ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى** وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَكَانَ مُلْكُهُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إِنَّمَا يَنْطَبِقُ عَلَى إِسْكَنْدَرَ **الثَّانِي لَا** الْأَوَّلِ، وَقَدْ خَلَطَ فِي أَوَّلِ التَّرْجَمَةِ وَآخِرِهَا بَيْنَهُمَا، وَالصَّوَابُ **التَّفْرِقَةُ كَمَا ذَكَرْنَا، اقْتِدَاءً بِجَمَاعَةٍ مِنَ** حُفَّاظِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِمَّنْ جَعَلَهُمَا وَاحِدًا الْإِمَامُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ، رَاوِي السِّيرَةِ، وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، إِنْكَارًا بَلِيغًا، وَرَدَّ قَوْلَهُ رَدًّا شَنِيعًا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا جَيِّدًا، كَمَا قَدَّمْنَا. قَالَ: وَلَعَلَّ جَمَاعَةً مِنَ الْمُلُوكِ الْمُتَقَدِّمِينَ، تَسَمَّوْا بِذِي الْقَرْنَيْنِ تَشَبُّهًا بِالْأَوَّلِ. **اللَّهُ أَعْلَمُ.**

অর্থাৎ, ইবনে আসাকির (রহ.) অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যুলকারনাইন ছত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। কারও মতে তিনি বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। দাউদ (আ.) এর সাতশ' চল্লিশ বছর পর এবং আদম (আ.) এর পাঁচ হাজার একশ' একাশি বছর পর তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন এবং ষোল বছর রাজত্ব করেন। ইবন আসাকিরের এ বক্তব্য দ্বিতীয় ইসকান্দারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, প্রথম ইসকান্দারের ক্ষেত্রে নয়। তিনি দুই ইসকান্দারের মধ্যে প্রথম জন ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসকান্দার দু'জন। বিভিন্ন বিজ্ঞজনের উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনার শুরুতে সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা দুই ইসকান্দরকে একজন ভেবেছেন তাদের মধ্যে সীরাত লেখক আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম অন্যতম। হাফিজ ইসকান্দারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করে দেখিয়েছেন। সুহায়লী বলেছেন, সম্ভবত প্রাচীন যুগের কতিপয় রাজা-বাদশাহ প্রথম ইসকান্দরের সাথে তুলনা করে দ্বিতীয় ইসকান্দরকেও যুলকারনাইন নামে আখ্যায়িত করেছেন।" "আল্লাহই সর্বজ্ঞাত"।[৬২]

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায় যে, আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহওয়ালা ও প্রজারঞ্জক বাদশাহ। পারস্য ও মিডিয়ার রাজা সাইরাস (কায়খসরু, খোরাস মৃত্যু: ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্ব) আল-কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন বলে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। সাইরাস বা খোরাস প্রাচীন কালের খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিযান পরিচালনায় যুলুম ও অত্যাচারের চিহ্ন ছিল না, বরং তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। আসমানী কিতাবসমূহের আলোকে তা প্রমাণ করে।

[৬১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৫০।

[৬২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৫০-৫১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আল কুরআনুল কারীমে যুলকারনাইন

আল-কুরআনুল কারিমে সূরা আল-কাহফে যুলকারনাইন এর ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا - إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا - **فَأَتْبَعَ سَبَبًا** - حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا - قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا - وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا - **ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا** - حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا - **كَذَلِكَ** وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا - **ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا** - حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا - قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى نْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا - قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا - **آتُونِي زُبَرَ** الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ **قِطْرًا** - فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا - قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا - وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ **جَمْعًا**

অর্থ: "তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করবো।' আমি তো তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় উপকরণ দান করেছিলাম। তারপর এক পথ অবলম্বন করলো। চলতে চলতে সে যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌঁছলো তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো। এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলো।' আমি বলেছিলাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের বিষয়টি সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।' সে বললো যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেবো, তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।' আবার সে এক পথ ধরলো, চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছলো তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি।[৬৩] এটাই প্রকৃত ঘটনা, তার কাছে যা কিছু ছিলো তা আমি সম্যক অবগত আছি। আবার সে এক পথ ধরলো। চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো তখন সে সেখানে একটি সম্প্রদায়কে পেলো যারা কোনো কথা বুঝবার মতো ছিলো না। তারা বললো, 'হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেবো যে,

[৬৩] তারা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করতো। তাদের ঘরবাড়ি বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিলো না।

আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করবেন।' সে বললো, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো; আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যস্থলে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেবো। তোমরা আমার কাছে লোহার পিণ্ডসমূহ নিয়ে আসো।' তারপর মধ্যবর্তী ফাঁপা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বললো, 'তোমরা হাফরে দম দিতে থাকো। যখন তা আগুনের মত উত্তপ্ত হলো তখন সে বললো, তোমরা গলিত লোহা আনয়ন করো, আমি তা ঢেলে দিই এর ওপর।' এরপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তা ভেদও করতে পারলো না। সে (যুলকারনাইন) বললো, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' সেই দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে এবং শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে। এরপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো।"[৬৪]

শানে নুযুল (شان نزول)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট হলো:

وَأخرج ابْن إِسْحَاق وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَأَبُو نعيم وَالْبَيْهَقِيّ كِلَاهُمَا فِي الدَّلَائِل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: بعثت قُرَيْش النَّضر بن الْحَارث وَعقبَة بن أبي معيط إِلَى أَحْبَار يهود بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا: سلوهم عَن مُحَمَّد وصفوا لَهُم صفته وأخبروهم بقوله فَإِنَّهُم أهل الْكتاب الأول وَعِنْدهم علم مَا لَيْسَ عندنَا من علم الْأَنْبِيَاء فَخَرَجَا حَتَّى أَتَيَا الْمَدِينَة فسألا أَحْبَار يهود عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ووصفا لَهُم أمره وَبَعض قَوْله وَقَالا: إِنَّكُم أهل التَّوْرَاة وَقد جئناكم لتخبرونا عَن صاحبنا هَذَا

فَقَالُوا لَهما: سلوه عَن ثَلَاث فَإِن أخْبركُم بهن فَهُوَ نَبِي مُرْسل وَإِن لم يفعل فالرجل متقول

فروا فِيهِ رَأْيكُمْ

سلوه عَن فتية ذَهَبُوا فِي الدَّهْر الأول مَا كَانَ من أمرهم فَإِنَّهُ قد كَانَ لَهُم حَدِيث عَجِيب

وَسَلُوهُ عَن رجل طواف بلغ مَشَارِق الأَرْض وَمَغَاربهَا مَا كَانَ نبؤه وَسَلُوهُ عَن الرّوح مَا هُوَ فَإِن أخْبركُم بذلك فَإِنَّهُ نَبِي فَاتَّبعُوهُ وَإِلَّا فَهُوَ متقول

فَأقبل النَّضر وَعقبَة حَتَّى قدما قُرَيْش فَقَالَا: يَا معشر قُرَيْش قد جئناكم بفصل مَا بَيْنكُم وَبَين مُحَمَّد **قد أمرنَا أَحْبَار** يهود أَن نَسْأَلهُ عَن أُمُور - فأخبراهم بهَا - فجاؤوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا: يَا مُحَمَّد أخبرنَا - فَسَأَلُوهُ عَمَّا أمروهم بِهِ - فَقَالَ لَهُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أخْبركُم غَدا بِمَا سَأَلْتُم عَنهُ - **وَلم** يسْتَثْن - فانصرفوا عَنهُ وَمكث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خمس عشرَة لَيْلَة لَا يحدث الله إِلَيْهِ فِي ذَلِك وَحيا وَلَا يَأْتِيهِ جِبْرِيل حَتَّى أرجف أهل مَكَّة وأحزن

[৬৪] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৩-৯৯।

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مكث الْوَحْي عَنهُ وشق عَلَيْهِ مَا يتَكَلَّم بِهِ أهل مَكَّة ثمَّ جَاءَ جِبْرِيل من الله عز وَجل بِسُورَة أَصْحَاب الْكَهْف فِيهَا مُعَاتَبَته إِيَّاه على حزنه عَلَيْهِم وَخبر مَا سَأَلُوهُ عَنهُ من أمر الْفتية وَالرجل الطّواف.

অর্থাৎ, "মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কার কুরাইশরা নাদার বিন হারিস ও উকবা বিন মুয়িতকে ইহুদি আলেমদের কাছে প্রেরণ করলো এই বার্তাসহ : তোমরা নিজেদেরকে আহলে কিতাব বলে থাকো এবং তোমরা দাবি করে থাকো যে, তোমাদের কাছে পূর্ববর্তীকালের নবীগণের যে জ্ঞান আছে তা আমাদের কাছে নেই। সুতরাং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আমাদের বলে দাও, তাঁর নবুওতের দাবির সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের ওহি সম্বলিত কিতাবে কোনো আলোচনা বা সংকেত আছে কি-না।

ফলে, কুরাইশের প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌঁছে ইহুদি আলেমদের কাছে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। ইহুদি আলেমগণ তাদেরকে বললো, তোমরা অন্যান্য কথা বাদ দাও। আমরা তোমাদেরকে তিনটি প্রশ্ন বলে দিচ্ছি। যদি তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেন, তবে মনে করো, তিনি অবশ্যই তাঁর দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী এবং আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী। তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। আর তিনি যদি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে না পারেন তবে তিনি মিথ্যাবাদী। তখন তোমাদের ইচ্ছা, যে-ধরনের আচরণ তোমরা তাঁর সঙ্গে করতে চাও, করবে। প্রশ্ন তিনটি এই : ১. ওই কয়েকজন যুবকের কী অবস্থা হয়েছিলো যারা কাফের বাদশাহর ভয়ে পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন? ২. ওই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত জয় করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ৩. রুহ বা আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

প্রতিনিধি দল মক্কায় ফিরে এলো। তারা কুরাইশদেরকে ইহুদি আলেমগণের সঙ্গে কথোপকথনের পূর্ণ বিবরণ শোনালো। কুরাইশগণ তা শুনে বললো, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মীমাংসা করা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের জন্য সহজ হবে। কেননা, একজন নিরক্ষর মানুষ তখনই ইহুদিদের এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারবে, যখন প্রকৃত পক্ষেই তার কাছে আল্লাহ তাআলার ওহি এসে থাকবে। তারপর মক্কার কুরাইশগণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিল। তিনি তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে আগামীকাল উত্তর দেব যেভাবে তোমার প্রশ্ন করেছ। কোন উত্তর এলো না। ফলে সকলেই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পনের রাত অপেক্ষা করলেন। আল্লাহ তাঁর সাথে সে ওহী সম্পর্কে কথা বলেননি। এমনকি জিবরাইলও তাঁর কাছে আসেননি। মক্কাবাসীরা বলাবলি করতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও চিন্তায় পড়ে গেলেন কেন তাঁর কাছে অহী আসা বিরত হলো। মক্কার লোকেরা তাঁকে যা বলছিল, তা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। অতঃপর জিবরাইল (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আসহাবে কাহাফসহ একটি সূরা নিয়ে আসলেন। তাতে তাঁর জন্য উপদেশ ছিল

এবং তাঁর কাছে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যুবক সম্পর্কে এবং এমন ব্যক্তি যিনি পরিভ্রমণ করেছিল তার সংবাদসহ।[৬৫]

উক্ত বর্ণনার মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ১. যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নটি যদিও কুরাইশদের মুখে করা হয়েছে, কিন্তু প্রশ্নগুলো মূলত ছিলো ইহুদিদের পক্ষ থেকে। ২. এই প্রশ্ন ছিলো এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, তাওরাতের একটিমাত্র জায়গায় তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়েছে। ৩. কুরআন মাজিদ নিজের পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তিকে যুলকারনাইন উপাধি প্রদান করে নি; বরং প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এদিকেই ইঙ্গিত করছে আল-কুরআনের এ বর্ণনাশৈলী : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ 'তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. وقد أورد ابن جرير هاهنا، والأموي في مغازيه، حديثا أسنده وهو ضعيف، عن عقبة بن عامر، أن نفرًا من اليهود جاؤوا يسألون النبي ﷺ عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به: "أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه علا به ملك في السماء، وذهب به إلى السد، ورأى أقوامًا وجوههم مثل وجوه الكلاب". وفيه طول ونكارة، ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. **والعجب أن أبا زُرْعَة** الرازي، مع جلالة قدره، ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه، وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني، الذي تؤرخ به الروم، فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل، عليه السلام، أول ما بناه وآمن به واتبعه، وكان معه الخضر، عليه السلام، وأما الثاني فهو، إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور، والله أعلم. وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح، عليه السلام، بنحو من **ثلثمائة سنة**، فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل، كما ذكره الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم، عليه السلام، وقرب إلى الله قربانًا، وقد ذكرنا طرفًا من أخباره في كتاب "البداية والنهاية"، بما فيه كفاية ولله الحمد.

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বোধন করে বলেন, "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। ইবনে জরীর (রহ.) তাহার তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াত প্রসংগে এবং উমাভী তাহার যুদ্ধ অধ্যায়ে উকবাহ ইবনে আমের হইতে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। একথা পূর্বেই গত হয়েছে যে, মক্কার কাফিররা আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমরা মুহাম্মদকে

[৬৫] আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতী, *আদ-দুররুল মানসুর* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৫৭। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের কথা আগামীকাল দিবেন বলেছেন। কিন্তু তিনি তাতে إن شاء الله বলেননি। যার দরূন ১৫দিন অহী বন্ধ ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উপদেশ ছিল। দ্র. *আদ-দুররুল মানসুর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৫৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করবো এবং তিনি তার উত্তর দিতে পারবেন না।" তখন তারা তাদেরকে বলেছিল, "প্রথম প্রশ্ন তোমরা তাঁকে ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যিনি সারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছিলেন। তোমরা তাঁকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঐ যুবকদের সম্পর্কে করবে, যারা সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর তৃতীয় প্রশ্ন করবে রূহ্ সম্পর্কে।" তাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তরে এই 'সূরায়ে আল কাহফ' অবতীর্ণ হয়। রিওয়াইয়াতে এটাও আছে যে, ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি তাদেরকে দেখেই বলেন, "তোমরা এ ঘটনা জিজ্ঞেস করতে এসেছো।" অতঃপর তিনি তাদের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে যে, তিনি রোমের একজন যুবক ছিলেন। তিনিই ইসকানদারিয়া শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁকে একজন ফেরেশতা আকাশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমন কতকগুলি লোককে দেখেছিলেন, যাদের মুখ ছিল কুকুরের মত। কিন্তু এতে বড়ই দীর্ঘসূতিকা, অস্বীকৃতি ও দুর্বলতা রয়েছে। এর মারফু হওয়া প্রমাণিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা বাণী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আবু যার আ'রাযীর (রহ.) মত একজন আল্লামা স্বীয় গ্রন্থ দালাইলুন নবুওয়ার মধ্যে এটা আনয়ন করেছেন। এরূপ বর্ণনা তাঁর ন্যায় একজন মনীষীর পক্ষে অতি বিস্ময়করই বটে। এটাও ঠিক নয়। দ্বিতীয় ইসকান্দার ছিলেন রোমক। তিনি হলেন ইসকান্দার ইবনু ফায়লীস আল মাকদূনী আল ইউনানী। তাঁর উযীর ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক এ্যারিষ্টটল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাঁর দ্বারাই রোমের ইতিহাস শুরু হয়। তিনি ছিলেন হযরত ঈসার (আ.) তিনশ বছর পূর্বে। আর প্রথম ইসকান্দার যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে দেয়া হয়েছে, তিনি তো ছিলেন ইবরাহীম খলীলের (আ.) যামানার লোক। যেমন আযরাকী (রহ.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবরাহীম খলীলের (আ.) সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এরপর ওর তাওয়াফ করেন। তাঁর উপর তিনি ঈমান আনয়ন করেন এবং তাঁর অনুসারী হন। গ্রন্থকার বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ফযলে তাঁর বহু ঘটনা 'আল বিদাইয়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ'র মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি'।[৬৬]

وقال وهب بن منبه: كان ملكًا، وإنما سمي ذا القرنين لأن؛ صفحتي رأسه كانتا من نحاس، قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين، وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل قال: سئل علي، رضي الله عنه، عن ذي القرنين، فقال: كان عبدًا ناصحَ الله فناصَحَه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين.

অর্থাৎ, 'ওহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রহ.) বলেন যে, তিনি বাদশাহ ছিলেন। তাঁর মাথার দুদিকে তামা থাকতো বলে তাঁকে যুলকারনাইন (দুটি শিং বিশিষ্ট) বলা হতো । কারণ এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি রোম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, আসলেই তাঁর মাথার দুদিকে শিং-এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত কিছু ছিল। হযরত আলী (রা.) বলেনঃ তাঁর এই নামের কারণ এই যে, তিনি ছিলেন

[৬৬] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৫৯।

আল্লাহ তা'আলার একজন সৎ বান্দা। তিনি স্বীয় কওমকে আল্লাহর পথে আহবান করেন। লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায় এবং তাঁর মাথার এক দিকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তিনি শহীদ হয়ে যান । আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আবার লোকেরা তাঁর মাথার অন্য দিকে আঘাত করে। ফলে, পুনরায় মৃত্যু বরণ করেন। এজন্যেই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়।[৬৭] একথাও বলা হয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়।

আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত যুলকারনাইন পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের সূরা আল-কাহাফের ৮৩নং আয়াতে 'যুলকারনাইন' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের বর্ণনার আলোকে যুলকারনাইনের পরিচয় তুলে ধরা হলো:

আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইন সম্পর্কে বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ..... الخ

অর্থ: "আর তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। .....?"[৬৮]

মুফাসসীরগণ উল্লেখ করেন, এ আয়াতের শানে নুযুল বা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট হলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ইহুদি ও কুরাইশ মুশরিকগণ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে যিনি সমস্ত দুনিয়ায় ভ্রমণ করেছেন। তার নাম কিংবা উপাধী কোনোটাই উল্লেখ করা হয়নি। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে জবাব প্রদান করেন।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-ওয়াহেদী বলেন, কাতাদা (রহ.) বলেন, ইহুদিরা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'আলা وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[৬৯]

وَيَسْأَلُونَكَ" أَيْ الْيَهُود "عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ" اسْمه الْإِسْكَنْدَر وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا "قُلْ سَأَتْلُو" سَأَقُصُّ "عَلَيْكُمْ مِنْهُ" مِنْ حَاله "ذِكْرًا"

অর্থাৎ, 'ইহুদিরা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তার নাম হলো ইস্কান্দার। আর তিনি নবী ছিলেন না। আপনি বলুন! আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করব।[৭০]

---

[৬৭] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৫৯-১৬০।

[৬৮] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৩।

[৬৯] দারুযাহ মুহাম্মদ ইয্যাত, *আত-তাফসীর আল-হাদীস* (কায়রো: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবী, ১৩৮৩ হি.), ৫ম খণ্ড, পৃ.৯২।

[৭০] *তাফসীরে জালালাইন*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২৩৪।

القول في تأويل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا} يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ويسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن ذي القرنين ما كان شأنه، وما كانت قصته، فقل لهم: سأتلو عليكم من خبره ذكرا يقول: سأقصّ عليكم منه خبرا. وقد قيل: إن الذين سألوا رسول الله ﷺ عن أمر ذي القرنين، كانوا قوما من أهل الكتاب.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা‘আলার বাণী {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا} এর ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা‘আলা আলোচ্য আয়াত যে সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেন: হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে ঐ সমস্ত মুশরিকগণ প্রশ্ন করতেছে যুলকারনাইন সম্পর্কে যে, তাঁর অবস্থা কী ছিল? তাঁর সম্পর্কে কি ঘটনা রয়েছে। তুমি তাদেরকে বল: তোমরা আমার কাছে তাঁর সংবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছো। তিনি বললেন: অচিরেই আমি তোমাদেরকে সে সংবাদ জানাবো। আর কেউ কেউ বলেন: যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যুলকারনাইনের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, তারা ছিল আহলে কিতাব জাতি।”[৭১]

فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: ثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ شَيْخَيْنِ، مِنْ نَجِيبٍ، قَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَتَحَدَّثُ، قَالَا: أَتَيَاهُ فَقَالَا: جِئْنَا لِتُحَدِّثَنَا، فَقَالَ: كُنْتُ يَوْمًا أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، مٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالُوا: نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا عَلَيْهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «مَا لِي وَمَا لَهُمْ، مَا لِي عِلْمٌ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ» ثُمَّ قَالَ: «اسْكُبْ لِي مَاءً» فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، قَالَ: فَمَا فَرَغَ حَتَّى عَرَفْتُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْهُمْ عَلَيَّ، وَمَنْ رَأَيْتَ مِنْ أَصْحَابِي» فَدَخَلُوا فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ سَأَلْتُمْ فَأَخْبَرْتُكُمْ عَمَّا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ مَكْتُوبًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَخْبَرْتُكُمْ» ، قَالُوا: بَلَى أَخْبِرْنَا، قَالَ: " جِئْتُمْ تَسْأَلُونِي عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَمَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ: كَانَ شَابًّا مِنَ الرُّومِ، فَجَاءَ فَبَنَى مَدِينَةَ مِصْرَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ مَلَكٌ فَعَلَا بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى مَدِينَتِي وَمَدَائِنَ، ثُمَّ عَلَا بِهِ، فَقَالَ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى مَدِينَتِي، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَقَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى الْأَرْضَ، قَالَ: فَهَذَا الْيَمُّ مُحِيطٌ نْيَا، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ تُعَلِّمُ الْجَاهِلَ، وَتُثَبِّتُ الْعَالِمَ، فَأَتَى بِهِ السَّدَّ، وَهُوَ جَبَلَانِ لَيِّنَانِ يَزْلِقُ عَنْهُمَا كُلُّ شَيْءٍ، ثُمَّ مَضَى بِهِ حَتَّى جَاوَزَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى أُمَّةٍ أُخْرَى، وُجُوهُهُمْ وُجُوهُ الْكِلَابِ يُقَاتِلُونَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، ثُمَّ مَضَى بِهِ حَتَّى قَطَعَ بِهِ أُمَّةً أُخْرَى يُقَاتِلُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وُجُوهَهُمْ وُجُوهُ الْكِلَابِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى قَطَعَ بِهِ هَؤُلَاءِ إِلَى أُمَّةٍ أُخْرَى قَدْ سَمَّاهُمْ"

অর্থাৎ, “আবু কুরাইব আমাদেরকে এ সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে যায়েদ বিন হাব্বাব ইবন লাহিয়ার সূত্রে বলেছেন, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনাম তাজিবের দুই শাইখের সূত্রে আমাকে বলেন, তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলল, আমাদেরকে উকবা ইবনে আমেরের কাছে নিয়ে যাও। যাতে আমরা আলোচনা করতে পারি। তারা বলল, তারা তার কাছে এলো এবং তারা

[৭১] আবু জাফর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৯২।

বলল: আমরা তার সাথে কথা বলতে এসেছি। তিনি বললেন: একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর কাছ থেকে বের হলাম এবং এক আহলে কিতাব একটি দল আমার সাথে সাক্ষাত করল এবং তারা বলল: আমরা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমাদের জন্য তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসেন। আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তাঁকে সে সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলাম। তিনি বললেন, আমার কি এবং তাদের কি, আল্লাহ আমাকে যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমার কোন জ্ঞান নেই।" তারপর তিনি বললেনঃ আমার জন্য পানি ঢালুন, অতঃপর ওযু করলেন, তারপর নামায পড়লেন। তিনি বললেন: তিনি শেষ করেননি যতক্ষণ না আমি তাঁর চেহারায় আনন্দ দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বলেন, তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমার সাথীদের আমি দেখলাম: তারা প্রবেশ করল, তাঁর পাশে দণ্ডায়মান হলো। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও, তবে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার। আমি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করবো, যদি তা তোমাদের কিতাবে লিখিত থাকে। যদি তোমরা চাও তবে তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করবো। তারা বলল: হ্যাঁ, আমাদের সংবাদ প্রদান করুন। তিনি বললেন: তোমরা আমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ। তিনি রোমের একজন যুবক ছিলেন। তিনি মিসরে এসে আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি তৈরি করলেন। অতঃপর তিনি তা থেকে অবসর হলে আকাশের একজন ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করলেন এবং তাকে নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন এবং বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছে? সে বললো, আমি আমার শহর ও শহরগুলো দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) তাকে নিয়ে আরো উপরে উঠে গেল এবং বলল, এখন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? সে বলল: আমি আমার শহর দেখতে পাচ্ছি, অতঃপর তিনি তাকে নিয়ে আর উপরে উঠলেন এবং বললেন, তুমি কি দেখছ? সে বললেনঃ আমি পৃথিবী দেখছি। তিনি বললেন, সমুদ্র দুনিয়াকে ঘিরে আছে। আসলে আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি অজ্ঞদের শিক্ষা দিন, আর জ্ঞানী বিশ্বস্তকে স্থীতিশীল করেন। তাই তিনি তাকে বাঁধের কাছে নিয়ে আসেন, যা দুটি নরম পর্বত যা থেকে সবকিছু সরে যায়, তারপর তিনি তাকে নিয়ে যান যতক্ষণ না তিনি ইয়াজুজ ও মাজুজ অতিক্রম করেন, তারপর তিনি তাকে অন্য জাতির কাছে নিয়ে যান, যাদের মুখগুলো কুকুরের মুখের ন্যায়। তারা ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে যুদ্ধ করে। তারপর তিনি তাকে নেতৃত্ব দেন যতক্ষণ না তিনি অন্য একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন যাদের মুখ কুকুর ন্যায় ছিল। তাদের সাথে লড়াই করেন, তারপরে তিনি চলে গেলেন যতক্ষণ না তিনি তাদের নাম উল্লেখ করে ছিলেন।"[৭২]

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال " بعثت قريش النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة ، فقالوا لهم : سلوهم عن محمد ، وصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقوله ، فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء . . فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله ص [ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، **وقالا** إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . **قال** : فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث:

[৭২] *তাফসীরে তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৯২।

نأمركم بهن . فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول . ما كان من أمرهم؟ فإنهم كان لهم حديث عجيب . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها . ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ،**فقالا** : يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد . قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور . . . فأخبروهم بها . فجاءوا رسول الله](ص) فقالوا : يا محمد أخبرنا . . فسألوه عما أمرهم به . فقال لهم رسول الله (ص) "أخبركم غدا عما سألتم عنه - " **ولم** يستثن - فانصرفوا عنه . ومكث **رسول الله (ص)** خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل عليه السلام ، حتى أرجف أهل مكة ؛ **وقالوا** : وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه . وحتى أحزن رسول الله **(ص) مكث** الوحي عنه ؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبرائيل - عليه السلام - **من الله عز وجل** بسورة أصحاب الكهف ، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية ، **والرجل الطواف ، وقول الله عز وجل** : (ويسألونك عن الروح . .)الآية.

অর্থাৎ, "ইবনে ইসহাক এ সূরাটি নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, মিশরের অধিবাসী এক প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, ওই ব্যক্তি আমাদের কাছে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে এসেছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, কুরাইশরা নাদর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবী মুঈতকে মদীনার ইহুদী পাদ্রীদের কাছে পাঠিয়ে তাদেরকে বলে দিলো, ওদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, ওদের কাছে তাঁর গুণাবলীর কথা বলবে এবং যেসব কথা বলে সে মানুষকে আকৃষ্ট করছে তারও কিছু কিছু বলবে, কারণ ওই ইহুদীরা পূর্বে অবতীর্ণ কেতাব তাওরাতের অনুসারী আর নবীদের আনীত জ্ঞান তাদের কাছে যা আছে তা আমাদের কাছে নেই..... তারা মদীনায় পৌঁছে তাদেরকে রসূলুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিষয় উল্লেখ করলো ও তাঁর কিছু কথা উদ্ধৃত করে বললো, 'তোমরা তো তাওরাত কেতাবের অধিকারী; আমাদের অঞ্চলের মোহাম্মদ সম্পর্কে তোমাদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারবো বলে এসেছি। রেওয়ায়াতকারী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ওই পাদ্রীরা তখন বললো, হাঁ, নবুওতের দাবীদার ওই ব্যক্তিকে তোমরা তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যা আমরা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। যদি সে ওই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেয় তাহলে বুঝবে যে প্রকৃতপক্ষে সে একজন নবী, আর সঠিক উত্তর দিতে না পারলে বুঝবে সে সাধারণ মানুষ এবং সে অবস্থায় তাকে তোমরা যে সাজা দিতে চাও দেবে। তাকে প্রাচীনকালের এক যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে জিজ্ঞাসা করবে, তাদের কী হয়েছিলো? আসলে এই যুবকের যে বিবরণ সূরায়ে কাহাফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে তা কুরাইশদের কাছে ছিলো অতি বিস্ময়কর বিষয়। তারপর আর ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের সকল দেশগুলোতে সফর করেছে, আরো জিজ্ঞাসা করবে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে-এটা কী জিনিস (এর বিস্তারিত বিবরণ), যদি এগুলোর জবাব সে দিতে পারে তাহলে বুঝবে অবশ্যই সে আল্লাহর নবী, নির্দ্বিধায় তাঁর অনুসরণ

করবে। আর সঠিক উত্তর দিতে না পারলে জানবে অবশ্যই সে একজন মিথ্যাবাদী, তার সাথে যে ব্যবহার করা যুক্তিসংগত মনে করবে তাই করবে। অতপর নাদর ও ওকবা কুরাইশদের কাছে গিয়ে বললো, হে কুরাইশ জাতি, আমরা তোমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে বিবাদের চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেয়ার মতো তথ্য নিয়ে এসেছি। আমাদেরকে ইহুদী পাদ্রীরা মুহাম্মাদের কাছে কিছু প্রশ্ন করতে বলেছে এরপর তারা কুরাইশদের সামনে ওই প্রশ্নগুলোর কথা উল্লেখ করলো। এরপর কুরাইশের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে বললো: হে মুহাম্মাদ, আমাদেরকে এগুলো সম্পর্কে বলো দেখি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে আমি আগামীকাল তার জবাব দেবো। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি "ইনশাআল্লাহ" বললেন না। তখন কুরাইশের ওই লোকেরা চলে গেলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ওই প্রশ্নগুলোর জবাব আল্লাহর তরফ থেকে আসবে বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু পনের দিনের মধ্যেও এ বিষয়ে কোনো কথা নাযিল হলো না, এতোদিনের মধ্যে জিবরাঈল (আ.)ও আসলেন না, যার কারণে মক্কাবাসীরা তাঁর সম্পর্কে নানা প্রকার দুর্নাম রটাতে শুরু করলো। বলতে লাগলো যে মোহাম্মাদ পরের দিন প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে বলে অংগীকার করেছিলো, কিন্তু পনের দিন চলে গেলো সে কোনো জবাবই দিতে পারলো না। এসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কানে আসায় তিনি খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন যেহেতু তিনি ওদের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারেননি। তারপর একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরায়ে কাহাফ নিয়ে জিবরাঈল (আ.) এলেন।"[৭৩]

تَعَالَى ذَا الْقَرْنَيْنِ هَذَا، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالْعَدْلِ، وَأَنَّهُ بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ، **وَمَلَكَ الْأَقَالِيمَ** وَقَهَرَ أَهْلَهَا، وَسَارَ فِيهِمْ بِالْمَعْدَلَةِ التَّامَّةِ، وَالسُّلْطَانِ الْمُؤَيَّدِ الْمُظَفَّرِ الْمَنْصُورِ الْقَاهِرِ الْمُقْسِطِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَانَ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ الْعَادِلِينَ، وَقِيلَ: كَانَ نَبِيًّا. وَقِيلَ: **كَانَ رَسُولًا. وَأَعْرَبَ مَنْ قَالَ:** مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. وَقَدْ حُكِيَ هَذَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَإِنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِآخَرَ: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، فَقَالَ: مَهْ، مَا كَفَاكُمْ أَنْ تَتَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّيْتُمْ بِأَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ. ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ.

অর্থাৎ, "আল্লাহ এখানে যুলকারনাইনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাকে তিনি ন্যায়পরায়ণ বলে প্রশংসা করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সমস্ত ভূ-খণ্ডের উপর তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন। সকল দেশের অধিবাসীরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তাদের মধ্যে তিনি পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুত তিনি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত এক সফল ও বিজয়ী বীর এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহ। তাঁর সম্পর্কে বিশুদ্ধ কথা হল, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। অবশ্য কারো কারো মতে, তিনি নবী, কারো কারো মতে, রাসূল। তাঁর সম্পর্কে একটি বিরল মত হচ্ছে, তিনি ছিলেন ফেরেশতা। এই শেষোক্ত মতটি আমিরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে শ্রুত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, উমর (রা.) একদিন শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি অপর একজনকে

[৭৩] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন*, https://quran-tafsir.net/qotb/sura18-aya83.html#p4, সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৮৩।

বলছে, হে যুল-কারনাইন! তখন তিনি বললেন, থাম, যে কোন একজন নবীর নামে নাম রাখাই যথেষ্ট, ফেরেশতার নামে নাম রাখার কী প্রয়োজন? সুহায়লী এ ঘটনা বর্ণনা করেন।"[৭৪]

قل ابن إسحاق : وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيره فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها لا يطأ أرضا إلا سلط على أهلها حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق

অর্থাৎ, "ইবনে ইসহাক বলেন, এ সংবাদ ছিল যুলকারনাইন সম্পর্কে। কেননা তাঁকে এমন জ্ঞান বা এমন জিনিস প্রদান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। তার জন্য উপায়গুলি সম্প্রসারণ করা হয়েছিল যতক্ষণ না তিনি নিজ দেশ থেকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি কোন জাতির উপর কর্তৃত্ব না নেয়া পর্যন্ত সেখানে পা রাখতেন না যতক্ষণ না তিনি পূর্ব ও পশ্চিম ভ্রমন করেছিলেন। সৃষ্টির কোন কিছুই তার দেখার বাহিরে ছিল না।"[৭৫]

قل ابن إسحاق : حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان من أهل مصر اسمه مرزبان بن مردبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح قال ابن هشام : واسمه الإسكندر وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه.

অর্থাৎ, ইবনে ইসহাক বলেন: অনারবদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনাকারী কেউ আমাকে যুল-কারনাইনের জ্ঞান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা বলেছে, তিনি (যুলকারনাইন) মিসরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নাম মারযাবান ইবনে মারদুবাহ আল-ইউনানী। তাঁর বংশধারা হলো: ইউনান ইবনে ইয়াফাস ইবনে নূহ। ইবনে হিশাম বলেন: তার নাম ইস্কান্দার। তিনি ইস্কান্দারিয়া শহরটি তৈরি করেন। সেদিকে তাকে সম্পর্কীত করা হয়।[৭৬]

الضمير في (وَيَسْئَلُونَكَ) عائد على قريش أو على اليهود ، والمشهور أن السائلين قريش حين دستها اليهود على سؤاله عن الروح ، والرجل الطواف ، وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك . وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني ذكره ابن إسحاق . وقال وهب : هو رومي وهل هو نبيّ أو عبد صالح ليس بنبي قولان . وقيل : كان ملكاً من الملائكة وهذا غريب . قيل : ملك الدنيا مؤمنان سليمان وذو القرنين ، وكافران نمروذ وبخت نصر ، وكان بعد نمروذ .

অর্থাৎ, "আয়াতাংশ وَيَسْئَلُونَكَ এর যমীর দ্বারা বুঝানো হয়েছে কুরাইশ অধিপতিদের অথবা ইহুদিদেরকে। আর প্রসিদ্ধ মত হলো, প্রশ্নকারীগণ হলো কুরাইশগণ। যখন ইহুদিগণ তাদেরকে সম্পৃক্ত করে রুহ, প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি এবং যুবকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে, যারা বহু যুগ আগে চলে গেছে। যাতে এগুলোর দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করতে পারে। আর যুলকারনাইন হলেন ইস্কান্দার আল-

---

[৭৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩৬-৫৩৭।

[৭৫] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবী বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী, *তাফসীরুল কুরতুবী* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামেলাহ), ১১তম খণ্ড, পৃ.৪৫।

[৭৬] *তাফসীরুল কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, ১১তম খণ্ড, পৃ.৪৫।

ইউনানী; এমনটি ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন: তিনি রোম দেশীয়। তিনি কি নবী নাকি সৎ বান্দা ছিলেন? তিনি নবী ছিলেন না। [এ ব্যাপারে অভিমত] আর কেউ কেউ বলেন, তিনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতা ছিলেন। এটি দুর্বল অভিমত। কেউ কেউ বলেন, দু'জন মু'মিন পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন: সুলায়মান ও যুলকারনাইন এবং দু'জন কাফির পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন। বখতে নসর ও নমরুদ।"[৭৭]

"হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিক অথবা মদীনার ইহুদীরা আপনার নবুয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্য আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের নিকট তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করবো। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যুলকারনাইনের আসল নাম ছিলো মারযুবান বিন মারবিয়্যাহ্। তিনি ছিলেন গ্রীস দেশীয় এবং নুহের বংশধর। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রোমের অধিবাসী এবং তাঁর নাম ছিলো সিকান্দার বিন কিবলিস বিন ফিলকাওস। আমার মতে শেষোক্ত উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। শীরাজী তার আল আলকাব গ্রন্থে এবং ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের আপনাপন বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বিশারদ; তাঁর মতে যুলকারনাইন ছিলো রোমীয়। তিনি ছিলেন তাঁর বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁর আর এক নাম ছিলো সেকেন্দার। ইবনে মুনজির উল্লেখ করেছেন, কাতাদা বলেছেন, সেকেন্দার ও যুলকারনাইন একই ব্যক্তি।"[৭৮]

كان أهل الكتاب أو المشركون، سألوا رسول الله ﷺ عن قصة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول: { سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا } فيه نبأ مفيد، وخطاب عجيب. أي: سأتلوا عليكم من أحواله، ما يتذكر فيه، ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله، فلم يتله عليهم.

অর্থাৎ, "আহলে কিতাব অথবা মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যুল-কারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا "অচিরেই আমি তোমাদের নিকট তার সম্পর্কে বর্ণনা করিব" এতে উপকারী সংবাদ ও আশ্চার্যজনক বক্তৃতা রয়েছে। অর্থাৎ অচিরেই তোমাদের কাছে তার অবস্থার কথা বর্ণনা করব। যাতে রয়েছে উপদেশ, শিক্ষা। সুতরাং তাঁর এ অবস্থা ব্যতিত অন্য কিছু তাদের কাছে বর্ণনা করা হয়নি।"[৭৯]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا}

---

[৭৭] মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-আন্দালুসী, *তাফসীরুল বাহরিল মুহিত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১৪৯।

[৭৮] কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী* (ঢাকা: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), ৭ম খণ্ড, পৃ.৩২০।

[৭৯] *তাফসীরুস সাদী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।

অর্থ: "আমি তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং সববিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।"[৮০]

আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ এর ব্যাখ্যা:

وقوله {إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ} أي: أعطيناه ملكًا عظيمًا متمكنًا، فيه له من جميع ما يؤتى الملوك، من التمكين والجنود، وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم، من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها.

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي الأَرْضِ "আমি তাহাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।" অর্থাৎ তাঁকে আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছিলাম এবং সাথে সাথে তার প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে সকল উপায় উপকরণের প্রয়োজন ছিল যেমন, সেনাবাহিনী, যুদ্ধাস্ত্র, কিল্লাসমূহ সব কিছু দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। আরব ও আজমের সকল বাদশাহ তার অনুগত হয়েছিলেন। এ কারণে কেউ কেউ বলেন, যেহেতু যুলকারনাইন সূর্যের দুই প্রান্ত মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এ কারণে তাকে যুলকারনাইন বলা হয়।"[৮১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا আর তাহাকে আমি প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছিলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে অত্র আয়াতের তাফসীর করেন, আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। কাতাদাহ (র) অপর এক ব্যাখ্যা ইহাও করিয়াছেন, আমি তাহাকে পৃথিবীর সকল মনযিল ও উহার চিহ্নসমূহ সম্পর্কে অবগত করিয়াছিলাম। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে সকল ভাষা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি যে কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন তিনি তাহাদের ভাষায় তাহাদের সহিত কথা বলিতেন।[৮২]

একদা মুআ'বিয়া (রা.) কাব আল আহ্বারকে (রা.) বলেন: "আপনি কি বলেন যে, যুলকারনাইন তাঁর ঘোড়াটি সারিয়ার (তারকা) সাথে বাঁধতেন?" উত্তরে তিনি বলেন, "আপনি যখন এটা বললেন তখন শুনুন! আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি তাকে সব সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র দান করেছিলাম।" প্রকৃতপক্ষে এই অস্বীকারের ব্যাপারে সত্য মুআ'বিয়ার (রা.) সাথেই ছিল। এজন্যেও যে, কাব (রা.) লিখিত যা কিছু যেখানেই পেতেন বর্ণনা করে দিতেন। যদিও তা মিথ্যা হতো। এজন্যেই তিনি বলতেনঃ "কাবের মিথ্যা তো বার বার সামনে এসেছে।" অর্থাৎ তিনি নিজে তো মিথ্যা বানিয়ে নিতেন না বটে, কিন্তু তিনি যে রিওয়াইয়াতই পেতেন তা সনদহীন হলেও বর্ণনা করে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। আর

[৮০] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৮৪।
[৮১] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৮৯।
[৮২] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৮৮।

এটা তো স্পষ্ট কথা যে, বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত মিথ্যা, অশ্লীল কথন এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষিত নয়। তা ছাড়া বানী ইসরাঈলের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করারও আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের হাতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই বনী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতগুলি মুসলমানদের মধ্যে অনেক অকল্যাণ ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং বড় রকমের ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। কাব (রা.) এই বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতকে প্রমাণ করতে গিয়ে কুরআন কারীমের এই আয়াতের যে শেষাংশ পেশ করেছেন এটাও ঠিক নয়। কেননা, এটাতো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান যে, কোন মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর ও সারিয়ার উপর পৌঁছবার ক্ষমতা দেন নাই। বিলকীস সম্পর্কেও কুরআন কারীমে এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

{وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ}

অর্থাৎ "তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে।"[৮৩] এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, বাদশাহদের কাছে সাধারণতঃ যা কিছু থাকে ঐ সবই তার নিকট বিদ্যমান ছিল। অনুরূপ ভাবে হযরত যুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন তিনি ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করে যেতে পারেন এবং যমীনকে যেন মুশরিক ও কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারেন। আর যেন আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের সাথে একত্ববাদীদের রাজত্ব ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব কাজে যে সব আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়ে থাকে, ঐ সব কিছুই মহামহিমান্বিত আল্লাহ যুলকারনাইনকে প্রদান করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আলীকে (রা.) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত তিনি কি রূপে পৌঁছে ছিলেন?" উত্তরে তিনি বলে ছিলেনঃ "সুবহানাল্লাহ! মেঘমালাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্যে সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন ও সর্ব প্রকারের শক্তি তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

জলাশয়ের নিকট হযরত যুলকারনাইন একটি জনগোষ্ঠীর দেখা পেলেন। পশুর চামড়ার পোশাক পরিহিত এসব মানুষ ছিল কাফির। সমুদ্র তটে যেসব মৃত মাছ ও পশু ভেসে আসত, সেসবই ছিল তাদের খাদ্য। হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, পঙ্কিল জলাশয়ের সন্নিকটে একটি বড় শহর ছিল, যার প্রাচীরের দরজার সংখ্যা ১২ হাজার।[৮৪]

যুলকারনাইন আল্লাহর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পশ্চিম প্রান্তের এমন এক সমুদ্র সৈকতে পৌঁছেন যেখানে সামনে কৃষ্ণবর্ণের পানি ও কাদা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। অথৈ জলাশয়ের ওপারে কোন জন-মানব বা বন-জঙ্গলের চিহ্ন নেই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) বলেন, দুনিয়ার আবাদী কত দূর বিস্তৃত, তা দেখার জন্য যুলকারনাইন ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি পশ্চিমের সেই প্রান্তে পৌঁছেন, যেখানে কেবল জলাভূমি। মানুষ ও নৌযান সেখানে চলাচল করতে পারে

[৮৩] আল কুরআন, সূরা আন নামল, ২৭ : ২৩।

[৮৪] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৮৯।

না।[৮৫] যুলকারনাইন পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের কিনারায় পৌঁছেছিলেন যেখানে প্রচুর দ্বীপ রয়েছে।[৮৬]

আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দিলেন যে, তিনি জলাশয়ের সন্নিহিত জনগোষ্ঠীকে ইচ্ছা করলে তাওবার মাধ্যমে ঈমান গ্রহণ করতে উদ্ধুদ্ধ করতে পারবেন। যদি তারা ঈমানের দাওয়াত কবুল করে, তাহলে তাদেরকে হিদায়াতের পথ নির্দেশনা দেবেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের পরিচালিত করবেন। যদি তারা ঈমান কবুল করতে সম্মত না হয়, তাহলে তিনি তাদেরকে বন্দী করতে পারবেন, শাস্তি দিতে পারবেন। যুলকারনাইন প্রথমোক্ত পথ গ্রহণ করে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেন। শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দান করে তাদেরকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন।[৮৭] যুলকারনাইন দুর্বল ও নিরীহ মানুষদের রক্ষা করেন এবং উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বিনীত ও অবাধ্যদের শাস্তি প্রদান করেন।[৮৮]

শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, দেশ বিজয়, সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ন্যায়বিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপকরণসমূহ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁকে দান করা হয়েছিল। এক কথায় সে যুগে যেসব বিষয় একজন ধর্মপ্রচারক ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য প্রয়োজন ছিল, সব কিছু ছিল তাঁর নাগালের মধ্যে। সর্বপ্রথম তিনি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছানোর উপকরণসমূহ কাজে লাগান।[৮৯]

যুলকারনাইন সম্পর্কে কুরআনুল কারিম যে সকল তথ্য উপস্থাপন করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. যুলকরনাইনের বিশ্ববিজয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

{فَأَتْبَعَ سَبَبًا (৮৫) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (৮৬) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (৮৭) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا}

অর্থ: "অতঃপর সে একটি পথ অবলম্বন করল। অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে একটি কর্দমাক্ত পানির ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেল এবং সে এর কাছে একটি জাতির দেখা পেল। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি তাদেরকে আযাবও দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদাচরণও

---

[৮৫] শাব্বির আহমদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী* (লন্ডন: আল কোরআন একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ.৪০৪।

[৮৬] *রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াল সাবউল মাসালী*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.৩৫২।

[৮৭] *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৪-৬৫; *তাফসীরে মাজিদী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১৯; *তাফসীরে উসমানী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৪।

[৮৮] Abdullah Yousuf Ali, *The English Translation and Meanings of the Holy Quran,* (USA: The Institute of Islamic Knowledge, 1997), P. 754, Note No. 2431

[৮৯] *আল-বাহুরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২০; *মা'আরিফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২১।

করতে পার'। সে বলল, 'যে ব্যক্তি যুলম করবে, আমি অচিরেই তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তাকে তার রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তাকে কঠিন আযাব দেবেন'। 'আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমি আমার ব্যবহারে তার সাথে নরম কথা বলব'।[৯০]

২. সূর্যের উদয়াচলে যুলকারনাইন

যুলকারনাইনের পূর্বে দিগন্ত সফর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (৮৯) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (৯০) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا}

অর্থ: 'তারপর সে আরেক পথ অবলম্বন করল। অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে এসে পৌঁছল তখন সে দেখতে পেল, তা এমন এক জাতির উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য আমি সূর্যের বিপরীতে কোন আড়ালের ব্যবস্থা করিনি। প্রকৃত ঘটনা এটাই। আর তার নিকট যা ছিল, আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।'[৯১]

অতএব যুলকারনাইন অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনীর বিরাট বহর সহকারে পূর্ব দিগন্তে পৌঁছে দেখতে পান, পঙ্কিল জলাশয় ভেদ করে সূর্য উদিত হচ্ছে। সেখানে তিনি এমন এক জাতিকে দেখেন যারা উলঙ্গ, হিংস্র ও উন্মুক্ত প্রান্তরে যাযাবরের ন্যায় বসবাস করছে। তাদের কোন পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর ও তাঁবু ছিল না। সেখানকার মাটি ঘর নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা ছিল কাফির। যুলকারনাইন তাদের সাথে এমন আচরণ করেন, যেমন পশ্চিম দিগন্তের লোকদের সাথে করেছিলেন।[৯২]

পশ্চিম প্রাপ্ত হতে পূর্ব দিগন্তে যাওয়ার পথে যেসব জাতির দেখা হত, তিনি তাদের তাওহীদের দাওয়াত নিতেন। যদি তারা দাওয়াত কবুল করত তবে ভালো, অন্যথায় তিনি তাদের সাথে লড়াই করতেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তারা পরাজিত হলে যুলকারনাইন বিজিতদের সম্পত্তি, গবাদি পশু ও কর্মচারী নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন এনে সম্মুখপানে অগ্রসর হতেন। এভাবে পথ চলতে চলতে তিনি সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছেন। সেখানে দেখা গেল এক বিরাট জনবসতি। গাছ-পালাবিহীন এ প্রান্তরে বসবাসকারী মানুষগুলো দিগম্বর ও জঙ্গী। গায়ের বর্ণ লাল, দৈহিক আকারে খাটো। সামুদ্রিক মাছই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। হাসান আল বসরী (রহ.) বলেন, এসব মানুষ সূর্যোস্তের পর মাটির গর্তে অথবা পানির মধ্যে সুড়ঙ্গে চলে যেত, সূর্যোদয়ের পর মাটির গর্ত অথবা পানি হতে উঠে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করত। এসব লোকের কান ছিল বড় বড় এবং তাদের সাথে একটি করে বাচ্চা ও বিছানা থাকত। ইমাম ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.) বলেন, এ এলাকায় কোন পাহাড়-পর্বত নেই। দূর অতীতে এক

---

[৯০] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৮৫ -৮৮।

[৯১] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৮১-৯১।

[৯২] *আল-কাশ্‌শাফ আলন হাকায়িফি গাওয়ামিযিত তানযীল*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৪৫; *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫৩।

একটি সেনাদল এখানে এসে হাযির হলে স্থানীয় জনগণ তাদেরকে বলল, সূর্যোদয়ের সময় তোমরা এখানে থাকবে না। জবাবে তারা বলল, আমরা রাতের মধ্যেই এ এলাকা ত্যাগ করব। কিন্তু বল: সেসব উজ্জ্বল হাড়ের স্তুপ কি করে এখানে এল? তারা জবাব দেয়, কিছুদিন পূর্বে এখানে একটি সেনাদল আসে, সূর্যোদয়ের সময় তারা অবস্থান করেছিল, ফলে সব লোকেরই মৃত্যু ঘটে। এসব হাড়গোড় তাদেরই।[৯৩]

৩. দু'পর্বত প্রাচীরে যুলকারনাইন

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেন,

{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (৯২) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (৯৩) قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (৯৪) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (৯৫) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (৯৬) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا}

অর্থ: "তারপর সে আরেক পথ অবলম্বন করল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জুজ ও মা'জুজ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন'? সে বলল, 'আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব'। 'তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও'। অবশেষে যখন সে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে দিল, তখন সে বলল, 'তোমরা ফুটক দিতে থাক'। অতঃপর যখন সে তা আগুনে পরিণত করল, তখন বলল, 'তোমরা আমাকে কিছু তামা দাও, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই'। এরপর তারা (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না।"[৯৪]

যুলকারনাইন উত্তর দিকে যাত্রা করে যে পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেন তা ছিল আরমেনিয়া ও আযারবাইজানের সন্নিহিত মঙ্গোলীয় ভূখণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্ত।[৯৫] যুলকারনাইন সেখানে যে জাতিগোষ্ঠীর দেখা পেলেন তারা বিশেষ একটি ভাষায় কথা বলত। ফলে তারা অন্য মানুষের ভাষা বুঝতে পারত না এবং অন্যরাও তাদের ভাষা বুঝত না। আল্লামা যামাখশারী (রহ.) বলেন যে, তারা

---

[৯৩] *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১৫তম খণ্ড, পৃ.৩৮২; *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.০৯।

[৯৪] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯২-৯৭।

[৯৫] *আল-বাহুরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৪।

বোবার মতো ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলত।[৯৬] কিন্তু আল্লাহ তা'আলা-প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যুলকারনাইন তাদের ভাষা ও বাকরীতি বুঝতে সক্ষম হন। শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-বাগাবী (রহ.) বলেন, যুলকারনাইন দোভাষীর মাধ্যমে তাদের সাথে কথোপকথন করেন।[৯৭]

স্থানীয় জনগণ পর্বতের মধ্যখানে একটি শক্ত দেওয়াল তৈরি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে যুলকারনাইনকে বিপুল পরিমাণ লৌহের ওপর কয়লা, কয়লার ওপর লাকড়ি, লাকড়ির ওপর লৌহখণ্ড এভাবে স্তরের ওপর স্তর তৈরি করে হুকুম দেন আগুন ধরে ফুঁক দিতে থাক। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার দহনে লৌহপিণ্ড যখন লোহিত অঙ্গারের বর্ণ ধারণ করল, তখন তিনি তাম্র আনার হুকুম দেন। জনগণ তখন তাম্রখণ্ড এনে দিলে তিনি তাম্র পিণ্ডগুলো জ্বলন্ত লৌহের ওপর ঢেলে দেন। এভাবে লৌহখণ্ড গলিত তাম্রের সংমিশ্রণে পর্বতশৃঙ্গসম এক শক্তিশালী প্রাচীর রচিত হয়ে গেল। ইয়াজুজ-মাজুজ নামক দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতির পক্ষে এ সুকঠিন প্রাচীর অতিক্রম ও ভেদ করা অসম্ভব হয়ে গেল। ফলে তাদের ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হতে পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণ রেহাই পেল। মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী (রহ.) বলেন, যুলকারনাইনের সাথে প্রাচীর নির্মাণে পারদর্শী একদল বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ছিলেন।[৯৮]

যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১২০০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং উচ্চতা ১০০ হাত।[৯৯] প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর যুলকারনাইন আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এ প্রাচীর যে একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তারও ইঙ্গিত দেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ছাড়া দুনিয়ার কোন সৃষ্টি চিরস্থায়ী নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

{قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا}

অর্থ: "সে (যুলকারনাইন) বলল, 'এটা আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে, তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য'।"[১০০]

এখানে প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:

১. যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা এ প্রাচীর বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন

২. কিয়ামতের দিনই আল্লাহ এ প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন

৩. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের সময় এটা ধ্বংস করে দিতে পারেন।[১০১]

---

[৯৬] *আল-কাশ্‌শাফ আলন হাকায়িফি গাওয়ামিযিত তানযীল*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৪৬।

[৯৭] *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২১৪।

[৯৮] *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫৫-৬২; *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১০; *তাফসীরুল মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৫-৬৬; *তাফসীরে মাজিদী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২০-৬২১।

[৯৯] *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২১৪-২১৫।

[১০০] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯৮।

[১০১] *মা'আরিফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২১-৬৪২।

ইতিহাসবিদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.), হাফিয আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ) ও ইয়াকুত আল-হামাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আযারবাইজান জয় করার পর ২২ হিজরী সালে সুরাকা ইবনে আমরকে আবুল আবওয়াবে (দারবান্দ) অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। সুরাকা (রা.) মূল অভিযান পরিচালনার পূর্বে আবদুর রহমান ইবনে রাবীআকে অগ্রবর্তী সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করে সেখানে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান যখন আরমেনীয় অঞ্চলে পৌঁছেন তখন এলাকার শাসনকর্তা শহরবরায যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি বাবুল আবওয়াব অভিমুখে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিলেন। এ মুহূর্তে শহরবরায তাঁকে বললেন, আমি যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্য একজন লোক পাঠিয়েছিলাম। সে আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারবে। অতঃপর লোকটিকে সেনাপতি আবদুর রহমানের নিকট হাযির করা হয়, সে প্রাচীর এবং এর সন্নিহিত এলাকার মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রদান করেন।[১০২]

পরিশেষে বলা যায় যে, মক্কার কুরাইশদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর কর্ম পরিধি আলোচনা করেছেন। তিনি পৃথিবীর ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন, পৃথিবীর উভয় প্রান্তেই ভ্রমণ করেছেন, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

[১০২] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াজিদ আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়ার রুসুল ওয়াল মুলুক* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৪০; *মু'জামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩০৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আল-হাদীসে যুলকারনাইন

আলোচ্য পরিচ্ছেদে আল হাদীসের আলোকে যুলকারনাইন সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হলো।

ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'সহীহুল বুখারী'তে 'কিতাবু আহাদিসুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে 'বাবু কিস্সাতু ইয়াজুজ-মাজুজ' পরিচ্ছেদে যুলকারনাইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

تَعَالَى (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا * إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا * فَأَتْبَعَ سَبَبًا) إِلَى قَوْلِهِ (انْتُونِى زُبَرَ الْحَدِيدِ) وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ وَهْىَ الْقِطَعُ (حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْجَبَلَيْنِ ، وَالسُّدَّيْنِ الْجَبَلَيْنِ (خَرْجًا) أَجْرًا (قَالَ انْفُخُوا حَتى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِى أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا) أَصُبُّ عَلَيْهِ رَصَاصًا ، وَيُقَالُ الْحَدِيدُ . وَيُقَالُ الصُّفْرُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ النُّحَاسُ . (فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) يَعْلُوهُ ، اسْتَطَاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ لَهُ فَلِذَلِكَ قُوِّيَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ، (وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا * قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّى فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُ دَكَّا) أَلْزَقَهُ بِالأَرْضِ ، وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَهَا ، وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى صَلُبَ مِنَ الأَرْضِ وَتَلَبَّدَ . (وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ) (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) قَالَ قَتَادَةُ حَدَبٍ أَكَمَةٍ . قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ . قَالَ « رَأَيْتَهُ » .

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার বাণী: তারা বলল হে যুলকারনাইন নিশ্চয় ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী।

অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ (হে নবী) তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। .....

আয়াতে سَبَبًا অর্থ চলাচলের পথ ও রাস্তা। তোমরা আমার কাছে লোহার টুকরা নিয়ে আস (১৮:৮৩-৯৬) এখানে زُبَر শব্দটি বহুবচন। একবচনে زُبْرَةٌ অর্থ টুকরা। অবশেষে মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার স্তুপ দু'পর্বতের সমান হল। (১৮:৯৬) তখন তিনি লোকদের বললেন, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। এ আয়াতে الصَّدَفَيْنِ শব্দের অর্থ ইবন আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা অনুযায়ী দু'টি পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। আর السُّدَّيْنِ এর অর্থ দু'টি পাহাড়। خَرْجًا অর্থ পারিশ্রমিক। যুলকারনাইন বললঃ তোমরা হাঁফরে ফুঁক দিতে থাক। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হল, তখ তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস। আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। (১৮:৯৬) قِطْرًا অর্থ সীসা। আবার লৌহ গলিত পদার্থকেও বলা হয়। এবং তামাকেও বলা হয়। আর ইবন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ তাম্রগলিত পদার্থ বলেছেন। (আল্লাহর বাণী) এরপর তারা (ইয়াজুজ মাজুজ) এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না। (১৮:

৯৭) অর্থাৎ তারা এর উপরে চড়তে সক্ষম হল না। اِسْطَاعَ শব্দটি طعت له থেকে بَاب اِسْتَفْعَلَ আনা হয়েছে। একে أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ ও أَسْطَ যবরসহ পড়া হয়ে থাকে। আর কেহ কেহ একে أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ রূপে পড়েন। (আল্লাহর বাণী) তারা তা ছিদ্রও করতে পারল না। তিনি বললেন, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। (১৮:৯৮-৯৮) دكاء অর্থ মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। نَاقَةٌ دَكَّاءُ বলে যে উটের কুঁজ নেই। الدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ যমীনের সেই সমতল উপরিভাগকে বলা হয় যা শুকিয়ে যায় এবং উচু নিচু না থাকে। (আল্লাহর বাণী) আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য, সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব, এ অবস্থায় যে, একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে। (১৮:৯৯) (আল্লাহর বাণী) এমন কি যখন ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চ ভুমি থেকে ছুটে আসবে (২১:৯৬) কাতাদা (রহঃ) বলেন, حَدَبٍ অর্থ টিলা। এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি প্রাচীরটিকে কারুকার্য খচিত চাদরের মত দেখেছি। নবী (সাঃ) বললেন, তুমি তা ঠিকই দেখেছ।"[১০৩]

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায় যে, হাদীসে নববীতে একাধিক হাদীস এবং বহুসংখ্যক আছার যুলকারনাইন সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। এদের মধ্যে কতেক সহীহ (الصحيح), কতেক দয়ীফ (الضعيف) অথবা কতেক মাওদুহ (الموضوع)। তন্মধ্য থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদিস নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. قَلَ سَ نْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَقَالَ: «مَلِكٌ مَسَحَ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهَا بِالْأَسْبَابِ» قَلَ خَالِدٌ: وَسَمِعَ رُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يَقُولُ: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اللَّهُمَّ غَفْرًا، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ؟» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ هُ تَعَالَى: « نْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ فَالْحَقُّ مَا قَالَ، وَالْبَاطِلُ مَا خَالَفَهُ»

অর্থ: ১. "সালমা মুহাম্মদের সূত্রে বলেন। তিনি বলেন, খালিদ ইবনে মা'দান এর সূত্রে ছাওর ইবনে ইয়াযিদ আমার কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বলেছেন, বিভিন্ন কারণে পৃথিবী ভ্রমণকারী রাজা।" "খালেদ বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এক ব্যক্তি থেকে শুনতে পেয়েছেন এমন যে, তিনি বলেছেন, হে যুলকারনাইন [বলে কাউকে ডাকছেন]। তখন উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ ক্ষমা করে দিন। তোমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের নামে নামকরণ করা যথেষ্ট মনে করনি এখন ফেরেশতাদের নামও ব্যবহার করতে শুরু করেছ?" মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বলে থাকেন, তবে তিনি যা বলেছেন তা সত্য। আর মিথ্যা যা এর বিরোধীতা করে।"[১০৪]

[১০৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (বৈরূতঃ দারু ইবনে কাসীর, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ.১২১৯।

[১০৪] শায়েখ আল-ইস্পাহানী, *আল-আযমাতু* (রিয়াদঃ দারুল আছিমাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৪৭৯; শায়েখ আল-ইস্পাহানী, *দালায়িলুন নাবুওয়াহ* (রিয়াদঃ দারু তায়্যিবাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), পৃ.২১৭।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আলোচ্য হাদিসটির বিশ্লেষণ না করলেও হাদিসটি ইঙ্গিত করে যে, যুলকারনাইন একজন বাদশাহ, যিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। এ বিষয়টি আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। তিনি সূর্য্যের উদয়স্থলে ও অস্তস্থলে পৌঁছেছেন।

২. عن علي رَضِيَ الله تعالى عنه قال كان ذو القرنين عبدا صالحا نصح الله عز وجل فنصحه فضرب على قرنه الأيمن فمات فأحياه الله عز وجل ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله عز وجل وفيكم مثله

অর্থ: ২. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুলকারনাইন আল্লাহর এক সৎ বান্দা। আল্লাহ তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি উপদেশ কবুল করেছেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তারা তাঁর ডান দিকের শিং এর উপর সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন। আবারও তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা তাঁর বাম দিকের শিং এর উপর আঘাত করে। এ আঘাতেও তিনি মত্যুবরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে জীবিত করেন। আর তোমাদের মাঝে তাঁর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।[১০৫]

৩. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أدري أتبع لعينا كان أم لا و ما أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا و ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا

অর্থ: ৩. "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি জানি না তিনি অভিশপ্ত অনুসারী ছিলেন কি না, আমি জানি না যুলকারনাইন নবী ছিলেন কি না এবং আমি জানি না 'হদ' তথা শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি কার্যকৃত ব্যক্তির জন্য তা তার গুনাহের কাফফারা হবে কি না।"[১০৬]

৪. عن أبي الورقاء قال: "قلت لعلي بن أبي طالب: ذو القرنين ما كان قرناه؟ قال لعلك تحسب بأن قرنيه ذهب أو فضة؟ كان نبيا بعثه الله إلى ناس، فدعاهم إلى الله تعالى، فقام رجل فضرب قرنه الايسر، فمات ثم بعثه الله فأحياه، ثم بعثه إلى ناس، فقام رجل فضرب قرنه الأيمن فمات فسماه الله ذا القرنين".

অর্থ: ৪. "আবুল ওয়ারাকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, যুলকারনাইনের শিং দুটি কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, তুমি হয়ত মনে করতে পারে যে, তাঁর শিং দু'টি সোনালী বা রূপালি ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এমন ছিল না। বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জনগণের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দেন। তখন এক ব্যক্তি তার বাম শিংয়ে এমন আঘাত দেয় যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার

---

[১০৫] আহমদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক আবু বকর আশ-শায়বানী, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী* (রিয়াদ: দারুর রয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.১১২।

[১০৬] *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহিহাইন*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদিস নং-২১৭৪, পৃ.১৭।

জন্য প্রেরণ করেন। তারপর আরেক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর মাথার ডান শিংয়ে এমন আঘাত দেয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যুলকারনাইন নামে নামকরণ করেন।"[১০৭]

৫. عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ : كَيْفَ بَلَغَ ذُو الْقَرْنَيْنِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ ، وَبُسِطَ لَهُ النُّورُ ، وَمُدَّ لَهُ الأَسْبَابُ ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكَ ؟ قَالَ : حَسْبِي.

অর্থ: ৫. "হাবিব বিন হিমাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা.) কে বলা হয়েছিল: যুলকারনাইন কীভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে ভ্রমণ করেছিল? তিনি বললেন: মেঘকে তার বশীভূত করা হয়েছিল। তার জন্য আলো ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং তার জন্য উপায়-উপকরণ প্রসারিত করা হলো। তারপর তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে আরও অতিরিক্ত কিছু বলবো? তিনি বললেন: যথেষ্ট।"[১০৮]

৬. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ، عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ خَبَرًا مُطَوَّلًا جِدًّا فِيهِ أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ كَانَ لَهُ صَاحِبٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ: رَنَاقِيلُ. فَسَأَلَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ: هَلْ تَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ عَيْنًا يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ الْحَيَاةِ؟ فَذَكَرَ لَهُ صِفَةَ مَكَانِهَا، فَذَهَبَ ذُو الْقَرْنَيْنِ فِي طَلَبِهَا وَجَعَلَ الْخَضِرَ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ، فَانْتَهَى الْخَضِرُ إِلَيْهَا فِي وَادٍ فِي أَرْضِ الظُّلُمَاتِ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَلَمْ يَهْتَدِ ذُو الْقَرْنَيْنِ إِلَيْهَا. وَذَكَرَ اجْتِمَاعَ ذِي الْقَرْنَيْنِ بِبَعْضِ الْمَلَائِكَةِ فِي قَصْرٍ هُنَاكَ، وَأَنَّهُ أَعْطَاهُ حَجَرًا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى جَيْشِهِ سَأَلَ الْعُلَمَاءَ عَنْهُ، فَوَضَعُوهُ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، وَجَعَلُوا فِي مُقَابَلَتِهِ أَلْفَ حَجَرٍ مِثْلَهُ فَوَزَنَهَا، حَتَّى سَأَلَ الْخَضِرَ فَوَضَعَ قُبَالَهُ حَجَرًا، وَجَعَلَ عَلَيْهِ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ فَرَجَحَ بِهِ، وَقَالَ: هَذَا مَثَلُ ابْنِ آدَمَ لَا يَشْبَعُ حَتَّى يُوَارَى بِالتُّرَابِ. فَسَجَدَ لَهُ الْعُلَمَاءُ تَكْرِيمًا لَهُ وَإِعْظَامًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অর্থ: ৬. ইবনে আসাকির ওকী (রহ.) এর সূত্রে ..... যায়নুল আবেদীন থেকে এক দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সারমর্ম হলো, যুলকারনাইনের সাথে একজন ফেরেশতা থাকতেন। তাঁর নাম ছিল রানাকীল। একদিন যুলকারনাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীতে একটি ঝর্ণা আছে নাকি, যা আইনুল হায়াত বা সঞ্জীবনী ঝর্ণা? ফেরেশতা ঝর্ণাটির অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। যুলকারনাইন তার সন্ধানে যাত্রা শুরু করলেন। খিযির (আ.) কে তিনি অগ্রবর্তী দলে রাখলেন। যেতে যেতে এক অন্ধকার উপত্যকায় গিয়ে ঝর্ণার সন্ধান পেলেন। খিযির ঝর্ণার কাছে গিয়ে সেখান থেকে পানি পান করলেন। কিন্তু যুলকারনাইন ঝর্ণার কাছে যেতে পারলেন না। তিনি সেখানে অবস্থিত একটি প্রাসাদে এক ফেরেশতার সাথে মিলিত হলেন। ফেরেশতা যুলকারনাইনকে একটি পাথর দান করলেন। পরে তিনি সেনাবাহিনীর নিকট ফিরে এলে আলিমগণ পাথরটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি পাথরটিকে ওজন করার জন্য এক পাল্লায় রাখলেন এবং অপর পাল্লায় অনুরূপ এক হাজার পাথর রাখলেন। কিন্তু ঐ পাথরটির পাল্লা ভারী হল। তখন খিযির (আ.)ও পাথরটির রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি

---

[১০৭] আলাউদ্দিন আলী ইবনে হিসামুদ্দিন আল-বুরহানপুরী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্বওয়াল ওয়াল আফয়াল* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), হাদিস নং-৪৪৯২, ২য় খণ্ড, পৃ.৪৫৬-৪৫৭।

[১০৮] আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী শায়বাহ আল-কুফী, *মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামেলাহ), হাদিস নং-৩২৫৭৮, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫৬৩।

তার বিপরীত পাল্লায় একটি পাথর উঠিয়ে এক মুষ্টি মাটি ছেড়ে দিলেন। এবার পাল্লাটি ভারী হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, এটা ঠিক বনী আদমের উপমা যারা কবরের মাটি ছাড়া কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। এ দৃশ্য দেখে আলিমগণ ভক্তিভরে তাঁর প্রতি নত হলেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।"[১০৯]

৭. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيٌّ.

অর্থ: ৭. "আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যুলকারনাইন নবী ছিলেন।"[১১০]

৮. عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ يَمْلِكَ الأَرْضَ كُلَّهَا إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : مُسْلِمَانِ وَكَافِرَانِ , فَأَمَّا الْمُسْلِمَانِ : فَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، وَذُو الْقَرْنَيْنِ , وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَبُخْتَ نُصَّرَ ، وَالَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ.

অর্থ: ৮. মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমস্ত পৃথিবীতে চারজন ব্যক্তি রাজত্ব করেছেন। দু'জন মুসলমান এবং দু'জন কাফের। তন্মধ্যে দু'জন মুসলমান হলেন: ১. সুলায়মান ইবনে দাউদ, ২. যুলকারনাইন এবং দু'জন কাফের। ১. বখতে নাসের, ২. (নমরুদ) যে রবের ব্যাপারে ইবরাহিম (আ.) এর সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল।[১১১]

৯. عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا ، وَلاَ مَلِكًا , وَلَكِنَّهُ كَانَ عَبْدًا نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ ، فَدَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَسُمِّيَ ذَا الْقَرْنَيْنِ.

অর্থ: ৯. আবু তোফায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুলকারনাইন সম্পর্কে আলী (রা.) এর কাছে প্রশ্ন করা হয়? তিনি বলেন, তিনি নবী ছিলেন না, তিনি ফেরেশতাও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর এক বান্দা। আল্লাহ তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি উপদেশ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তারা তাঁর ডান দিকের শিং এর উপর সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন। আবারও তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা তাঁর বাম দিকের শিং এর উপর আঘাত করে। এ আঘাতেও তিনি মত্যুবরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে জীবিত করেন। এ কারণেই তাঁকে যুলকারনাইন নামে নামকরণ করা হয়।[১১২]

১০. عن ابن عباس : أن حيي بن أخطب ، وكعب بن أسد ، وأسبع ، وسموءل ، قالوا لعبد الله بن سلام ، حين أسلم : ما تكون النبوة في العرب ولكن صاحبك ملك ، ثم « **أتوا النبي فسألوه عن** ذي القرنين ، فقص عليهم ما جاءه من الله فيه »

[১০৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৪৭।
[১১০] *মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩২৫৭৪, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫৬২।
[১১১] *মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩২৫৭৯, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫৬৪।
[১১২] *মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩২৫৭৭, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫৬৩।

অর্থ: ১০. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। হুয়ায় ইবনে আখতাব, কাব ইবনে আসাদ, আসবা ও সামুআল আব্দুল্লাহ ইবনে সালামকে বলেছেন, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণে করেছিলেন: নবুওয়াত আরবে নাই, তবে তোমার সঙ্গী রাজা। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (যুলকারনাইন) সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে সে ঘটনা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন।"[১১৩]

১১. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قَالَ: كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ جَلَّ صَالِحًا، وَكَانَ مِنَ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ ضَخْمٍ، وَكَانَ قَدْ مَلَكَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَكَانَ لَهُ خَلِيلٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَافِيلُ، وَكَانَ يَأْتِي ذَا الْقَرْنَيْنِ يَزُورُهُ، فَبَيْنَا هُمَا ذَاتَ يَوْمٍ يَتَحَدَّثَانِ، إِذْ قَالَ لَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ: حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ عِبَادَتُكُمْ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، وَمَا **عِبَادَتُكُمْ عِنْدَ عِبَادَتِنَا فِي السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ** قِيَامٌ لَا يَجْلِسُونَ أَبَدًا، وَمِنْهُمْ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ أَبَدًا، وَرَاكِعٌ لَا يَسْتَوِي

অর্থ: ১১. "আবু জাফর থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, যুলকারনাইন আল্লাহর নেককার বা সৎ বান্দাদের মধ্য থেকে একজন সৎ বান্দা ছিলেন। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপুল মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। তিনি সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। ফেরেশদের মধ্যে থেকে তাঁর একজন বন্ধু ছিল তাঁর নাম হলো যিয়াফিল। তিনি যুলকারনাইনের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। একদা উভয়ের মাঝে কথোপকথন হচ্ছিল। যুলকারনাইন তাঁকে বললেন, আমাকে বলো! আসমানে তোমাদের ইবাদতের ধরন কী? ফেরেশতা বললেন: অতঃপর সে (যুলকারনাইন) কেঁদে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে যুলকারনাইন! তোমাদের ইবাদতের মতো আসমানে আমাদের ইবাদত নয়। যে সমস্ত ফেরেশতাগণ দাঁড়িয়ে ইবাদত করেন তাঁরা কখনো বসে না। আর তাঁদের (ফেরেশতাদের মধ্যে) মধ্যে যারা সেজদাকারী তাঁরা কখনো মাথা উঁচু করে না। আর যারা রুকুকারী তাঁরা সোজা হয় না।"[১১৪]

১২. حَدَّثَنَا أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ بَعْدِي بُعُوثٌ كَثِيرَةٌ فَكُونُوا فِي بَعْثِ خُرَاسَانَ ثُمَّ انْزِلُوا مَدِينَةَ مَرْوَ فَإِنَّهُ بَنَاهَا ذُو الْقَرْنَيْنِ وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ وَلَا يَضُرُّ أَهْلَهَا سُوءٌ

অর্থ: ১২. আওস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন আমার ভাই সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি তাঁর দাদা বুরাইদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার পরে অনেক অভিযান হবে, সুতরাং তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করবে। সুতরাং তোমরা খোরাসান অভিযানে অংশগ্রহণ করো। অতঃপর তোমরা 'মারওয়া' শহরে অবতরণ করবে। কেননা এ

---

[১১৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *আহাদিসুল মারফুআতি মিনাল তারিখীল কাবীর* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), হাদিস নং-১৯৩, পৃ.৫৩৫।

[১১৪] শায়েখ আল-ইস্পাহানী, *আল-উযমাহ* (রিয়াদ: দারুল আসিমাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৪৬১।

শহরকে তৈরি করেছিলেন যুলকারনাইন। তিনি এর জন্য বরকতের দোয়া করেছেন এবং এর অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।"[১১৫]

১৩. عن أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله الوادعي قال كتاب سمعت معاوية يقول : ملك الأرض أربعة : سليمان بن داود و ذو القرنين و رجل من أهل حلوان و رجل آخر فقيل له : الخضر ؟ فقال : لا

অর্থ: ১৩. "আবু ইসহাক সাবীয়ী ..... মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহী করেছেন চারজন। ১. সুলায়মান ইবনে দাউদ, ২. যুলকারনাইন, ৩. হুলওয়ানের জনৈক অধিবাসী এবং ৪. অন্য একজন। জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কি খিযির? বললেন, না।"[১১৬]

১৪. وأخرج ابن أبي حاتم عن بكر بن مضر أن هشام بن عبد الملك سأله عن ذي القرنين : أكان نبيا ؟ فقال : لا ولكنه إنما أعطي ما أعطي بأربع خصال كان فيه : كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا حدث صدق ولا يجمع اليوم لغد

অর্থ: ১৪. ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন বকর ইবনে মিদর এর সূত্রে। হিশাম ইবনে আবদুল মালেক এর কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি কি নবী ছিলেন? তিনি বলেন: না; কিন্তু তাঁকে চারটি বৈশিষ্ট দান করা হয়েছিল, যা অন্য কাউকে দান করা হয় নি। তা হলো: ১. যদি সক্ষম হতেন, তবে ক্ষমা করতেন, ২. যখন তিনি ওয়াদা করতেন, তবে তা পূর্ণ করতেন, ৩. যখন তিনি কথা বলতেন তখন সত্য কথা বলতেন এবং ৪. আজকের কাজকে আগমী কালের জন্য একত্রিত করতেন না।[১১৭]

১৫. عن على : أنه سئل عن ذى القرنين فقال كان عبدا أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه فبعثه إلى قوم يدعوهم إلى الله فدعاهم إلى الله وإلى الإسلام فضربوه على قرنه الأيمن فمات فأمسكه الله ما شاء ثم بعثه فأرسله إلى أمة أخرى يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام ففعل فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأمسكه الله ما شاء ثم بعثه فسخر له السحاب وخيره فيه فاختار صعبه على ذلوله وصعبه الذى لا يمطر وبسط له النور ومد له الأسباب وجعل الليل والنهار عليه سواء فبذلك بلغ مشارق الأرض ومغاربها (ابن إسحاق ، والفريابى ، وابن أبى الدنيا فى كتاب لم أقف عليه ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم)

অর্থ: ১৫. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাকে ভালবাসতেন। তিনিও তাঁকে ভালবাসতেন। তিনি আল্লাহর শুভাকাংক্ষী ছিলেন এবং আল্লাহও তাঁর শুভাকাংক্ষী ছিলেন। তিনি তাঁকে আল্লাহর দিকে আহবান করার

[১১৫] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), হাদিস নং-২৩০১৮, ৩৮তম খণ্ড, পৃ.১২৬।

[১১৬] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিসাবুরী, *আস-মুসতাদরাক* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), হাদিস নং-৪১৪৩, ২য় খণ্ড, পৃ.৬৪৫।

[১১৭] আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী, *আদ-দুররুল মানসুর* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ.৪৩৯।

জন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের আল্লাহর দিকে এবং ইসলামের দিকেও আহবান করলেন। সে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর ডান দিকের শিং আঘাত করলো। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা মতো সময় তাঁকে এভাবে রাখলেন। অতঃপর তিনি তাকে জীবিত করলেন। তিনি তাকে অন্য একটি সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলেন আল্লাহর দিকে এবং ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য। অতঃপর তিনি তাই করলেন। সে সম্প্রদায়ও তাঁর বাম শিং এ আঘাত করলো। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা মতো সময় তাঁকে এভাবে রাখলেন। অতঃপর তাকে জীবিত করলেন। অতঃপর তিনি তার জন্য মেঘমালাকে তার অধীনস্থ করে দেন এবং তাঁকে কল্যাণ দান করলেন। তাই তিনি সহজ ও কঠিনের মাঝে কঠিনকে নির্বাচন করেন যাতে বৃষ্টি হয় না। তিনি তার জন্য আলোকে প্রসারিত করলেন। বিভিন্ন উপায় সম্প্রসারণ করলেন। তার জন্য রাত ও দিন উভয়কে একই রকম করে দিলেন। এর ফলেই তিনি সূর্যের উদয় স্থলে এবং অস্ত স্থলে পৌঁছেছেন। [আলোচ্য হাদিসটি ইবনে ইসহাক ..... এবং ইবনে মুনযির এবং ইবনে আবু হাতিম বর্ণনা করেন]।[১১৮]

যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে ইসরাঈলি বর্ণনা

উপরিউক্ত বর্ণনার ন্যায় কতিপয় পূর্ববর্তী আলিম যুলকারনাইন সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা, আসার, বিষয় সংশ্লিষ্ট সংবাদ উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে তারা ইসরাঈলি বর্ণনাও উল্লেখ করেন যা তাদের কাছে নকল করেছেন ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ আল-ইয়ামিনী, কাব আল-আহবার এবং আরও অনেকেই। তাদের মধ্যে অন্যতম মুসলিমাহ আল-ইহুদ। ঐ সমস্ত বর্ণনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাগুলো উপস্থাপন করা হবে যা ইসরাঈলি বর্ণনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এমনটি ইবনে কাসীর ও অন্যান্যরা সংবাদ প্রদান করেছেন।

وَأَمَّا الْأَخْ الْإِسْرَائِيلِيَّةَ فيما يَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُؤَرِّخِيْنِ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا وَمِنْهَا مَا هُوَ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا وَقَعَ وَكَثِيرٌ مِنْهَا بَلْ أَكْثَرُهَا مِمَّا يَذْكُرُهُ الْقُصَّاصُ مَكْذُوبٌ مُفْتَرًى وَضَعَهُ زَنَادِقَتُهُمْ وَضُلَّالُهُمْ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ

مَا هُوَ صَحِيحٌ لِمُوَافَقَتِهِ مَا قَصَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا هُوَ مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ لِمُخَالَفَتِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَمِنْهَا مَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فَهَذَا الَّذِي أُمِرْنَا بِالتَّوَقُّفِ فِيهِ فَلَا نُصَدِّقُهُ ولا نكذبه كما ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ

অর্থাৎ, ইসরাঈলীদের থেকে বর্ণিত তাদের বর্ণনা, যেগুলো অনেক তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, তার সংখ্যা তো বহু, এগুলোর কিছু কিছু সঠিক এবং প্রকৃত ঘটনার অনুকূল বটে; কিন্তু অধিকাংশ হল মিথ্যা, অসত্য ও বানোয়াট। তাদের পথভ্রষ্ট ও সত্যত্যাগী লোকেরা এগুলো রটনা করেছে এবং তাদের কাহিনীকাররা প্রচার করেছে।

[১১৮] *আদ-দুররু আল-মানসুর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৪৪৭।

ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো তিন প্রকার। ১. কতক বর্ণনা সঠিক। আল্লাহর কুরআনে বর্ণিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে বিবৃত ঘটনাসমূহের অনুরূপ। ২. কতক বর্ণনা এরূপ যে, কুরআন ও হাদিসের সরাসরি বিপরীত হওয়ার কারণে এগুলোর অসত্য ও বানোয়াট হওয়া সুস্পষ্ট। ৩. কতক এমন যে, এগুলো সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। এ জাতীয় বর্ণনাগুলো সম্পর্কেই আমাদেরকে নীরব থাকতে বলা হয়েছে। আমরা এগুলোকে সত্যও বলব না, মিথ্যাও বলব না। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ.

অর্থাৎ, "ইহুদি ও নাসারাগণ যখন তোমাদের নিকট কোন কথা পেশ করে তখন তোমরা তাদেরকে সত্যবাদীও সাব্যস্ত করো না; মিথ্যাবাদীও সাব্যস্ত করো না। বরং তোমরা বল: আমরা সে সবের প্রতি ঈমান এনেছি, যেগুলো আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতিও অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[১১৯]

وَقَدْ ذَكَرَ اِبْن جَرِير هَاهُنَا عَنْ وَهْب بْن مُنَبِّه أَثَرًا طَوِيلًا عَجِيبًا فِي سِيَر ذِي الْقَرْنَيْنِ وَبِنَائِهِ **السَّدّ** وَكَيْفِيَّة مَا جَرَى لَهُ وَفِيهِ طُول وَغَرَابَة وَنَكَارَة فِي أَشْكَالهمْ وَصِفَاتهمْ وَطُولهمْ وَقِصَر بَعْضهمْ ذَانهمْ وَرَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ أَحَادِيث غَرِيبَة لَا تَصِحّ أَسَانِيدهَا وَاَللَّه أَعْلَم .

অর্থাৎ, "ইবনে জরীর (রহ.) ও ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুকারনাইনের জীবন কাহিনী, প্রাচীর নির্মাণ ও তাঁহার পর্যটন কালের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ এই রেওয়ায়েতটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বটে কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নহে। ইবনে আবূ হাতিম (রহ) তাহার পিতা হইতেও অনেক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু এগুলোর সনদও সহীহ নহে।"[১২০]

আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ "আর আপনার কাছে তারা যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে....."। [আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৩] মারফু সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তা হলো:

فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: ثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ شَيْخَيْنِ، مِنْ نَحِيبٍ، قَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَتَحَدَّثُ، قَالَا: أَتَيَاهُ فَقَالَا: جِئْنَا لِنُحَدِّثَنَا، فَقَالَ: كُنْتُ يَوْمًا أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، **فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَنِي** أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقَالُوا: نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَ **لَنَا** عَلَيْهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: « ، وَمَا لَهُمْ، مَا لِي عِلْمٌ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ» **ثُمَّ قَالَ**: «**اسْكُبْ لِي مَاءً**» فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، قَالَ: فَمَا فَرَغَ حَتَّى عَرَفْتُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْهُمْ عَلَيَّ، وَمَنْ رَأَيْتَ مِنْ أَصْحَابِي» فَدَخَلُوا فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «**إِنْ شِئْتُمْ سَأَلْتُمْ فَأَخْبَرْتُكُمْ عَمَّا**

[১১৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১৪৭।

[১২০] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ مَكْتُوبًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَخْبَرْتُكُمْ» ، **قَالُوا: بَلَى أَخْبِرْنَا، قَالَ: " حِئْتُمْ تَسْأَلُونِي عَنْ ذِي** لَقَرْنَيْنِ، وَمَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ: كَانَ شَابًّا مِنَ الرُّومِ، فَجَاءَ فَبَنَى مَدِينَةَ مِصْرَ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ مَلَكٌ فَعَلَا بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى مَدِينَتِي وَمَدَائِنَ، ثُمَّ عَلَا بِهِ، فَقَالَ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى مَدِينَتِي، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَقَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى الأَرْضَ، قَالَ: فَهَذَا اليَمُّ مُحِيطٌ نْيَا، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ تُعَلِّمُ الجَاهِلَ، وَتُثَبِّتُ العَالِمَ، فَأَتَى بِهِ السَّدَّ، وَهُوَ جَبَلَانِ لَيِّنَانِ يَزْلِقُ عَنْهُمَا **كُلُّ شَيْءٍ**، ثُمَّ مَضَى بِهِ حَتَّى جَاوَزَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى أُمَّةٍ أُخْرَى، وُجُوهُهُمْ وُجُوهُ الكِلَابِ يُقَاتِلُونَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، ثُمَّ مَضَى بِهِ حَتَّى قَطَعَ بِهِ أُمَّةً أُخْرَى يُقَاتِلُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وُجُوهَهُمْ وُجُوهُ الكِلَابِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى قَطَعَ بِهِ هَؤُلَاءِ إِلَى أُمَّةٍ أُخْرَى قَدْ سَمَّاهُمْ"

অর্থাৎ, "আবু কুরাইব আমাদেরকে এ সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে যায়েদ বিন হাব্বাব ইবন লাহিয়ার সূত্রে বলেছেন, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনাম তাজিবের দুই শাইখের সূত্রে আমাকে বলেন, তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলল, আমাদেরকে উকবা ইবনে আমেরের কাছে নিয়ে যাও। যাতে আমরা আলোচনা করতে পারি। তারা বলল, তারা তার কাছে এলো এবং তারা বলল: আমরা তার সাথে কথা বলতে এসেছি। তিনি বললেন: একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর কাছ থেকে বের হলাম এবং এক আহলে কিতাব একটি দল আমার সাথে সাক্ষাত করল এবং তারা বলল: আমরা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমাদের জন্য তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসেন। আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তাঁকে সে সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলাম। তিনি বললেন, আমার কি এবং তাদের কি, আল্লাহ আমাকে যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমার কোন জ্ঞান নেই।" তারপর তিনি বললেনঃ আমার জন্য পানি ঢালুন, অতঃপর ওযু করলেন, তারপর নামায পড়লেন। তিনি বললেন: তিনি শেষ করেননি যতক্ষণ না আমি তাঁর চেহারায় আনন্দ দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বলেন, তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমার সাথীদের আমি দেখলাম: তারা প্রবেশ করল, তাঁর পাশে দণ্ডায়মান হলো। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও, তবে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার। আমি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করবো, যদি তা তোমাদের কিতাবে লিখিত থাকে। যদি তোমরা চাও তবে তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করবো। তারা বলল: হ্যাঁ, আমাদের সংবাদ প্রদান করুন। তিনি বললেন: তোমরা আমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ। তিনি রোমের একজন যুবক ছিলেন। তিনি মিসরে এসে আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি তৈরি করলেন। অতঃপর তিনি তা থেকে অবসর হলে আকাশের একজন ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করলেন এবং তাকে নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন এবং বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছে? সে বললো, আমি আমার শহর ও শহরগুলো দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) তাকে নিয়ে আরো উপরে উঠে গেল এবং বলল, এখন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? সে বলল: আমি আমার শহর দেখতে পাচ্ছি, অতঃপর তিনি তাকে নিয়ে আর উপরে উঠলেন এবং বললেন, তুমি কি দেখছ? সে বললেনঃ আমি পৃথিবী দেখছি। তিনি বললেন, সমুদ্র দুনিয়াকে ঘিরে আছে। আসলে আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি অজ্ঞদের শিক্ষা দিন, আর জ্ঞানী বিশ্বস্তকে স্থীতিশীল করেন। তাই তিনি তাকে বাঁধের কাছে নিয়ে

আসেন, যা দুটি নরম পর্বত যা থেকে সবকিছু সরে যায়, তারপর তিনি তাকে নিয়ে যান যতক্ষণ না তিনি ইয়াজুজ ও মাজুজ অতিক্রম করেন, তারপর তিনি তাকে অন্য জাতির কাছে নিয়ে যান, যাদের মুখগুলো কুকুরের মুখের ন্যায়। তারা ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে যুদ্ধ করে। তারপর তিনি তাকে নেতৃত্ব দেন যতক্ষণ না তিনি অন্য একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন যাদের মুখ কুকুর ন্যায় ছিল। তাদের সাথে লড়াই করেন, তারপরে তিনি চলে গেলেন যতক্ষণ না তিনি তাদের নাম উল্লেখ করে ছিলেন।"[১২১]

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, আলোচ্য হাদিসটি সহীহ নয়।[১২২]

আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আদ-দুররে মানসুর" -এ উপরিউক্ত হাদিসের ন্যায় হাদিস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মিসরের ইতিহাস সম্পর্কে ইবনে আব্দুল হাকিম থেকে বর্ণনা করেন। ইবনে আবু হাতেম, আবু শায়েখ, বায়হাকী তাঁর 'আদ-দালায়েল' গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তার সবই ইসরাঈলী বর্ণনা যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

وقد أورد ابن جرير ههنا والأموي في مغازيه حديثاً أسنده, وهو ضعيف, عن عقبة بن عامر أن نفراً من اليهود جاءوا يسألون النبي ﷺ عن ذي القرنين, فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء, فكان فيما أخبرهم به أنه كان شاباً من الروم, وأنه بنى الاسكندرية, وأنه علا به ملك إلى السماء وذهب به إلى السد, ورأى أقواماً وجوههم مثل وجه الكلاب, وفيه طول ونكارة, ورفعه لا يصح, وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل.

والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره, ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة, وذلك غريب منه, وفيه من النكارة أنه من الروم, وإنما الذي كان من الروم الاسكندر الثاني, وهو ابن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم, فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه, وكان وزيره الخضر عليه السلام, وأما الثاني فهو اسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني, وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف المشهور. والله أعلم.

অর্থাৎ, "ইবনে জরীর (রহ.) তার তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াত প্রসংগে এবং উমাভী তার যুদ্ধ অধ্যায়ে উকবাহ ইবনে আমের হইতে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইহুদিদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আসার পরই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তিনি রূমের একজন যুবক ছিলেন। আলেকজান্দরিয়া শহর তিনিই নির্মাণ করেছেন। একজন ফিরিশতা তাকে আসমান পর্যন্ত উঠাইয়া নিলেন অতঃপর তাঁকে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে তিনি এমন এক কওমকে দেখতে পেলেন যাদের মুখমন্ডল কুকুরের মত ছিল। হাদীসটি দীর্ঘ ও মুনকার 'মারফু' হওয়া ঠিক নয়। অধিকাংশের মতে এটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত।

---

[১২১] আবু জাফর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১৮তম খণ্ড, পৃ.৯২।

[১২২] দারুযাহ মুহাম্মদ ইযযাত, *আত-তাফসিরুল হাদিস* (কায়রো: দারু ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১৩৮৩ হি.), ৫ম খণ্ড, পৃ.৯৩।

কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় যে, আবূ যুরআহ (র)-এর ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তিনি স্বীয় "দালায়েলুন্ নবুয়ত" নামক গ্রন্থে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুলকারনাইনকে রূমের অধিবাসী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ইস্কান্দার ছিলেন রূমের অধিবাসী। তিনি "ফাইলিবস মাকদুনী" এর পুত্র ছিলেন। যার দ্বারা রূমের ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হয়েছে। আর প্রথম ইস্কান্দার তিনি ইবরাহীম (আ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করে তখন তাঁর সাথে তাওয়াফ করেছিলেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। খিযির (আ) তার উজীর ছিলেন। এবং দ্বিতীয় ইস্কান্দার তিনি ছিলেন ইস্কান্দার ইবনে ফাইলিবস মাকদুনী। গ্রীকের অধিবাসী এবং তার উজীর ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল। (و الله أعلم)।[১২৩]

সুতরাং বলা যায় যে, আল কুরআনের পাশাপাশি আল হাদিসেও যুলকারনাইনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। এতে তিনি যে নবী ছিলেন না তা সুস্পষ্ট। পাশাপাশি তিনি ইবরাহিম (আ.) এর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাওহীদের দাওয়াত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মূলত আল হাদিসে যুলকারনাইনের জীবনের প্রতিটি দিকই আলোচিত হয়েছে।

[১২৩] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১২৩-১২৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় ও অন্যান্য অবস্থা

ইসহাক ইবনে বিশর ..... ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে,

كَانَ نَيْنِ مَلِكًا صَالِحًا، رَضِيَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ، وَكَانَ مَنْصُورًا، وَكَانَ الْخَضِرُ وَزِيرَهُ. وَذَكَرَ أَنَّ الْخَضِرَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ عَلَى مُقَدَّمَةِ جَيْشِهِ وَكَانَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاوِرِ، الَّذِي هُوَ مِنَ الْمَلِكِ بِمَنْزِلَةِ الْوَزِيرِ فِي إِصْلَاحِ النَّاسِ الْيَوْمَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَزْرَقِيُّ وَغَيْرُهُ، أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، وَطَافَ مَعَهُ بِالْكَعْبَةِ الْمُكَرَّمَةِ هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ، عَلَيْهِ لَامُ. وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ حَجَّ مَاشِيًا، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ بِقُدُومِهِ تَلَقَّاهُ وَدَعَا لَهُ وَرَضَّاهُ، وَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لِذِي الْقَرْنَيْنِ السَّحَابَ يَحْمِلُ حَيْثُ أَرَادَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অর্থাৎ, "যুলকারনাইন ছিলেন একজন ধার্মিক বাদশাহ। আল্লাহ তাঁর কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন -আল কুরআনুল কারীমে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত। খিজির (আ.) ছিলেন তাঁর উজির। তিনি আরও বলেছেন যে, খিজির (আ.) থাকতেন তাঁর সেনাবাহিনীর অগ্রভাবে। বর্তমান কালে বাদশাহর নিকট উজিরের যে স্থান, যুলকারনাইনের নিকট খিজিরের ছিল ঠিক সেইরূপ উপদেষ্টার মর্যাদা। আযরাকী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, যুলকারনাইন ইবরাহিম খলিলুল্লাহ (আ.)[১২৪] এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইবরাহিমের সাথে তিনি ও ইসমাঈল (আ.) একত্রে কা'বা তাওয়াফ করেন। উবায়দ ইবন উমায়ির তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ও অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেছেন যে, যুলকারনাইন পদব্রজে হজ্জ পালন করেন। ইবরাহিম (আ.) তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন, তাঁকে দোয়া করেন ও তাঁর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আল্লাহ মেঘপুঞ্জকে যুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি যেতে চাইতেন মেঘমালা তাকে সেখানে বহন করে নিয়ে যেত।"[১২৫]

---

[১২৪] ইবরাহিম (আ.) (আরবি: ابراهيم, হিব্রু ভাষায়: 'তোরাহ' অনুসারে আব্রাহাম, ইংরেজি: Abraham। আনুমানিক প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে তিনি বর্তমান ইরাকের দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত উর নগরীতে অনেকের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ২০১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আরেক বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি নূহ (আ.)-এর প্লাবন হতে ১২৬৩ (মতান্তরে ১০৯৯) বছর পর আবির্ভূত হন। মৃত্যুবরণ করেন, ১৮১৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ১৭১৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। তিনি ইসলাম ধর্মের একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী ও রাসূল। পবিত্র কুরআনে তাঁর নামে একটি সূরাও রয়েছে। তিনি মুসলিম জাতির পিতা। ইসলাম ছাড়া ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মেও ইব্রাহিম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। দ্র. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি., ১৪১৫ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; আছ-ছালাবী, *কাসাসুল আম্বিয়া* (তুরস্ক, ১২২৬ হি.), পৃ. ৭৬; ইমাম নববী, *আল-জাওয়ালাবী* (লিবসিয়া: আল-মুআব্বার, ১৮৬৭ খ্রি.), পৃ.২৬; *তাজুল উরুস মিন জাওয়াহিরি কামুস*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২।

[১২৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৩৮।

وَيُقَالُ: إِنَّهُ جِيءَ بِفَ لِيَرْكَبَهَا فَقَالَ: لَا أَرْكَبُ فِي بَلَدٍ فِيهِ الْخَلِيلُ. فَسَخَّرَ اللَّهُ لَهُ السَّحَابَ، وَبَشَّرَهُ إِبْرَاهِيمُ بِذَلِكَ، فَكَانَتْ تَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ. قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا} [الكهف: 92] يَعْنِي غُثْمًا. فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ هُمُ التُّرْكُ، أَبْنَاءُ عَمِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

অর্থাৎ, কথিত আছে, তিনি (ইবরাহিম আ.) একটি ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যান এবং যুলকারনাইনকে তাতে আরোহণ করতে বলেন। কিন্তু যুলকারনাইন অস্বীকার করে বলেন, যে শহরে আল্লাহর খলীল বিদ্যমান আছেন সেই শহরে আমি বাহনে আরোহণ করে প্রবেশ করব না। তখন আল্লাহ মেঘমালাকে তাঁর অনুগত করে দেন এবং ইবরাহিম এ সুখবর তাঁকে জানিয়ে দেন। তিনি যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন মেঘমালা তাঁকে সেখানে নিয়ে যেত। আল্লাহর বাণী: "আবার সে এক পথ চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তীস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না।" [সূরা আল-কাহফ, ১৮:৯২] এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা হলো তুর্কি জাতি। ইয়াজুজ-মাজুজের জ্ঞাতি ভাই।[১২৬]

আলোচ্য বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, যুলকারনাইনের সমকালীন অবস্থা হলো ইবরাহিম খলিলুল্লাহ (আ.) এর সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা। নিম্নে যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো:

আল-কুরআনুল কারীমে যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। তখনকার ধর্মীয় অবস্থা **মূর্তিপূঁজা** নির্ভর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ **رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنا** بِهِ عَالِمِينَ - **إِذْ قَالَ** لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ **مَا** هَذِهِ التَّمَاثِيلُ **الَّتِي أَنْتُمْ** لَهَا **عَاكِفُونَ** - **قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا** لَهَا عَابِدِينَ - **قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ** مُبِينٍ - **قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ** مِنَ اللَّاعِبِينَ - **قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي** فَطَرَهُنَّ **وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ** مِنَ الشَّاهِدِينَ

অর্থ: "আর আমি ইতিপূর্বে ইব্রাহিমকে তার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ও ছিলাম। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: এ মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ। তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ? তিনি বললেন, না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এ বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা।"[১২৭]

[১২৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৪৮।

[১২৭] আল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৫১-৫৬।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيًّا، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً، يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً، يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِن الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرحْمَنِ عَصِيّاً، يَا أَبَتِ إِنِّيْ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرحْمَنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً.

অর্থ: "আর স্মরণ কর এ কিতাবে ইব্রাহিমকে। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী'। 'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! তুমি তার পূঁজা কেন কর, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না? 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব'। 'হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য'। 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে'।"[১২৮]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتتخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلالٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থ: "স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ'।"[১২৯]

কিন্তু ইব্রাহিমের এ প্রাণভরা আবেদন পিতা আযরের হৃদয় স্পর্শ করল না। রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত এবং সম্রাটের মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র হওয়ায় সে বিষয়টি এড়িয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ-

অর্থ: "যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার সম্মান তাকে পাপে স্ফীত করে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হল নিকৃষ্টতম ঠিকানা।"[১৩০] বস্তুতঃ অহংকারীদের চরিত্র সর্বত্র ও সর্বযুগে প্রায় একই হয়ে থাকে।

পুত্রের আকুতিপূর্ণ দাওয়াতের উত্তরে পিতা বলল,

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِيْ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمَنكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا-

[১২৮] আল কুরআন, সূরা মারিয়াম, ১৯ : ৪১-৪৫।
[১২৯] আল কুরআন, সূরা আল-আন'আম, ০৬ : ৭৪।
[১৩০] আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ২০৬

অর্থ: 'হে ইবরাহিম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি আমার সম্মুখ হ'তে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও'।[১৩১]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা ছিল মূর্তিপূঁজা নির্বর। তারা আল্লাহর শিরক করত। মূর্তিপূঁজা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না। বরং তা ছিল সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। যেমন আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক তাঁর সম্প্রদায়কে মূর্তিপূঁজা ছেড়ে একক আল্লাহর ইবাদত করার আহবানের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيْمَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ، قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ، أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ، قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ، قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ، وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ، رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْماً وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ، وَاجْعَل لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَاغْفِرْ لِأَبِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ، وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ، إِلا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ، وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ، مِنْ دُوْنِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ، فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ، وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْنَ، قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ، تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ، إِذْ نُسَوِّيْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَمَا أَضَلَّنَا إِلا الْمُجْرِمُوْنَ، مَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ، وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِيْنَ- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: "আর তাদেরকে ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। যখন সে স্বীয় পিতা ও সমপ্রদায় ডেকে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। সে বলল, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি? তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত। ইব্রাহিম বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের তোমরা পূজা করে আসছ? তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা। তারা সবাই আমার শত্রু, বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। যিনি আমাকে আহার দেশ ও পানীয় দান করেন। যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। আশা করি শেষ বিচারের দিন তিনি আমার ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন। হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। তুমি আমাকে

[১৩১] আল কুরআন, সূরা মারিয়াম, ১৯ : ৪৬।

নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (হে প্রভু) 'তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। (হে আল্লাহ) 'পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত কর না।

যে দিনে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সরল হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। (ঐ দিন) জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে। এবং জাহান্নাম বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে। (ঐ দিন) তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায় যাদেরকে তোমরা পূজা করতে? আল্লাহর পরিবর্তে। তারা কি (আজ) তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা তারা কি কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারে?। 'অতঃপর তাদেরকে এবং (তাদের মাধ্যমে) পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। 'তারা সেখানে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বলবে আল্লাহর কসম! আমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিলাম, 'যখন আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কথিত উপাস্যদেরকে) বিশ্বপালকের সমতুল্য গণ্য করতাম। আসলে আমাদেরকে পাপাচারীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল। ফলে (আজ) আমাদের কোন সুফারিশকারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়! যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম, তাহলে আমরা ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা পরাক্রান্ত ও দয়ালু।"[১৩২]

স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়ের নিকটে ইবরাহিমের দাওয়াত ও তাদের জবাবকে আল্লাহ অন্যত্র নিম্নরূপে বর্ণনা করেন। যেমন-

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ **مَا** هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ **الَّتِيْ أَنْتُمْ** لَهَا **عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا** لَهَا عَابِدِيْنَ، **قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ** مُّبِيْنٍ، **قَالُوْا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ** اللاَّعِبِيْنَ، **قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِيْ** فَطَرَهُنَّ **وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ** الشَّاهِدِيْنَ، **وَتَاللهِ لأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوْا** مُدْبِرِيْنَ-

অর্থ: "যখন সে তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, এ মূর্তিগুলি কী, যেগুলোর পূজায় তোমরা রত রয়েছ?। তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পূজা করতে দেখেছি। সে বলল, তোমরা প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ এসেছ, না কেবল কৌতুক করছ?। সে বলল, না। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে তোমাদের উপর অন্যতম সাক্ষ্যদাতা। আল্লাহর কসম! যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কিছু করে ফেলব।[১৩৩]

আলোচ্য পরিচ্ছেদের আলোচনা থেকে এ কথা প্রমানিত হয় যে, ইবনে কাসীর (রহ.) এর বর্ণনা মতে, যুলকারনাইন ইবরাহিম (আ.) এর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করেন। সেখানে তাঁর জন্য তিনি দোয়া করেন।

[১৩২] আল কুরআন, সূরা আশ শু'আরা, ২৬ : ৬৯-১০৪।
[১৩৩] আল কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৫২-৫৭।

কথিত আছে, ইবরাহিম (আ.) এর দোয়ার বরকতেই তিনি দ্রুত পৃথিবীর দু'প্রান্ত ভ্রমণ করতে পেরেছিলেন। তাই এ কথা সহজেই বলা যায় যে, যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা আর ইবরাহিম (আ.) এর সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা একই। অর্থাৎ যুলকারনাইনের সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা ছিল মূর্তিপূঁজায় জর্জরিত।

এছাড়া যুলকারনাইন বা সাইরাস বা খোরাসের ধর্মের ব্যাপারে তাওরাত ও ইতিহাস উভয়ের বক্তব্যই এক। যেভাবে তিনি ইরানের বিচ্ছিন্ন অংশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; অন্যের ক্ষমতা ও প্রতাপের অনুগত হওয়ার পরিবর্তে বাবেল ও নিনাওয়ার শক্তিশালী রাজ্যগুলোকে তাঁর অনুগত করে নিয়েছিলেন; এবং যেভাবে যুগের উৎপীড়ক ও অত্যাচারী রাজাদের বিপরীতে ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া- মমতার ওপর তাঁর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করেছিলেন, তেমনিভাবে তিনি তাঁর মতাদর্শের ব্যাপারেও ইরানের প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে সত্য ধর্মের অনুসারী এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর একত্বের দাবিদার ছিলেন।

আযরার (উযায়ের আ.) কিতাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে খোরাসের স্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে- "আর ইয়ারমিয়াহর মুখ থেকে নিঃসৃত আল্লাহ তাআলার বাণী পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে পারস্যসম্রাট খোরাসের রাজত্বের প্রথম বছর আল্লাহ তাআলার তার অন্তরকে উত্তেজিত করে তুললেন। তিনি তার সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দিলেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা, আসমানের খোদা, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো জেরুজালেমে যা ইয়াহুদায় অবস্থিত তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করি। সুতরাং, তার সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তোমাদের মধ্যে কে কে আছে, যার সঙ্গে তার খোদা রয়েছে এবং সে ইয়াহুদার শহর জেরুজালেমে যাবে এবং ইসরাইলের খোদার ঘর বানাবে। কেননা, তিনিই খোদা যিনি জেরুজালেমে আছেন।"[১৩৪]

"বাদশাহ খোরাসের রাজত্বের প্রথম বছরে আমি বাদশাহ খোরাস আল্লাহ তা'আলার যে ঘর জেরুজালেমে রয়েছে তার ব্যাপারে এই নির্দেশ প্রদান করলাম যে, এই ঘর এবং যেখানে কুরবানি করা হয় তা পুনর্নির্মাণ করা হোক, দৃঢ়তার সঙ্গে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক, তার যাবতীয় ব্যয় বাদশাহর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নির্বাহ করা হোক। আল্লাহর ঘরের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত যেসব পাত্র ও তৈজসপত্র বাদশাহ বনু কাদানযার (বুখতেনাস্সার) জেরুজালেমের পবিত্র উপসনাকেন্দ্র থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে এবং বাবেলে রেখেছে, সেগুলো ফেরত দেয়া হোক এবং জেরুজালেমের উপাসনাকেন্দ্রে বস্তুগুলোকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেয়া হোক, অর্থাৎ, আল্লাহর ঘরে রেখে দেয়া হোক।"[১৩৫]

[১৩৪] সহীফায়ে আযরার কিতাব, ১ম অধ্যায়, আয়াত ১-৪।
[১৩৫] সহীফায়ে আযরার কিতাব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, আয়াত ১-৫।

খোরাসের ঘোষণা এবং লিপির চিহ্নিত বাক্যগুলো পড়ুন। তারপর এই মীমাংসা করুন তার বিষয়বস্তুর মধ্যে শুধু এই ঘোষণাই নয় যে, ইহুদিদেরকে বাবেল থেকে মুক্ত করার পর বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে; বরং তার চেয়ে অধিক এ বিষয়টি রয়েছে যে, খোরাস বলছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই আদেশ করেছেন, আমি তাঁর ঘর পুনর্নির্মাণ করি, আর বিষয় এই যে, আল্লাহ সেই মহান সত্তার নাম, যিনি জেরুজালেমের খোদা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস আল্লাহর ঘর।

এখন এরই সঙ্গে খোরাসের স্থলবর্তী রাজা প্রথম দারা[১৩৬] ইহুদিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে আদেশপত্র প্রদান করেছিলেন তা দেখুন। এই আবেদনে ইহুদিরা কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলো যে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করছে। দারা তাঁর আদেশপত্রে লিখেছেন- "নদীতীরের সুবাদার তান্তি ও শাতারবুযি এবং তাদের সঙ্গী আফারেস্কি- যারা নদীর তীরে রয়েছে তোমরা সবাই ওখান থেকে দূর হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর ঘরের নির্মাণে হস্তক্ষেপ করো না। ইহুদিদের যারা কার্যনির্বাহী তারা এবং তাদের বড় বড় ব্যক্তিরা আল্লাহর ঘরকে তাঁর স্থানে নির্মাণ করবে। ..... তারপর সেই আল্লাহ যিনি তাঁর নামকে ওখানে রেখেছেন যেসব বাদশাহ ও লোক আমার আদেশ লঙ্ঘন করে জেরুজালেমে অবস্থিত আল্লাহর ঘরকে বিকৃত করার জন্য হাত বাড়াবে, তাদেরকে ধ্বংস করুন। আমি দারা আদেশ করছি, এই কাজ অতিসত্তর বাস্তবায়িত করা হোক।"[১৩৭]

দারা এই নির্দেশপত্রে উচ্চাশার সঙ্গে প্রকাশ করছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস নিঃসন্দেহে আল্লাহর ঘর। তা ছাড়া তিনি অভিশাপ দিচ্ছেন যে, বাদশাহ হোক আর সাধারণ মানুষ হোক যে-কেউ আল্লাহর ঘরের অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দিন।

তাওরাত থেকে এসব স্পষ্ট ও পরিষ্কার সাক্ষ্য-প্রমাণের পর যা খোরাসের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করছে এখন কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রমাণও উল্লেখ্য।

দারা তাঁর রাজত্বকালে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন। তিনি পর্বতের কঠিন ও দৃঢ় শিলার ওপর লিপি অঙ্কন করে ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন। এসব শিলালিপি তাঁর ও খোরাসের স্বর্ণযুগকে আলোর জগতে নিয়ে আসছে। দারার শিলালিপিগুলো থেকে একটি শিলালিপি ইরানের বিখ্যাত শহর ইসতাখারে[১৩৮] পাওয়া গেছে। এই শিলালিপিকে প্রাচীন ইতিহাসের একটি দুষ্প্রাপ্য ভাণ্ডার মনে করা হচ্ছে। কেননা, দারা এই শিলালিপিতে তাঁর জয় করা সব রাজ্য ও প্রদেশের নাম লিখে

---

[১৩৬] খোরাসের রাজত্ব ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এরপর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র (প্রথম কাম্বুজিহর নাতি) দ্বিতীয় কাম্বুজিহ (ইংরেজি Cambyses II)। দ্বিতীয় কাম্বুজিহ খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর ছোটো ভাই, খোরাসের দ্বিতীয় পুত্র, বারদিয়া প্রথম দিকে রাজ্য পরিচালনায় ভাইয়ের সঙ্গে থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ সালে অগ্নিপূঁজকদের গোমাতার সহায়তায় ভাইয়ের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেন। বারদিয়া কয়েক মাস রাজত্ব করেন। এরপর প্রথম দারা তাঁকে অপসারিত করেন। প্রথম দারার রাজত্বকাল ছিলো খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ সাল থেকে ৪৮৬ পর্যন্ত, মোট ৩৬ বছর।

[১৩৭] আযরার (উযায়ের আ.) কিতাব : ষষ্ঠ অধ্যায়।

[১৩৮] এটি ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর: استخر বা اصطخر।

রেখেছেন এবং আরো কিছু বিবরণ দিয়েছেন যা তাঁর ধর্ম, আকিদা ও বিশ্বাস এবং রাজ্য পরিচালনা পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করছে। এই শিলালিপিতেই দারার এই বিশ্বাস অঙ্কিত রয়েছে-

"সুউচ্চ খোদা আহুরমুযদাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে রাজত্ব দান করেছেন। তিনিই আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানুষের সৌভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি সেই সত্তা যিনি দারাকে অনেকের একক শাসনকর্তা ও আইন রচয়িতা বানিয়েছেন।"

"আহুরমুযদাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং আমি তাঁরই অনুগ্রহে জমিনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। আমি আহুরমুযদাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যে, আমাকে ও আমার বংশকে এবং এইসব রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখুন। হে আহুরমুযদা, আমার দোয়া কবুল করুন।"

"হে মানুষ, তোমাদের জন্য আহুরমুযদাহর নির্দেশ এই যে, খারাপ কাজের কল্পনাও করো না। সরল পথ পরিত্যাগ করো না। গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।"[১৩৯]

দারার লিপিগুলোর মধ্যে আসখারের শিলালিপির চেয়েও অধিক গুরুত্ব রাখে তাঁর স্তম্ভবিহীন শিলালিপিটি। তাতে তিনি অগ্নিপূঁজক গোমাতার বিদ্রোহ ও তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী বিস্তারিত লিখেছেন। দারা তাঁর এই লিপিতে গোমাতাকে মুগুশ (অগ্নিপূঁজক) বলেছেন এবং তার বিরুদ্ধে নিজের সফলতাকে আহুরমুযদাহর দয়ার প্রতি সম্পর্কিত করেছেন।

হিরোডোটাস ও অন্যান্য গ্রিক ইতিহাসবেত্তা তার সঙ্গে আরো যোগ করছেন যে, মেডিয়া (Medes, ইরান)-এর সনাতন ধর্মের অনুসারীরা দারার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ করেছিলো, অর্থাৎ অগ্নিপূঁজকদের থেকে এই বিদ্রোহ হয়েছিলো। দারার শাসনামলে গোমাতা ছাড়াও পারাওয়ারতিশ, চিতরাতখাম্মাহ ও অন্যান্য অগ্নিপূঁজক বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে ছিলো। দারার হাতে পারাওয়ারতিশ হামদানে এবং চিতরাতখাম্মাহ আরদাবিলে নিহত হয়েছিলো।[১৪০]

দারা তৎকালে হযরত দানিয়াল আ. এর শত্রুদের বিরুদ্ধে যে আহ্বানমূলক ঘোষণা প্রচার করেছিলেন তা খোরাস ও দারার মুমিন হওয়ার এবং ইরানের প্রাচীন অগ্নিপূঁজার ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। দানিয়াল (আ.)কে তাঁর শত্রুরা সিংহের সামনে নিক্ষেপ করেছিলো এবং দানিয়াল (আ.) অলৌকিকভাবে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষা পেয়েছিলেন। তখন দারা সব জাতি ও সম্প্রদায় এবং ভাষাভাষীকে যারা ভূপৃষ্ঠের ওপর বসবাস করছিলো- পত্র লিখেছিলেন-

"তোমাদের নিরাপত্তার উন্নতি বিধান করা হয়েছে। আমি তোমাদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করছি যে, আমার রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের লোক হযরত দানিয়ালের খোদার সামনে ভীত ও কম্পিত হও। কেননা, তিনি সেই চিরঞ্জীব খোদা, যিনি অনন্ত, তাঁর রাজত্ব অবিনশ্বর এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই

[১৩৯] তরজুমানুল কুরআন, ফনোগ্রেট ম্যাটারিজ অব দি অ্যানশিয়েন্ট ইস্টার্ন থেকে গৃহীত।
[১৪০] দায়িরাতুল মাআরিফ, বুস্তানি।

থাকবেন। তিনিই মুক্তি দেন এবং তিনিই রক্ষা করেন; তিনি আসমানে ও জমিনে নিদর্শনসমূহ দেখাচ্ছেন; তিনি বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটান। তিনি হযরত দানিয়ালকে সিংহের থাবা থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং, এই দানিয়াল দারার রাজ্যে এবং খোরাস ফারেসির রাজ্যে সফলকাম রয়েছে।"[১৪১]

এইসব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এটা খুব ভালোভাবেই জানা যায় যে, দারা ও তাঁর পূর্ববর্তী খোরাসের ধর্ম ইরানের সনাতন মুগুশি বা অগ্নিপূঁজার ধর্ম থেকে ভিন্ন ছিলো এবং সেটার বিরোধী ছিলো। দারা যে মহান সত্তাকে আহুরমুযদাহ বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর যে গুণাবলি বর্ণনা করেছে তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহ খোরাস সত্য ধর্মের ওপর ছিলেন। আর আরবি ভাষায় আল্লাহ, সুরিয়ানি ভাষায় 'উলতহিম', হিব্রু ভাষায় 'ইল' এবং ইরানি ভাষায় 'আহুরমুযদাহ' একই পবিত্র সত্তার নাম। কেননা, দারা বলছেন, তিনি এক ও একক, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তিনিই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। আর যাবতীয় ভালো মন্দ একমাত্র তাঁরই হাতে।

তা ছাড়া তাঁরা খাঁটি তাওহীদের প্রতি ঈমান রাখার সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের প্রতিও ঈমান রাখছেন। সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথের দীক্ষা এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকার শিক্ষা বিস্তার করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের বিশ্বাস ও আকিদার এসব অবস্থা অগ্নিপূঁজকদের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ-কারণেই দারা অগ্নিপূঁজকদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করাকে আহুরমুযদাহর দয়া ও অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও পরিপূর্ণ মুসলিম ছিলেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসতেন। তিনিও আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসতেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাজত্ব পরিচালনা করতেন। আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকার জন্য স্বজাতির লোকদেরকে আহবান করতেন। এ আহবানের দরুন তিনি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণও করেছেন। কিন্তু আল্লাহর নিজ ইচ্ছায় তাঁকে আবার জীবিত করলেন। তারপর আবার তিনি আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন। আবার লোকদের আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এককথায় বলা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তিনি দাওয়াতি কাজে ব্যয় করেছেন। সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা হল অধিকাংশ মানুষ মূর্তিপূজক ছিল। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসীও ছিল।

[১৪১] দানিয়াল আ.-এর কিতাব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, আয়াত ২৫-২৮।

চতুর্থ অধ্যায়
যুলকারনাইনঃ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইতিহাসের আলোকে যুলকারনাইন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ যুলকারনাইন এর রাজত্বকাল ও রাজ্যের পরিধিঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইতিহাসের আলোকে যুলকারনাইন

আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত বান্দার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তন্মধ্যে যুলকারনাইন অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীমে বিশদ বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তাঁর অসামান্য কৃর্তির মধ্যে অন্যতম হলো ককেশাস অঞ্চলের মানুষদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের ক্ষতি সাধন থেকে রক্ষা করার জন্য লৌহা ও তামা মিশ্রিত একটি শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণ। আলোচ্য পরিচ্ছেদে ইতিহাসের আলোকে যুলকারনাইন অর্থাৎ ইতিহাসে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

আল কুরআনুল কারীমে যুলকারনাইনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যুলকারনাইন তাঁর সেনাবাহিনীসহ পৃথিবীতে বিচরণ করেছিলেন। তিনি এক আল্লাহর দিকে আহবানকারী। তিনি পৃথিবীর অস্ত স্থল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا}

অর্থ: "অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে একটি কর্দমাক্ত পানির ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেল এবং সে এর কাছে একটি জাতির দেখা পেল। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি তাদেরকে আযাবও দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদাচরণও করতে পার'।"[১]

أَيْ رَأَى الشَّمْس فِي مَنْظَره تَغْرُب فِي الْبَحْر الْمُحِيط وَهَذَا شَأْن كُلّ مَنْ اِنْتَهَى إِلَى سَاحِله يَرَاهَا كَأَنَّهَا تَغْرُب فِيهِ

অর্থাৎ, "তিনি তাঁর দৃষ্টিতে সূর্যকে আশেপাশের সমুদ্রে অস্ত যেতে দেখেছেন। এটি প্রত্যেকেরই ঘটনা যে উপকুলের শেষপ্রান্তে যাবে, সে দেখবে কিভাবে সেখানে তা অস্ত যায়।"[২]

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, "যুলকারনাইন নামকরণের কারণ হলো তিনি পূর্ব ও পশ্চিমে পরিভ্রমণ করেছেন। যার দরূন আরবরা তাঁকে সূর্যের দু'শিং ওয়ালা বা যুলকারনাইন নামে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর চুলের দুটি বিনুনি ছিল। আর এ বিনুনিগুলিকে শিং নামকরণ করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর পাগড়ির নিচে দু'টি শিং ছিল। কেউ কেউ অন্য কথাও বলেন।

[১] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৬।
[২] *তাফসীরে কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯১-১৯২।

মোদ্দাকথা, এই ব্যাখ্যাগুলির যে কোন একটির দলীল গ্রহণ করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না যার উপর স্থীর হওয়া যায়। যাইহোক, এ বিষয়টি একটি অদৃশ্য বিষয়।"[৩]

আল কুরআনুল কারিমে সূরা আল-কাহফে যুলকারনাইনের পূর্ণাঙ্গ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন:-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ..... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

অর্থ: "তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করবো।' আমি তো তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় উপকরণ দান করেছিলাম। তারপর এক পথ অবলম্বন করলো। চলতে চলতে সে যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌঁছলো তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো। এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলো।' আমি বলেছিলাম, "হে যুলকারনাইন, তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের বিষয়টি সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।' সে বললো যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেবো, তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।' আবার সে এক পথ ধরলো, চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছলো তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি।[৪] এটাই প্রকৃত ঘটনা, তার কাছে যা কিছু ছিলো তা আমি সম্যক অবগত আছি। আবার সে এক পথ ধরলো। চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো তখন সে সেখানে একটি সম্প্রদায়কে পেলো যারা কোনো কথা বুঝবার মতো ছিলো না। তারা বললো, 'হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেবো যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করবেন।' সে বললো, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো; আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যস্থলে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেবো। তোমরা আমার কাছে লোহার পিণ্ডসমূহ নিয়ে আসো।' তারপর মধ্যবর্তী ফাঁপা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বললো, 'তোমরা হাফরে দম দিতে থাকো। যখন তা আগুনের মত উত্তপ্ত হলো তখন সে বললো, তোমরা গলিত লোহা আনয়ন করো, আমি তা ঢেলে দিই এর ওপর।' এরপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তা ভেদও করতে পারলো না। সে (যুলকারনাইন) বললো, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।"[৫]

---

[৩] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯২-১৯৩; *তাফসীরে বাগভী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৫৬৮; *তাফসীরে জালালাইন*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১০২।

[৪] তারা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করতো। তাদের ঘরবাড়ি বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিলো না।

[৫] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৩-৯৮।

আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুলকারনাইন একজন বাদশাহ। যাকে আল্লাহ পৃথিবীতে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজত্ব পরিচালনার জন্য তাঁকে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ দান করেছিলেন। তিনি বহু দেশ জয় করেছিলেন। দেশ জয়ের ধারাবাহিকতায় তিনি সূর্যাস্তের স্থলে পৌঁছলেন। সেখানে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন। যার পিছনে আর কিছুই ছিল না। সেখানে এমন একটি সম্প্রদায় পেলেন, যাদেরকে শাস্তি বা ক্ষমা করার স্বাধীনতা আল্লাহ তা'আলা যুল কারনাইকে দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, যে জুলম করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। সেখান থেকে তিনি সূর্যোদয়ের স্থলে পৌঁছলেন। এখানেও এমন এক সম্প্রদায়কে পেলেন যাদের উপর সূর্যের কোন আবরণ ছিল না। অথবা তাদের বাসস্থানের উপর কোন আবরণ ছিল না। এর কারণ ছিল তাদের বর্বরতা ও হিংস্র কিংবা তাদের মধ্যে সভ্যতার অভাব। অথবা সূর্য তাদের জন্য স্থায়ী ছিল, কখনও অস্ত যেত না।

অতঃপর তিনি পূর্বাঞ্চল থেকে বের হয়ে উত্তরাঞ্চলে গেলেন। সেখানে বিশাল বড় দুটি পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছলেন। যে দুটি পাহাড় সেই সময়ে খুবই সুপরিচিত ছিল। দু'টি পর্বতের নিকটে একটি জাতি পেলেন। ভিন্নভাষী হওয়ার কারণে তাদের মুখের ভাষা বুঝা যাচ্ছিল না। তবে কান ও হৃদয় দ্বারা তাদের কথা বুঝা গেল। তারা যুলকারনাইনের কাছে অভিযোগ করল, ইয়াজুজ-মাজুজ তাদের ক্ষতি সাধন করছে। এ ইয়াজুজ-মাজুজ ছিল বনি আদমের দু'টি বড় জাতি। তিনি ইয়াজুজ-মাজুজদের দমনের জন্য একটি প্রাচীর করতে চাইলেন। এ প্রাচীর নির্মাণে তাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক নেননি। কিন্তু তাঁকে সহযোগিতার জন্য তাদের শক্তির সাহায্য চাইলেন। তাদের শক্তির ব্যবহার করে তিনি লৌহা ও তামাকে গলিত করে দু'পর্বতের সমান একটি লৌহস্তুপ করলেন এবং গলিত তামাকে এর উপর ফোঁটা ফোঁটা করে ঢেলে দেন। যার ফলে বাঁধটি শক্ত হয়ে গেল। ইয়াজুজ ও মাজুজ কখনই তাকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি।

যুলকারনাইন সম্পর্কে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বক্তব্য

তাফসীরকারকদের মাঝে যুলকারনাইনকে নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তিনি নবী ছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি বাদশাহ ছিলেন। ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, সঠিক হলো, তিনি (যুলকারনাইন) বাদশাদের মধ্যে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন।[৬] ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "যুলকারনাইন একজন সৎ বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট। তিনি (আল্লাহ) তাঁর কিতাবে (আল কুরআনে) তার (যুলকারনাইনের) প্রশংসা করেছেন।" আলী (রা.) এর কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বলেছেন: তিনি নবী ছিলেন না, তিনি রাসূল ছিলেন না, তিনি ফেরেশতাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি সৎ বান্দা ছিলেন।" ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, "তাঁর মাথায় দু'টি তামার শিং ছিল।" আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেছেন, এটি দুর্বল। কেউ কেউ বলেছেন, যুলকারনাইন নামকরণ করা হয়; কেননা, তিনি ফারিস ও রোমের বাদশাহ ছিলেন। একারণেই তাঁর এ উপাধী। কেউ কেউ বলেছেন, 'তিনি সূর্যের উদয় ও অস্ত স্থলে পৌঁছেছেন এবং পৃথিবীর এ উভয় প্রান্তেরই শাসক ছিলেন।' কেউ কেউ বলেছেন, "সমস্ত পৃথিবীর চারজন বাদশাহ ছিলেন। দু'জন

[৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৬২।

মুসলমান: ১. সুলায়মান ও ২. যুলকারনাইন। এবং দু'জন কাফের। ১. নমরুদ ও ২. বখতে নসর।" তাফসীর গ্রন্থে তাঁর নামের অর্থ বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে যুলকারনাইন হিসেবে নামকরণ করা হয়। কেননা, তাঁর সূর্যের অস্ত স্থলের ঘটনা এবং সূর্যোদয় স্থলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।" কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মাথার শিং এর মাঝে ছিদ্র ছিল। কেউ কেউ অন্যান্য কথাও বলেছেন। তাঁর নামকরণের ব্যাপারে একমত হওয়া যায়নি। একারণে তাফসির গ্রন্থগুলোতে একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়।[৭]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেছেন, যুলকারনাইন ইবরাহিম (আ.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ.) এর সাথে কাবা ঘর তাওয়াফ করেন। আল্লাম তাবারী (রহ.) উল্লেখ করেন, তিনি খিযির (আ.) এর সময়কার। আর খিযির (আ.) সর্বদা তাঁর সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে থাকতেন। তাঁর কাছে তাঁর মর্যাদা ছিল পরামর্শকের। যেভাবে একজন বাদশাহর কাছে একজন উযিরের মর্যাদা। ইবনে কাসীর (রহ.) এর সাথে সংযোজন করেছেন যে, এটি সহীহ। তিনি খিযির। তিনি সমকালীন আফরিদিউন ছিলেন। মুসা (আ.) তাঁর সাথে জীবিত অবস্থায় সাক্ষাত করেছেন।"[৮]

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: بعثت قُرَيْش النَّضر بن الْحَارث وَعقبَة بن أبي معيط إِلَى أَحْبَار يهود بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا: سلوهم عَن مُحَمَّد وصفوا لَهُم صفته وأخبروهم بقوله فَإِنَّهُم أهل الْكتاب الأول وَعِنْدهم علم مَا لَيْسَ عندنَا من علم الْأَنْبِيَاء فَخَرَجَا حَتَّى أَتَيَا الْمَدِينَة فسألا أَحْبَار يهود عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ووصفا لَهُم أمره وَبَعض قَوْله وَقَالا: إِنَّكُم أهل التَّوْرَاة وَقد جئناكم لتخبرونا عَن صاحبنا هَذَا

فَقَالُوا لَهما: سلوه عَن ثَلَاث فَإِن أَخْبركُم بهن فَهُوَ نَبِي مُرْسل وَإِن لم يفعل فالرجل متقول

فروا فِيهِ رَأْيكُمْ

سلوه عَن فتية ذَهَبُوا فِي الدَّهْر الأول مَا كَانَ من أمرهم فَإِنَّهُ قد كَانَ لَهُم حَدِيث عَجِيب

وَسَلُوهُ عَن رجل طواف بلغ مَشَارق الأَرْض وَمَغَاربهَا مَا كَانَ نبؤه وَسَلُوهُ عَن الرّوح مَا هُوَ فَإِن أَخْبركُم بذلك فَإِنَّهُ نَبِي فَاتَّبعُوهُ وَإِلَّا فَهُوَ متقول

فَأقبل النَّضر وَعقبَة حَتَّى قدما قُرَيْش فَقَالَا: يَا معشر قُرَيْش قد جئناكم بفصل مَا بَيْنكُم وَبَين مُحَمَّد قد أمرنَا أَحْبَار يهود أَن نَسْأَلهُ عَن أُمُور - فأخبراهم بهَا - **فجاؤوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ** وَسلم فَقَالُوا: يَا مُحَمَّد أخبرنَا - فَسَأَلُوهُ عَمَّا أمروهم بِهِ - فَقَالَ لَهُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أخْبركُم غَدا بِمَا سَأَلْتُم عَنهُ - وَلم يسْتَثْن - فانصرفوا عَنهُ وَمكث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خمس عشرَة لَيْلَة لَا يحدث الله إِلَيْهِ فِي ذَلِك وَحيا وَلَا يَأْتِيهِ جِبْرِيل حَتَّى أرجف أهل مَكَّة وأحزن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مكث الْوَحْي عَنهُ وشق عَلَيْهِ مَا يتَكَلَّم بِهِ أهل مَكَّة ثمَّ جَاءَ جِبْرِيل

[৭] *তাফসীরে বাগভী*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৭-১৯৮।

[৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৬২-৫৬৫।

من الله عز وَجل بِسُورَة أَصْحَاب الْكَهْف فِيهَا مُعَاتَبَته إِيَّاه على حزنه عَلَيْهِم وَخبر مَا سَأَلُوهُ عَنهُ من أمر الفتية وَالرجل الطّواف.

অর্থাৎ, "মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কার কুরাইশরা নাদার বিন হারিস ও উকবা বিন মুয়িতকে ইহুদি আলেমদের কাছে প্রেরণ করলো এই বার্তাসহ : তোমরা নিজেদেরকে আহলে কিতাব বলে থাকো এবং তোমরা দাবি করে থাকো যে, তোমাদের কাছে পূর্ববর্তীকালের নবীগণের যে জ্ঞান আছে তা আমাদের কাছে নেই। সুতরাং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আমাদের বলে দাও, তাঁর নবুওতের দাবির সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের ওহি সম্বলিত কিতাবে কোনো আলোচনা বা সংকেত আছে কি-না।

ফলে, কুরাইশের প্রতিনিধি দল ইয়াসরিবে (মদীনায় পৌঁছে ইহুদি আলেমদের কাছে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। ইহুদি আলেমগণ তাদেরকে বললো, তোমরা অন্যান্য কথা বাদ দাও। আমরা তোমাদেরকে তিনটি প্রশ্ন বলে দিচ্ছি। যদি তিনি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেন, তবে মনে করো, তিনি অবশ্যই তাঁর দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী এবং আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী। তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। আর তিনি যদি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে না পারেন তবে তিনি মিথ্যাবাদী। তখন তোমাদের ইচ্ছা, যে-ধরনের আচরণ তোমরা তাঁর সঙ্গে করতে চাও, করবে। প্রশ্ন তিনটি এই : ১. ওই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত জয় করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ২. ওই কয়েকজন যুবকের কী অবস্থা হয়েছিলো যারা কাফের বাদশাহর ভয়ে পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন? ৩. রুহ বা আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

প্রতিনিধি দল মক্কায় ফিরে এলো। তারা কুরাইশদেরকে ইহুদি আলেমগণের সঙ্গে কথোপকথনের পূর্ণ বিবরণ শোনালো। কুরাইশগণ তা শুনে বললো, এখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে মীমাংসা করা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের জন্য সহজ হবে। কেননা, একজন নিরক্ষর মানুষ তখনই ইহুদিদের এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারবে যখন প্রকৃত পক্ষেই তার কাছে আল্লাহ তাআলার ওহি এসে থাকবে। তারপর মক্কার কুরাইশগণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিল। তিনি তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে আগামীকাল উত্তর দেব যেভাবে তোমরা প্রশ্ন করেছ। কোন উত্তর এলো না। ফলে সকলেই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) পনের রাত অপেক্ষা করলেন। আল্লাহ তাঁর সাথে সে ওহী সম্পর্কে কথা বলেননি। এমনকি জিবরাইলও তাঁর কাছে আসেননি। মক্কাবাসীরা বলাবলি করতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও চিন্তায় পড়ে গেলেন কেন তাঁর কাছে অহী আসা বিরত হলো। মক্কার লোকেরা তাঁকে যা বলছিল তা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। অতঃপর জিবরাইল (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আসহাবে কাহাফসহ একটি সূরা

(সূরা আল-কাহাফ) নিয়ে আসলেন। তাতে তাঁর জন্য উপদেশ ছিল এবং তাঁর কাছে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যুবক সম্পর্কে এবং এমন ব্যক্তি যিনি পরিভ্রমণ করেছিল তার সংবাদসহ।[৯]

'আল-কিতাবুল মুকাদ্দাস' -এর আলোকে যুলকারনাইন

ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ 'আল-কিতাব আল-মুকাদ্দাস'-এ একজন ধার্মিক নেতার গল্প উল্লেখ করা হয়েছে। ড্যানিয়েলের বইতে তাকে লুকারানিম বা দুটি শিংয়ের মালিক বলা হয়েছিল। মূল বক্তব্যটি হলো:

أما الكَبْشُ الَّذِي رَأَيْتَهُ ذَا القَرْنَيْنِ فَهُوَ مُلُوكُ مَادِي وَفَارِسَ. وَالتَّيْسُ العَافِي مَلِكُ اليُونَانِ، وَ**القَرْنُ** العَظِيمُ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ هُوَ المَلِكُ الأَوَّلُ. وَإِذِ انْكَسَرَ وَقَامَ أَرْبَعَةٌ عِوَضًا عَنْهُ، فَسَتَقُومُ **أَرْبَعُ مَمَالِكَ مِنَ** الأُمَّةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي قُوَّتِهِ. وَفِي آخِرِ مَمْلَكَتِهِمْ عِنْدَ تَمَامِ المَعَاصِي يَقُومُ مَلِكٌ جَافِي الوَجْهِ وَفَاهِمُ الحِيَلِ. وَتَعْظُمُ قُوَّتُهُ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِقُوَّتِهِ. يُهْلِكُ عَجَبًا وَيَنْجَحُ وَيَفْعَلُ وَيُبِيدُ العُظَمَاءَ وَشَعْبَ القِدِّيسِينَ. وَبِحَذَاقَتِهِ يَنْجَحُ أَيْضًا المَكْرُ فِي يَدِهِ، وَيَتَعَظَّمُ بِقَلْبِهِ. وَفِي الاطْمِئْنَانِ يُهْلِكُ كَثِيرِينَ، وَيَقُومُ عَلَى رَئِيسِ الرُّؤَسَاءِ، وَبِلاَ يَدٍ يَنْكَسِرُ.

অর্থ: "অতঃপর কাবস্; যাকে আপনি যুলকারনাইন দু'শিং ওয়ালা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি মাদিয়া ও পারস্যের বাদশাহ। আর তাইসুল আফী হলো ইউনানের বাদশাহ। আর যার চোখের মাঝখানে যে বড় শিং আছে তিনি হলেন প্রথম বাদশাহ। আর যখন তিনি ভেঙ্গে গেলেন, তার পরিবর্তে চারজন উঠে আসবে, তখন জাতি থেকে চারটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার ক্ষমতায় নয়। তাদের রাজ্যের শেষের দিকে, সম্পূর্ণ অবাধ্যতার সময়ে, কঠোর মুখ এবং কৌশল বোঝার একজন বাদশাহ হবেন। তার শক্তি মহান, কিন্তু তার শক্তি দ্বারা নয়। সে বিস্ময়কর ভাবে ধ্বংস করবে, মুক্তি দিবে, প্রতিষ্ঠ করবে এবং সে শক্তিশালী ও সাধুদের নিশ্চিহ্ন করবে। তার ধূর্ততার দ্বারা তার প্রতারণাও সফল হবে এবং সে তার হৃদয়ে উচ্চকিত হবে তখন নিশ্চিন্তে সে অনেককে ধ্বংস করবে। তিনি বাদশাদের বাদশাহীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন এবং তার হাত ব্যবহার হওয়া ছাড়াই সেগুলো ভেঙ্গে যাবে।"[১০]

এটাও এসেছে যে, যুলকারনাইন মাদিয়া এবং পারস্যের একজন বাদশাহ ছিলেন: **أما** الكَبْشُ الَّذِي رَأَيْتَهُ ذَا القَرْنَيْنِ فَهُوَ مُلُوكُ مَادِي وَفَارِسَ. وَالتَّيْسُ العَافِي مَلِكُ اليُونَانِ، وَالقَرْنُ العَظِيمُ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ هُوَ **المَلِكُ الأَوَّلُ**. অর্থাৎ, "অতঃপর কাবস্; যাকে আপনি যুলকারনাইন দু'শিং ওয়ালা দেখতে পাচ্ছেন।

---

[৯] *আদ-দুররুল মানসুর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৫৭। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার কুরাইশদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের কথা আগামীকাল দিবেন বলেছেন। কিন্তু তিনি তাতে **إن شاء الله** বলেননি। যার দরুন ১৫দিন অহী বন্ধ ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্য উপদেশ ছিল। দ্র. *আদ-দুররুল মানসুর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৫৮।

[১০] সহীফায়ে দানিয়াল-৮:২০; উদ্ধৃতি: https://st-takla.org./Bibles/BibleSearch.

তিনি মাদিয়া ও পারস্যের বাদশাহ। আর তাইসুল আফী হলো ইউনানের বাদশাহ। আর যার চোখের মাঝখানে যে বড় শিং আছে তিনি হলেন প্রথম বাদশাহ।"[১১]

আসমানি গ্রন্থ 'তাওরাত'-এর আলোকে যুলকারনাইন

তাওরাতের কতিপয় ব্যাখ্যাকারীর মতে, জুলকারনাইন হলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। তবে আলেকজান্ডারের প্রথম বিশ্ব ভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাওরাতের যে আলোচনা তার পূর্বা পরের মাঝে অসংগতি লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে,

إن الإسكندر بن فيلبس المقدوني بعد خروجه من أرض كتيم وإيقاعه بدارا ملك فارس ومادای ملك مكانه وهو أول من ملك على اليونان. ثم أثار حروبًا كثيرة **وفتح حصونًا متعددة وقتل ملوك** الأرض. واجتاز إلى اقاصي الأرض وسلب غنائم جمهور من الأمم فسكتت الأرض بين يديه فترفع في قلبه وتشامخ. وحشد جيشًا قويًا جدًا. واستولى على البلاد والأمم والسلاطين فكانوا يحملون إليه الجزية. وبعد ذلك انطرح على فراشه وأحس من نفسه بالموت. فدعا عبيده الكبراء الذين نشأوا معه منذ الصباء فقسم مملكته بينهم في حياته. وكان ملك الاسكندر اثنتي عشرة سنة ومات.

অর্থাৎ, "ফিলিপস আল মাকদুনীর সন্তান আলেকজান্ডারের বিশ্ব ভ্রমণের যে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল, আলেকজান্ডার যখন তার দেশ থেকে বের হয়ে কাতিম নামক অঞ্চল অতিক্রম করে পারস্য ও মাদী নামক রাষ্ট্রের উপর অভযান পরিচালনা করে প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, তখন তার সাহস ও মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে একের পর এক রাষ্ট্র দখলের অভিযান পরিচালনা করে সেগুলোকে পদানত করতে থাকেন। অনেক রাজাকে হত্যা করেন, অনেক অঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেক ধনসম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আপন করায়াত্তে দখল করে নেন। এতে তার বীর-বিক্রম, শৌর্য-বীর্যে ভীত হয়ে পৃথিবীর অনেক জাতি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং নিজেদের সহায় সম্পত্তি তার কাছে সমর্পণ করেন। এমনিভাবে তার বিজয় অভিযান পৃথিবীব্যাপী অব্যাহত থাকে। এমনকি নিজের মৃত্যুর যখন তিনি আশঙ্কা করলেন, তখন তার সেবায়ত অনুগতদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোককে কাছে ডেকে নেন, যারা ছিল তার শৈশবের অনুসঙ্গী এবং দখলকৃত রাজ্যগুলোকে তাদের মাঝে বন্টন করে দেন। অতঃপর তাঁর বারো বছর ধরে চলতে থাকা রাজ্যদখল অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে।"[১২]

বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "সিরাত ইবনে হিশাম" যুলকারনাইন সম্পর্কে এ বিষয়টি আলোকপাত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

[أَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ النَّضْرَ وَابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى أَحْبَارِ يَهُودَ يَسْأَلَانِهِمْ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

[১১] সহীফায়ে দানিয়াল-৮:২০; উদ্ধৃতি: https://st-takla.org./Bibles/BibleSearch.

[১২] https://ar.wikipedia.org/wiki/ذو القرنين/24/03/2023

فَلَمّا قَلَ لَهُمْ ذٰلِكَ النّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بَعَثُوهُ وَبَعَثُوا مَعَهُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى أَحْبَارِ يَهُودَ بِالْمَدِينَةِ وَقَالُوا لَهُمَا : سَلَاهُمْ عَنْ مُحَمّدٍ وَصِفَا لَهُمْ صِفَتَهُ وَأَخْبِرَاهُمْ بِقَوْلِهِ فَإِنّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوّلِ وَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ عِلْمِ [ص ٥٥١] الْأَنْبِيَاءِ فَخَرَجَا حَتّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَا أَحْبَارَ يَهُودَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَوَصَفَا لَهُمْ أَمْرَهُ وَأَخْبَرَاهُمْ بِبَعْضِ قَوْلِهِ وَقَالَا لَهُمْ إِنّكُمْ أَهْلُ التّوْرَاةِ ، وَقَدْ جِئْنَاكُمْ لِتُخْبِرُونَا عَنْ صَاحِبِنَا هَذَا . فَقَالَتْ لَهُمَا أَحْبَارُ يَهُودَ سَلُوهُ عَنْ ثَلَاثٍ نَأْمُرُكُمْ بِهِنّ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنّ فَهُوَ نَبِيّ مُرْسَلٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرّجُلُ مُتَقَوّلٌ فَرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمْ . سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدّهْرِ الْأَوّلِ مَا كَانَ أَمْرُهُمْ فَإِنّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجَبٌ وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوّافٍ قَدْ بَلَغَ **مَشَارِقَ** الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَؤُهُ وَسَلُوهُ عَنْ الرّوحِ مَا هِيَ ؟ فَإِذَا أَخْبَرَكُمْ بِذَلِكَ فَاتّبِعُوهُ فَإِنّهُ نَبِيّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوّلٌ فَاصْنَعُوا فِي أَمْرِهِ مَا بَدَا لَكُمْ . فَأَقْبَلَ النّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ وَ**عُقْبَةُ بْنُ أَبِي** مُعَيْطِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيّ حَتّى قَدِمَا مَكّةَ عَلَى **قُرَيْشٍ** ، فَقَالَا : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، قَدْ جِئْنَاكُمْ بِفَصْلِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمّدٍ قَدْ أَخْبَرَنَا أَحْبَارُ يَهُودَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ أَمَرُونَا بِهَا ، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ عَنْهَا فَهُوَ نَبِيّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرّجُلُ مُتَقَوّلٌ فَرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمْ.

অর্থাৎ, "কুরাইশ কর্তৃক ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নযর ও ইবনে আবু মুআয়তকে প্রেরণ:

নাযর ইবনে হারিসের বক্তৃতার পর কুরাইশ নেতারা তাকে ও তার সাথে উকবা ইবনে আবু মুআয়তকে মদীনার ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে পাঠাল। তারা তাদের দু'জনকে বলল, তারা যেন মুহাম্মদ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করে, তাঁর গুণাবলী তাদের কাছে বর্ণনা করে এবং তাঁর বক্তব্য তাদেরকে অবহিত করে। কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারী। তাদের কাছে নবীদের সম্পর্কে এমন জ্ঞান রয়েছে যা আমাদের কাছে নেই।

তারা উভয়ে মদীনায় গিয়ে ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা তাদেরকে তাঁর গুণাবলী জানাল এবং তারা তাঁর কিছু কিছু কথাও তাদের শোনাল। আর তারা ইহুদি পণ্ডিতদের বলল, আপনারা তো তাওরাতের অধিকারী। আমরা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত এ লোকটি সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে জানার জন্য এসেছি। তখন ইহুদি পণ্ডিতরা তাদের বলল, আমরা তোমাদের যে তিনটি বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। যদি সে এগুলো তোমাদের জানাতে পারে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই একজন প্রেরিত নবী। আর যদি সে জানাতে না পারে, তবে তোমরা মনে করবে যে, সে একজন ভণ্ড, জালিয়াত। এরপর তার সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে এমন কতিপয় যুবক সম্পর্কে, যারা প্রাচীনকালে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, তাদের ব্যাপারটা কি? তাদের ঘটনা ছিল খুবই বিস্ময়কর। আর তোমরা তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছিল, তার ব্যাপারটা কি? আর তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, রূহ কি জিনিস? যদি সে এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে, তবে সে নিঃসন্দেহে নবী; তোমরা তার অনুসরণ করবে। আর যদি সে তোমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব

না দিতে পারে, তবে তোমরা বুঝবে, সে ভণ্ড, প্রতারক। তখন তোমরা তার ব্যাপারে যা ভাল মনে হয়, তা করবে।

এরপর নাযর ইবনে হারিস ও উকবা ইবনে আবু মুআয়ত ইবনে আবু আমর ইবনে উমায়্যা ইবনে আবদ শামস ইবনে আবদ মানাফ ইবনে কুসাই উভয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল। তারা মক্কায় পৌঁছে কুরাইশ নেতাদের কাছে গিয়ে বলল, হে কুরাইশগণ! আমরা তোমাদের কাছে আমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যকার বিরোধের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা নিয়ে এসেছি। ইহুদি পণ্ডিতরা আমাদের শেখানো কয়েকটা প্রশ্ন মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। সে যদি তোমাদের এর জবাব দিতে পারে, তা হলে সে নবী, নতুবা সে ভণ্ড। কাজেই তোমরা তাঁর সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিবে, তা ভেবে দেখ।"[১৩]

سُؤَالُ قُرَيْشٍ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَسْئِلَةٍ وَإِجَابَتُهُ لَهُمْ]

جَاءُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - **فَقَالُوا** : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنَا عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الأَوَّلِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ قِصَّةٌ عَجَبٌ وَعَنْ رَجُلٍ كَانَ طَوَّافًا قَدْ بَلَغَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ؛ وَأَخْبِرْنَا **عَنْ** الرُّوحِ مَا هِيَ ؟ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ غَدًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَانْصَرَفُوا عَنْهُ . فَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَذْكُرُونَ - خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لا يُحْدِثُ اللهُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَحْيًا ، وَلا يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَرْجَفَ أَهْلُ مَكَّةَ ، وَقَالُوا : وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا ، وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً قَدْ أَصْبَحْنَا مِنْهَا لا يُخْبِرُنَا بِشَيْءٍ مِمَّا سَأَلْنَاهُ عَنْهُ وَحَتَّى أَحْزَنَ **رَسُولَ** اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - **مُكْثُ الْوَحْيِ** [ص ٣٠٢] وَشَقَّ عَلَيْهِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ : ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ مِنْ اللهِ - **عَزَّ وَجَلَّ** - بِسُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ، فِيهَا مُعَاتَبَتُهُ إِيَّاهُ عَلَى حُزْنِهِ **عَلَيْهِمْ وَخَبَرُ مَا سَأَلُوهُ** عَنْهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ الْفِتْيَةَ وَالرَّجُلِ الطَّوَّافِ وَالرُّوحِ.

অর্থাৎ, কুরাইশ নেতাদের প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জবাব: "এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এল এবং বলল: হে মুহাম্মদ ! প্রাচীনকালে যে একদল যুবক উধাও হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত কর। তাদের ঘটনাটা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। আর অপর একজন পর্যটকের কাহিনী শোনাও। যিনি সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। আর আত্মা কি? তা আমাদের জানাও? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বললেন, তোমরা আমাকে যা যা জিজ্ঞেস করেছ, তা আমি তোমাদের আগামীকাল জানাব। তবে তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বা আল্লাহ যদি চান এ কথাটি বলেন নি। এ কথা শুনে কুরাইশরা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। বর্ণনাকারীদের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, এরপর পনের দিন কেটে গেল, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর কাছে কোন ওহী আসল না এবং জিবরাইল (আ.)ও তাঁর কাছে আসলেন না। এমনকি মক্কাবাসীরা দুর্নাম ছড়াতে লাগল। তারা বলল, মুহাম্মদ আমাদের কাছে আগামীকালের ওয়াদা করেছিল। অথচ সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পনের দিন হয়ে গেল। আমরা তাঁর কাছে যে সব প্রশ্ন করেছিলাম, সে তার একটিরও জবাব দিল না। অপরদিকে ওহী বন্ধ থাকায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মক্কাবাসীদের কথাবার্তাও তাঁর কাছে

[১৩] আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম, *সীরাত ইবনে হিশাম* (মিসর: সিরকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবাআতু মুস্তফা আল বাবী আল হালবী ওয়া আওলাদিহী, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.৩০০।

বিব্রতকর হয়ে উঠল। অবশেষে তাঁর কাছে জিবরাইল (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে সূরা কাহাফ নিয়ে এলেন। তাতে তাঁকে মক্কাবাসীদের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণে ভর্ৎসনা ছিল। এ সূরায় তারা যে যুবকদের কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল তাদের খবর, বিশ্ব পরিভ্রমণকারী ব্যক্তি ও আত্মা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব ছিল।"[১৪]

مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي قُرَيْشٍ حِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَابَ عَنْهُ الْوَحْيُ مُدَّةً]

َ ابْنُ إسْحَاقَ : فَذُكِرَ لِي أَنّ رَسُولَ اللهِ - **صَلّى** ُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ لِجِبْرِيلَ حِين جَاءَهُ لَقَدْ احْتَبَسْتَ عَنّي يَا جِبْرِيلُ حَتّى سُؤْتُ ظَنّا فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ { وَمَا نَتَنَزّلُ إلّا بِأَمْرِ رَبّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيّا } فَافْتَتَحَ السّورَةَ - **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** - بِحَمْدِهِ وَذِكْرِ نُبُوّةِ رَسُولِهِ لِمَا أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ { الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ } يَعْنِي مُحَمّدًا - ـلّى اللهُ عَلَيْهِ **وَسَلّمَ** - إنّك رَسُولٌ مِنّي : أَيْ تَحْقِيقٌ " لِمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ نُبُوّتِك . { وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيّمًا } أَيْ مُعْتَدِلًا ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ . { لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ } أَيْ عَاجِلَ عُقُوبَتِهِ فِي الدّنْيَا . وَعَذَابًا أَلِيمًا فِي الْآخِرَةِ أَيْ مِنْ عِنْدِ رَبّك الّذِي بَعَثَ رَسُولًا . { وَيُبَشّرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أَنّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا } أَيْ دَارُ الْخُلْدِ . لَا يَمُوتُونَ فِيهَا الّذِينَ صَدّقُوك بِمَا جِئْت بِهِ مِمّا كَذّبَك بِهِ ُمْ وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرْتهمْ بِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ . { وَيُنْذِرَ الّذِينَ قَالُوا اتّخَذَ اللهُ وَلَدًا } يَعْنِي قُرَيْشًا فِي ْمْ إنّا نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَهِيَ بَنَاتُ اللهِ . { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ } الّذِينَ أَعْظَمُوا فِرَاقَهُمْ ْبَ دِينِهِمْ . { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } أَيْ لِقَوْلِهِمْ إنّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ . { إنْ يَقُولُونَ إلّا **كَذِبًا فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْ**سَكَ } يَا مُحَمّدُ عَلَى آثَارِهِمْ إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا : أَيْ لِحُزْنِهِ عَلَيْهِمْ حِين فَاتَهُ مَا كَانَ يَرْجُو مِنْهُمْ أَيْ لَا تَفْعَلْ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : بَاخِعٌ نَفْسَك ، أَيْ مُهْلِكٌ نَفْسَك ، فِيمَا **حَدّثَنِي أَ**بُو عُبَيْدَةَ .

قَالَ ذُو الرّمّةِ

أَلَا أَيّهَذَا الْبَاخِعُ الْوَجْدُ نَفْسَهُ ... لِشَيْءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ الْمَقَادِرُ

وَجَمْعُهُ بَاخِعُونَ وَبَخَعَةٌ . وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ . وَتَقُولُ الْعَرَبُ : قَدْ بَخَعْتُ [ص ٣٥٥] **نُصْحِي** وَنَفْسِي ، أَيْ جَهَدْت لَهُ . { إنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } **قَالَ ابْنُ** إسْحَاقَ : أَيْ أَيّهُمْ أَتْبَعُ لِأَمْرِي ، وَأَعْمَلُ بِطَاعَتِي . { وَإِنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا } أَيْ الْأَرْضِ وَإِنّ مَا عَلَيْهَا لَفَانٍ وَزَائِلٌ وَإِنّ الْمَرْجِعَ إلَيّ فَأَجْزِي كُلّا بِعَمَلِهِ فَلَا تَأْسَ وَلَا يَحْزُنْك **مَا تَسْمَع** وَتَرَى فِيهَا . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : الصّعِيدُ : الْأَرْضُ وَجَمْعُهُ صُعُدٌ . قَالَ ذُو الرّمّةِ يَصِفُ ظَبْيًا صَغِيرًا :

كَأَنّهُ بِالضّحَى تَرْمِي الصّعِيدَ بِهِ دَبّابَةٌ فِي عِظَامِ الرّأْسِ خُرْطُومُ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ . وَالصّعِيدُ (أَيْضًا) : الطّرِيقُ . وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إيّاكُمْ وَالْقُعُودَ **عَلَى الصّعُدَ**اتِ يُرِيدُ الطّرُقَ . وَالْجُرُزُ الْأَرْضُ الّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا ، وَجَمْعُهَا : أَجْرَازٌ . وَيُقَالُ سَنَةٌ جُرُزٌ

---

১৪ *সীরাত ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩০১।

وَسُنُونَ أَجْرَازٌ وَهِيَ الَّتِي لَا يَكُون فِيهَا مَطَرٌ وَتَكُونُ فِيهَا جُدُوبَةٌ وَيُبْسٌ وَشِدّةٌ . قَالَ ذُو الرّمّةِ يَصِفُ إِبِلًا : طَوَى النّحْرُ وَالأَجْرَازُ مَا فِي بُطُونِهَا فَمَا بَقِيَتْ إِلا الضّلُوعُ الجَرَاشِعُ وَهَذَا البَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

অর্থাৎ, কুরাইশ নেতাদের প্রশ্নের জবাব: ইবনে ইসহাক বলেন: আমাকে বলা হয়েছে যে, জিবরাইল (আ.) এলে রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন: “হে জিবরাইল (আ.)! আপনি আমার কাছে আসতে এত বিলম্ব করেছেন যে, এতে আমার প্রতি লোকদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।” তখন তাঁকে জিবরাইল (আ.) বললেন: “আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে ও পেছনে আছে এবং যা এ দুয়ের মাঝে, তা তাঁরই; আর আপনার রব ভুলে যান না।” [১৯:৬৪]

এরপর মহান আল্লাহ সূরা কাহফ শুরু করেছেন নিজের প্রশংসা ও তাঁর রাসূলের নবুওয়তের বর্ণনার মাধ্যমে। কেননা তারা নবুওয়ত অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ বলেন: “প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) এর উপর এ মর্মে কিতাব নাযিল করেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। অর্থাৎ নবুওয়ত সম্পর্কে তারা যে প্রশ্ন করে, এ কিতাব তারই বাস্তব জবাব।

আর তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি' অর্থাৎ খুবই ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছেন এবং যাতে কোন মতভেদও নেই। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। এখানে কঠিন শাস্তি বলতে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতের জীবনে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আল্লাহ দিবেন তার উভয়টাকেই বুঝানো হয়েছে। ‘আর তাঁর পক্ষ থেকে’ অর্থ হচ্ছে তোমার রবের পক্ষ থেকে, যিনি তোমাকে একজন রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর মু’মিনগণ, যারা সৎকাজ করে, তাদের এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার, যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা থাকবে, যেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। যারা তোমার আনীত দীনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তুমি যা যা করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছ তা করেছে, তারা সেখানে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আর সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরাইশ বংশের সেই সব লোককে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে যে, আমরা ফেরেশতাদের উপাসনা করি, তারা আল্লাহর মেয়ে।’ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। অর্থাৎ সেইসব পূর্বপুরুষদের, যাদের বর্জন করা ও যাদের ধর্মের নিন্দা করাকে তারা গুরুতর অন্যায় বলে মনে করে। “তাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কি সাংঘাতিক।” অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে। তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তাদের কাছ থেকে যা আশা করছ, তা যখন সফল হবে না, তখন তাদের চিন্তায় কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?” অর্থাৎ তুমি এরূপ করো না।[১৫]

ইবনে হিশাম বলেন: ‘বাখিউন নাফসাকা’ অর্থ নিজেকে ধ্বংসকারী। আবু উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, কবি যুররুম্মা তার নিম্নোক্ত কবিতায়ও ‘বাখিওন’ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেছেন:

[১৫] *সীরাত ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩০২।

"ওহে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে এমন জিনিসের মহব্বতে ধ্বংস করেছে, যা অদৃষ্ট তার হাত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।"

এর বহুবচন বাখিউন ও বাখ'আ। এটি তার কাব্যের একটি কবিতা।

আরবরাও বলে থাকে: 'বাখা'তু লাহু নাফসী" অর্থাৎ আমি তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি।

"পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলিকে তার শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।"

ইবনে ইসহাক বলেন: অর্থাৎ কে আমার আদেশের অধিক অনুসারী এবং কে আমার বেশি অনুগত, তা পরীক্ষা করার জন্য।

"আর তার ওপর যা কিছু আছে, তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করব।" অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, তার সবকিছুই ধ্বংস হবে ও বিলীন হবে, আর আমার দিকেই সব কিছুর প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে প্রতিফল দেব। কাজেই আপনি এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে ও শুনতে পান, তাতে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না।

ইবনে হিশাম বলেন, 'সাঈদ' (صعيد) অর্থ পৃথিবী বা মাটি। এর বহুবচন সুউদ।

যররুম্মা একটি হরিণ শাবকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "মাথায় হাড়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল মদ, তাকে যেন দুপুর বেলা যমীনের ওপর নিক্ষেপ করে।"

এ কবিতাটি কবির একটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।[১৬]

وَقَالَ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الطَّوَّافِ [ص ٣٠٧] { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا } حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ قِصَّةِ خَبَرِهِ . وَكَانَ مِنْ خَبَرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَنَّهُ أُوتِيَ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ غَيْرُهُ فَمُدَّتْ لَهُ الْأَسْبَابُ حَتَّى انْتَهَى مِنْ الْبِلَادِ إِلَى مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ، لَا يَطَأُ أَرْضًا إِلَّا سُلِّطَ عَلَى أَهْلِهَا ، حَتَّى انْتَهَى مِنْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَى مَا لَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ مِنْ الْخَلْقِ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَحَدَّثَنِي مِنْ يَسُوقُ الْأَحَادِيثَ عَنْ الْأَعَاجِمِ فِيمَا تَوَارَثُوا مِنْ عِلْمِهِ أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ . اسْمُهُ مَرْزُبَانُ بْنُ مَرْدُبَةَ الْيُونَانِيِّ ، مِنْ وَلَدِ يُونَانَ بْنِ يَافِثَ بْنِ نُوحٍ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَاسْمُهُ الْإِسْكَنْدَرُ وَهُوَ الَّذِي بَنَى الإسكندرية فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَقَدْ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ لَاعِيِّ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَدْرَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَقَالَ مَلِكٌ مَسَحَ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهَا بِالْأَسْبَابِ **وَقَالَ خَالِدٌ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ** - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَجُلًا يَقُولُ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ غَفْرًا ، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ تَسَمَّوْا بِالْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّيْتُمْ **بِالْمَلَائِكَةِ** . [ص

[১৬] *সীরাত ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩০৩।

৩০৮]قَالَ ابْنُ إسْحَا لَهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ أَقَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَمْ لَا ؟ (
فَإِنْ كَانَ قَالَهُ) ، فَالْحَقّ مَا قَالَ .

অর্থাৎ, যুলকারনাইনঃ তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে একজন বিশ্ব-পর্যটক সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, “আর তোমাকে জিজ্ঞেস করে যুলকারনাইন সম্পর্কে। তুমি বল যে, আমি অচিরেই তাঁর বিষয়ে তোমাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম। এভাবে তিনি তাঁর পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিলেন।” [সূরা কাহফ, ১৮:৮৩]

যুলকারনাইনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাকে এমন সব জিনিস দেয়া হয়েছিল, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। তাকে এত অধিক উপায়-উপকরণ দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পরিভ্রমণ করেন। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই তার সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জনবসতির সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেনঃ অনারবদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, যুলকারনাইন ছিলেন মিসরের অধিবাসী। তার আসল নাম ছিল মারযুবান ইবনে মারযুবা ইউনানী। তিনি ইয়াফিস ইবনে নুহের বংশধর ছিলেন। ইবনে হিশাম বলেন, তাঁর নাম ইসকান্দার। ইসকান্দারিয়া শহরটি তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত বলে তার নামে এ শহরের নামকরণ হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেনঃ সাওর ইবনে ইয়াযিদ আমাকে খালিদ ইবনে মাদান কালাঈ সূত্রে জানিয়েছেন [আর কালাঈ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যামানা পেয়েছিলেন] তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেনঃ তিনি এমন বাদশাহ ছিলেন, যিনি উপায়-উপকরণের সাহায্যে গোটা পৃথিবীর সার্বিক জরীপ করেছিলেন।

খালিদ বলেনঃ উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কাউকে “হে যুলকারনাইন” বলে ডাকছে এটা শুনে উমর (রা.) বললেন, “আল্লাহ মাফ করুন! তোমরা নবীদের নামে নাম রেখে তৃপ্ত হওনি। এখন ফেরেশতাদের নামে নাম রাখা শুরু করেছ।” ইবনে ইসহাক বলেনঃ যুলকারনাইন আসলে কি ছিলেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। উমর (আ.) যা বলেছেন, তা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন কী না? যদি তিনি এরূপ বলে থাকেন, তবে তাঁর কথাই সঠিক।[১৭]

বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ “সিরাত ইবনে হিশাম” এ যুলকারনাইন সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَالَهُمْ لَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ]

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَقَالَ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ ، وَكَعْبُ بْنُ أَسَدٍ ، وَأَبُو رَافِعٍ وَأَشْيَعُ وَشَمْوِيلُ بْنُ زَيْدٍ ، لِعَبْدِ بْنِ سَلَامٍ حَيْنَ أَسْلَمَ : مَا تَكُونُ النّبُوّةُ فِي الْعَرَبِ وَلَكِنّ صَاحِبَك مَلِكٌ . ثُمّ جَاءُوا رَسُولَ اللهِ صَلّى

[১৭] *সীরাত ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩০৬।

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَقَصّ عَلَيْهِمْ مَا جَاءَ نْ اللهِ تَعَالَى فِيهِ مِمّا كَانَ قَصّ عَلَى بْشٍ ، وَهُمْ كَانُوا مِمّنْ أَمَرَ قُرَيْشًا أَنْ يَسْأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ حَيْنَ بَعَثُوا إلَيْهِمْ النّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وعُتْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট তাদের যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা: "ইবনে ইসহাক বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নামক ইহুদি পণ্ডিত যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হুয়াই ইবনে আখতাব, কাব ইবনে আসাদ, আবু রাফি, উশায় এবং শামবীল ইবনে যায়দ তাঁকে বলল: আরবদের মধ্যে তো নবী আসবে না, বরং তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) তো একজন বাদশাহ। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে তাঁকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (সা.) এর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে যে বিবরণ এসেছিল এবং যা তিনি ইতিপূর্বে কুরায়শদের কাছে পেশ করেছিলেন, সে বিবরণ তাদের শুনিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যখন কুরাইশ নেতারা নাযর ইবনে হারিস ও উকবা ইবনে আবু মুয়াইতকে মদীনার ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন উপরোক্ত ইহুদি নেতারাই ঐ দু'ব্যক্তির মাধ্যমে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, আপনারা মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।"[১৮]

[১৮] *সীরাত ইবনে হিশাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬৮।

ঐতিহাসিকদের যুলকারনাইনের পরিচয় নিয়ে মতবিরোধ

যুলকারনাইনের পরিচয় প্রদানে ঐতিহাসিকরা মতপার্থক্য করেছেন। কিছু ঐতিহাসিক সাধারণত আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, সাইরাস দ্য গ্রেট, আল-সাব বিন মারাছিদ হুমায়রির বাদশাহকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সাথে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্বের তুলনা করেন। এমনকি মিসরের আখেনাতুনকেও তাঁর সাথে তুলনা করা হয়। কিছু পশ্চিমা ও ঐতিহাসিক মুসলিম পণ্ডিতগণ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে যুলকারনাইন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদের্শনাবলী ও সমকালিন যুক্তির আলোকে সাইরাস দ্য গ্রেট বা খোরাসকে যুলকারনাইন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ মতটি আল্লামা আবুল আলা মওদুদি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইতিহাসে এক বহুল আলোচিত নাম। সেই সুদূর গ্রিস থেকে একের পর এক দেশ জয় করে তাঁর বাহিনী চলে এসেছিল ভারত অবধি। পারস্যের কাছে তিনি পরিচিত ইস্কান্দার বাদশাহ হিসাবে আর ভারতবর্ষে ইস্কান্দারের অপভ্রংশ সেকান্দার বাদশাহ হিসাবেও বহুল পরিচিত তিনি। দুই সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেলেও আলেকজান্ডারকে নিয়ে বিশ্ববাসীর জানার আগ্রহ একটুও কমেনি। ৩২ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি জয় করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাম্রাজ্য। শুধু তাই নয় হাতেগোনা কয়েকজন অপরাজিত জেনারেলের মধ্যেও তিনি অন্যতম। ইতিহাস সৃষ্টিকারী এ বীরযোদ্ধার পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের জন্ম হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসের মেসিডোনিয়াতে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে (২০ অথবা ২১ জুলাই ৩৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ - ১০ অথবা ১১ জুন ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। বর্তমানে মেসিডোনিয়া একটি সম্পুর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাঁর পিতা ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ আর তাঁর মা ছিলেন উচ্চাভিলাষী রানী অলিম্পিয়া। আলেকজান্ডারের জীবনে তাঁর মায়ের ভূমিকা ছিল অসামান্য। ছেলেবেলা থেকেই তিনি শিশু আলেকজান্ডারকে বুঝিয়েছিলেন পারস্য জয় করার জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে। বলা বাহুল্য অলিম্পিয়া ছিলেন ফিলিপের সাত স্ত্রীর মধ্যে চতুর্থ। অন্যদিকে অসম্ভব বিচক্ষণ এবং বীরযোদ্ধা রাজা ফিলিপ বালক আলেকজান্ডারের শিক্ষার কোন ত্রুটি করেননি। জগৎবিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টোটলকে নিযুক্ত করেছিলেন আলেকজান্ডারের শিক্ষক হিসাবে। আলেকজান্ডার আর দশজন অভিজাত গ্রীক কিশোরের মতই শিখছিলেন দর্শন, শরীরচর্চা ও যুদ্ধবিদ্যা। প্রায় তিন বছর সান্নিধ্যে থাকার পর ১৬ বছর বয়সে এরিস্টোটলের কাছে তাঁর পাঠগ্রহণ সম্পুর্ণ হয়। ৩৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি তার পিতা দ্বিতীয় ফিলিপের স্থলাভিষিক্ত হন এবং তার শাসনকালের অধিকাংশ সময় পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকাজুড়ে দীর্ঘ সামরিক অভিযান পরিচালনায় অতিবাহিত করেন। ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি মিশর থেকে উত্তর পশ্চিম ভারত পর্যন্ত প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার লড়া সবগুলো লড়াইয়ে তিনি অপরাজিত ছিলেন এবং তাকে ইতিহাসের অন্যতম সেরা ও সফল সেনানায়ক বিবেচনা

করা হয়। মূলত আলেকজান্ডারের ঘটনা বহুল জীবনের বাঁক শুরু হল এখান থেকেই। মেসিডোনিয়ার মসনদে বসার পর আলেকজান্ডার আর মাত্র ১৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি জয় করে নেন পারস্য, মিশর, ব্যবিলন ও ভারতের পাঞ্জাব।

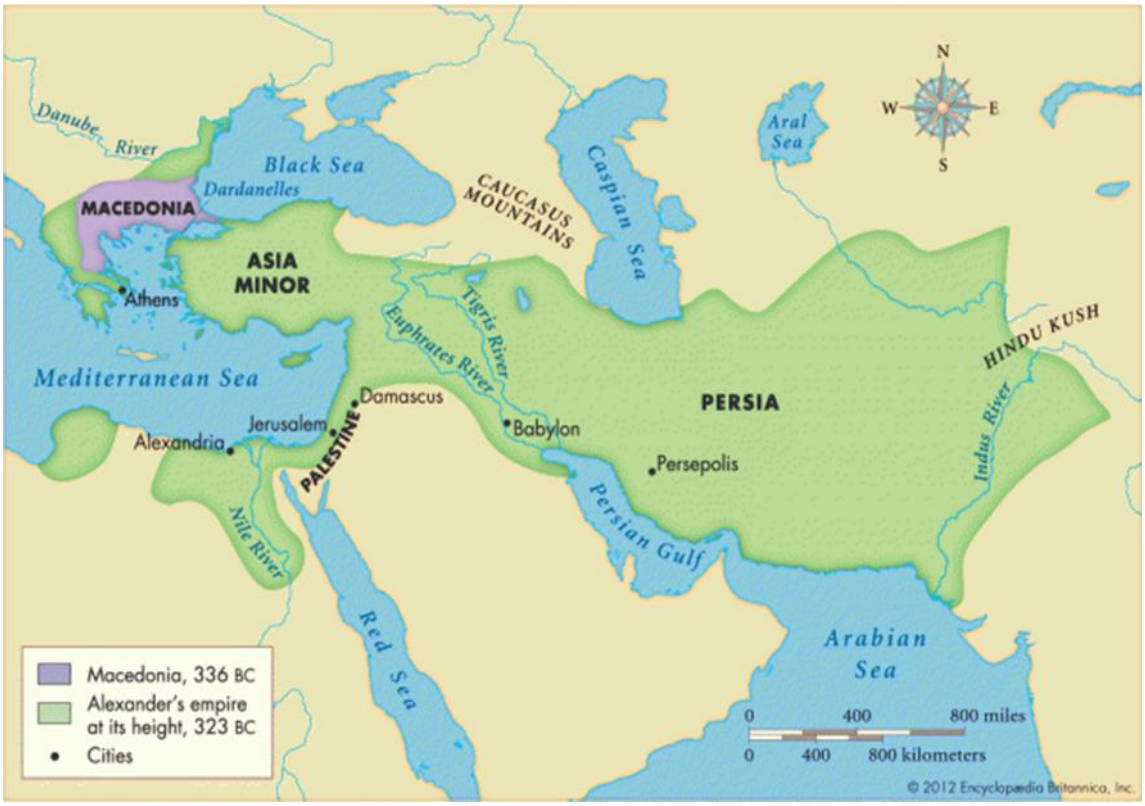

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের মানচিত্র। সূত্র: kids.britannica.com

আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সালের জুন মাসের ১১ অথবা ১২ তারিখে ৩২ বছর বয়সে ব্যাবিলনে দ্বিতীয় নেবুচাদনেজারের প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯]

আধুনিক গ্রীক লোককাহিনীতে আলেকজান্ডার সম্পর্কে বলা হয় যে, Alexander features prominently in modern Greek folklore, more so than any other ancient figure. The colloquial form of his name in modern Greek ("O Megalexandros") is a household name, and he is the only ancient hero to appear in the Karagiozis shadow play. One well-known fable among Greek seamen involves a solitary mermaid who would grasp a ship's prow during a storm and ask the captain "Is King Alexander alive?" The correct answer is "He is alive and well and rules the world!" causing the mermaid to

[১৯] Depuydt, L, "The Time of Death of Alexander the Great: 11 June 323 BC, ca. 4:00–5:00 pm", Die Welt des Orients, 28: 117–35

vanish and the sea to calm. Any other answer would cause the mermaid to turn into a raging Gorgon who would drag the ship to the bottom of the sea, all hands aboard.[20]

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুগের বেশিরভাগ মুদ্রায় তার মাথায় দুটি শিং সহ তার চিত্র দেখা যায়। কিছু মুসলিম ইতিহাসবিদ বিশ্বাস করেন যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের গল্প এবং যুলকারনাইনের গল্পের মধ্যে মিল রয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ইসলামিক বিশেষজ্ঞগণ এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই কারণে যে যুলকারনাইনের ন্যায় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তাওহীদ বা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন না বা তিনি একজন মু'মিন বা বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐতিহাসিকদের কর্তৃক সবচেয়ে বড় অনুমান হল যে আলেকজান্ডারের মাথায় দুটি শিং ছিল যা বেশির ভাগ মুদ্রায় স্থান লাভ করেছিল। এবং তিনি পূর্ব ও পশ্চিম জয় করেছিলেন। ইরানী ঐতিহাসিক আবু আল-ফাদল আল-বালামী বলেছেন,[২১] "আলেকজান্ডারের নামকরণ যুলকারনাইন করা হয়। কারণ তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছেছেন এবং বিশ্বের কোণগুলিকে শতাব্দী বলা হয় এবং একটি কোণ সূর্যোদয়ের স্থান এবং অন্য কোণটি সূর্যাস্তের স্থান বলা হয়। এছাড়া প্রতিটি কোণকে পৃথকভাবে একক قرن বা শিং বলা হয়। তাদের একসাথে দুটি কোণা বা শিং থাকলে قرنين বলা হয়। এর দরুন আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে তাঁর নামকরণ করেছেন যুলকারনাইন বা দু'শিং ওয়ালা।

যদিও অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এটি অস্বীকার করেন। তারা বেশ কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। যার মধ্যে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন না এবং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সময়টি যুলকারনাইনের সময় থেকে আলাদা। তাই ইবনে কাসির আদ দামেশকি উল্লেখ করেছেন যে, উভয়ের সময়কালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হাজার বছর। তৃতীয় পার্থক্য হিসাবে, আলেকজান্ডার ছিলেন গ্রীক অধিবাসী। আর যুলকারনাইন ছিলেন আরব অধিবাসী। অনেক মুসলিম পণ্ডিতও বিশ্বাস করেন যে, যুলকারনাইন ইবরাহিমের সময়কার ছিলেন। আল-আজরাকি এবং ইবনে কাসির আদ-দামেশকি উল্লেখ করেছেন যে, যুলকারনাইন ইবরাহিম (আ.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসমাইলের সাথে তাঁর সাথে কাবা প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

الإِسْكَنْدَر اليُونَانِيّ كَانَ قَرِيبًا مِنْ زَمَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام، وَبَيْن زَمَن إِبْرَاهِيم وَعِيسَى أَكْثَر مِنْ أَلْفَيْ سَنَة، وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ الإِسْكَنْدَر المُتَأَخِّر لُقِّبَ بِذِي القَرْنَيْن تَشْبِيهًا بِالمُتَقَدِّم لِسَعَةِ مُلكه وَغَلَبَته عَلَى البِلَاد الكَثِيرَة، أَوْ لِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَى الفُرْس وَقَتَلَ مَلِكهمْ اِنْتَظَمَ لَهُ مُلك المَمْلَكَتَيْن الوَاسِعَتَيْن الرُّوم وَ فَلَقِّبَ ذَا القَرْنَيْنِ لِذَلِكَ. والحَقّ أَنَّ الَّذِي قَصَّ الله نَبَأَهُ فِي القُرْآن هُوَ المُتَقَدِّم. وَالفَرْق بَيْنهمَا مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدهَا: مَا ذَكَرْته. الثَّانِي: أَنّ الإِسْكَنْدَر كَانَ كَافِرًا، وَكَانَ مُعَلِّمُهُ أَرَسْطَاطَالِيس، وَكَانَ

[২০] Fermor, Patrick Leigh (2006). *Mani: Travels in the Southern Peloponnese*. New York Book Review. p. 215.

[২১] আবু আলী আল বাল'আমি, *তারিখুল বাল'আমি*, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৮৮-৪৮৯।

يَأْتَمِر بِأَمْرِهِ، وَهُوَ مِنْ الْكُفَّار بِلَا شَكّ، الثَّالِث : كَانَ ذُو الْقَرْنَيْن مِنْ الْعَرَب، وَأَمَّا الإِسْكَنْدَر فَهُوَ مِنْ الْيُونَان.

অর্থাৎ, "ইসকান্দার আল-ইউনানি ঈসা (আ.) সময়কার কাছাকাছি ছিলেন। ইবরাহিম (আ.) ও ঈসা (আ.) এর যুগের ব্যবধান প্রায় হাজার বছর। প্রকাশ থাকে যে, সর্বশেষ ইসকানদার যুলকারনাইন লকব বা উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছেন যা প্রথম ইসকান্দারের সাথে সাদৃশ্য করা হয়। এ জন্য যে, তিনি তার রাজত্ব প্রশস্ত করেছেন এবং একাধিক দেশের উপর বিজয় লাভ করেছেন। অথবা যখন পারস্য বিজয় করেন এবং তাদের রাজাকে হত্যা করেন। তখন তার জন্য দু'টি প্রশস্ত রাজ্য রোমান ও পারস্য এক হয়ে যায় তার শাসনব্যবস্থায়। এ কারণেই তাকে যুলকারনাইন উপাধি দেয়া হয়। তবে সত্য হল, আল কুরআন যার ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন প্রথম ইসকান্দার। বিভিন্ন কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে একজন যার কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত: ইসকান্দার কাফের ছিলেন। তার শিক্ষক ছিলেন এরিস্টিটল। তিনি তার পরামর্শে কার্যাদি সম্পাদন করতেন। এরিস্টিটল কাফেরদের মধ্য থেকে একজন এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তৃতীয়ত: যুলকারনাইন তিনি আরবের অধিবাসী ছিলেন। আর ইসকান্দার, তিনি ইউনানী বা গ্রীকের অধিবাসী ছিলেন।"[২২]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: একদল লোক মনে করেন, আল কুরআনে যে যুলকারনাইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি এ ইসকান্দার বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নয়। প্রথম আলেকজান্ডার ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। আর এ আজেকজান্ডার আল-মাকদুনী বাঁধের কাছে কখনই পৌঁছেননি। আর তিনি (যুলকারনাইন) একঈশ্বরবাদী মুসলিম ছিলেন। আর মাকদুনী ছিলেন মুশরিক এবং গ্রীকের অধিবাসী। সেখানকার মুশরিকরা তারকারাজি ও একাধিক মূর্তির ইবাদত করতো।[২৩]

'জরথুষ্টীয়' সাহিত্যে যুলকারনাইনের বিভিন্ন কার্যকলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: In pre-Islamic Middle Persian (Zoroastrian) literature, Alexander is referred to by the epithet gujastak, meaning "accursed", and is accused of destroying temples and burning the sacred texts of Zoroastrianism.[24] In Islamic Persia, under the influence of the Alexander Romance (in Persian: اسکندرنامه Iskandarnamah), a more positive portrayal of Alexander emerges.[25]

ফিরদৌসির 'শাহনামা'তেও যুলকারনাইনের বর্ণনা বিদ্যমান। সেখানে দু'টি বিষয় চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১. আবে হায়াতের সন্ধান এবং ২. বায়তুল্লাহ যিয়ারত। যেমন:

---

[২২] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৮২।

[২৩] 'আল কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন কে?', ইসলামী প্রশ্ন ও উত্তর, *islamqa.info,* 24/03/2023

[২৪] Curtis, J.; Tallis, N; Andre-Salvini, B, *Forgotten empire: the world of ancient Persia* (University of California Press, 2005), p. 154.

[২৫] Roisman, Joseph; Worthington, *A Companion to Ancient Macedonia* (John Wiley & Sons 2010), p.120.

Firdausi's Shahnameh ("The Book of Kings") includes Alexander in a line of legitimate Persian shahs, a mythical figure who explored the far reaches of the world in search of the Fountain of Youth.[26] In the Shahnameh, Alexander's first journey is to Mecca to pray at the Kaaba.[27] Alexander was depicted as performing a Hajj (pilgrimage to Mecca) many times in subsequent Islamic art and literature.[28] Later Persian writers associate him with philosophy, portraying him at a symposium with figures such as Socrates, Plato and Aristotle, in search of immortality.[29]

কুরআন মাজিদের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে যুলকারনাইন ঈমানদার ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আর আলেকজান্ডার ছিলেন মুশরিক ও অত্যাচারী সম্রাট; তাঁর শিরক ও অত্যাচারের ইতিহাস তাঁর রাজদরবারেই কোনো কোনো সভাসদ লিপিবদ্ধ করেছেন। সমসাময়িক যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণও এ-ব্যাপারে একমত যে, আলেকজান্ডার ছিলেন মূর্তিপূঁজক, অত্যাচারী ও জালিম। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি রহ. তাঁর কিতাবের 'আহাদিসুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে যুলকারনাইনের ঘটনাকে ইবরাহিম আ. এর আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করেছেন। এর ব্যাখ্যা করে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) লিখেছেন-

وَفِي إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ تَرْجَمَةَ ذِي الْقَرْنَيْنِ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ إِشَارَةٌ إِلَى تَوْهِينِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ الْإِسْكَنْدَرُ الْيُونَانِيُّ لِأَنَّ الْإِسْكَنْدَرَ كَانَ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْنَ زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى أَكْثَرُ مِنْ أَلْفَيْ سَنَةٍ

অর্থাৎ, "গ্রন্থাকারের যুলকারনাইনের ঘটনাকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আলোচনার পূর্বে বর্ণনা করা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, তিনি ওইসব ব্যক্তির বক্তব্যকে অবমাননা করতে চান যাঁরা ইসকান্দার ইউনানিকে (গ্রিক আলেকজান্ডারকে) যুলকারনাইন বলে দাবি করেছেন। কারণ, ইসকানদার হযরত ইসা

[২৬] Fischer, M. M. J, *Mute dreams, blind owls, and dispersed knowledges: Persian poesis in the transnational circuitry* (Duke University Press, 2004), p. 66.

[২৭] Kennedy, Hugh (2012), "Journey to Mecca: A History". In Porter, Venetia (ed.). *Hajj : journey to the heart of Islam*, Cambridge, Mass.: The British Museum, p. 131

[২৮] Webb, Peter (2013). "The Hajj before Muhammad: Journeys to Mecca in Muslim Narratives of Pre-Islamic History". In Porter, Venetia; Saif, Liana (eds.). *The Hajj : collected essays*, London: The British Museum. pp. 14 footnote 72.

[২৯] Roisman, Joseph; Worthington, Ian (2010), *A Companion to Ancient Macedonia*, John Wiley & Sons, p.122.

আ.-এর যুগের নিকটবর্তী ছিলেন[৩০] ছিলেন আর হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত ইসা আ.-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই হাজার বছরেরও বেশি।[৩১]

এরপর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর পক্ষ থেকে তিন ধরনের পার্থক্য বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, আলেকজান্ডার কোনোভাবেই কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন হতে পারেন না। তিনি আরো পরিষ্কার করেছেন যে, ইমাম তাবারি তাঁর তাফসিরে এবং মুহাম্মদ বিন রবি আল-জিযি 'কিতাবুস সাহাবা'য় এ-সম্পর্কে যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং যাতে যুলকারনাইনকে রোমক ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে, যারা আলেকজান্ডারকে যুলকারনাইন বলেছেন, তাঁরা খুব সম্ভব এই রেওয়ায়েতর মাধ্যমে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল এবং নির্ভরযোগ্য নয়।[৩২]

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) যুলকারনাইন সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْر عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِسْكَنْدَرُ هُوَ ذُو الْقَرْنَيْنِ وَأَبُوهُ أَوَّلُ الْقَيَاصِرَةِ وَكَانَ مِنْ وَلَدِ سَامِ بْنِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَأَمَّا ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بْنِ مَيْطُونَ بْنِ رُومِيِّ بْنِ لَنْطِيِّ بْنِ يونان بن يافث ابن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بْنِ تَوْفِيلَ بْنِ رُومِيِّ بْنِ الْأَصْفَرِ بْنِ يقز بن العيص بن إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ كَذَا نَسَبَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ. الْمَقْدُونِيُّ الْيُونَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بَانِي إِسْكَنْدَرِيَّةَ الَّذِي يُؤَرِّخُ بِأَيَّامِهِ الرُّومُ وَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْأَوَّلِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ كَانَ هَذَا قَبْلَ الْمَسِيحِ بنحو من ثلاثمائة سنة وكان ارطاطاليس الْفَيْلَسُوفُ وَزِيرَهُ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ دَارَا بْنَ دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم.

وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ هو الذي كان ارطاطاليس وَزِيرَهُ فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ خَطأٌ كَبِيرٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ طَوِيلٌ كَثِيرٌ فَإِنَّ الْأَوَّلَ كَانَ عَبْدًا مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَلِكًا عَادِلًا وَكَانَ وَزِيرُهُ الْخَضِرَ وَقَدْ كَانَ نَبِيًّا عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا. **وَأَمَّا الثَّانِي فَكَانَ مُشْرِكًا وَكَانَ** وَزِيرُهُ فَيْلَسُوفًا وَقَدْ كَانَ بَيْنَ زَمَانَيْهِمَا أَزْيَدُ مِنْ أَلْفَيْ سَنَةٍ. فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا لَا يَسْتَوِيَانِ وَلَا يَشْتَبِهَانِ إِلَّا عَلَى غَبِيٍّ لَا يعرف حقائق الأمور

অর্থাৎ, 'আর ইসহাক বিন বিশ্ব সাঈদ বিন বশির থেকে, তিনি কাতাদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসকানদারই হলেন (প্রথম) যুলকারনাইন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রথম কায়সার (রোমক সম্রাট)। তিনি সাম বিন নুহ আ.-এর বংশধর।[৩৩]

---

[৩০] আলেকজান্ডারের জন্ম ২০ বা ২১ জুলাই ৩৫৬ খ্রি.পূ. এবং মৃত্যু ১০ বা ১১ জুন ৩২৩ খ্রি.পূ.।

[৩১] *ফাতহুল বারি*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮২।

[৩২] *ফাতহুল বারি*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮২।

[৩৩] তাঁর কথাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় যুলকারনাইন হলেন ইসকানদার বিন ফিলিপস; তিনি ম্যাসাডোনিয়ান, গ্রিক ও মিসরি, আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা;[৩৪] তিনি প্রথম যুলকারনাইন থেকে এক দীর্ঘকাল পর জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত ইসা আ.-এর জন্মের প্রায় তিনশো বছর পূর্বে তিনি গত হয়েছেন। দার্শনিক এ্যারিস্টটল তাঁর মন্ত্রী ছিলেন।[৩৫] তিনিই (আলেকজান্ডারই সেই সম্রাট যিনি) দারা বিন দারাকে হত্যা করেছিলেন, পারস্যের রাজাদেরকে অপদস্থ করেছিলেন, তাদের ভূমিকে পদদলিত করেছিলেন।[৩৬]

অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা দুজন (প্রথম ও দ্বিতীয় যুলকারনাইন) একই ব্যক্তি।[৩৭] আর কুরআনে যার (যে-যুলকারনাইনের) কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন ওই ব্যক্তি (আলেকজান্ডার), যাঁর মন্ত্রী ছিলেন এ্যারিস্টটল। এই বিশ্বাসের ফলে ভয়ঙ্কর প্রমাদ এবং খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী অশান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ প্রথমজন (প্রথম যুলকারনাইন বা ইসকানদার) ছিলেন মুমিন ও সৎ বান্দা, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রী ছিলেন খিযির আ.। আর ইনি (খিযির আ.) ছিলেন নবী; ইতোপূর্বে আমরা তা প্রমাণিত করেছি। আর দ্বিতীয়জন (দ্বিতীয় যুলকারনাইন বা ইসকানদার) ছিলেন মুশরিক (মূর্তিপূঁজক), তাঁর মন্ত্রী ছিলেন দার্শনিক (এ্যারিস্টটল); তাঁদের দুইজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই হাজার বছরেরও বেশি। সুতরাং কোথায় এই ইসকানদার (ম্যাসেডোনিয়ান ও মিসরি)[৩৮] আর কোথায় ওই ইসকানদার (আরবি ও সামি)[৩৯]? তাঁরা কখনো সমকক্ষ হতে পারেন না; যারা নির্বোধ, বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে কোনোই ধারণা রাখে না, তাদের কাছেই কেবল তাঁরা দুজন অস্পষ্ট ও একই রকম হতে পারেন।[৪০]

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيًّا وَكَانَ الْإِسْكَنْدَرُ كَافِرًا وَكَانَ معلمه ارسطا طاليس وَكَانَ يأتمر بِأَمْرِهِ وَهُوَ مِنَ الْكُفَّار بِلَا شَكٍّ

অর্থাৎ, "যুলকারনাইন নবী ছিলেন। আর ইসকানদার ছিলেন কাফের। তাঁর শিক্ষক ছিলেন এ্যারিস্টটল; ইসকানদার তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন। আর সন্দেহাতীতভাবে এ্যারিস্টটল ছিলেন কাফের।"[৪১]

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তা ছাড়া তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। আর অন্যদিকে, ইসকানদার ইউনানিও (আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটও) ছিলেন দিগ্বিজয়ী ও বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। ফলে তাঁকেও যুলকারনাইন বলা হতে

---

[৩৪] আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

[৩৫] এ্যারিস্টটল মহামতি আলেকজান্ডারের কেবল মন্ত্রীই ছিলেন না, তাঁর প্রধান শিক্ষকও ছিলেন।

[৩৬] এ-কারণে ইরানে আলেকজান্ডারকে দ্য গ্রেটকে 'অভিশপ্ত আলেকজান্ডার' বলা হয়।

[৩৭] অথচ তাঁরা একই ব্যক্তি নন। কারণ, দুই যুলকারনাইনের সময়কাল ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। আর কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম যুলকারনাইনের কথা, দ্বিতীয় যুলকারনাইন বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের কথা নয়। দিগ্বিজয়ী ছিলেন বলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকেও যুলকারনাইন বা দুই শিংয়ের অধিকারী বলা হতো।

[৩৮] বা দ্বিতীয় যুলকারনাইন

[৩৯] বা প্রথম যুলকারনাইন

[৪০] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১০৫-১০৬।

[৪১] *ফাতহুল বারি*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৮৩-৩৮৪।

লাগলো। অথবা, তিনি রোম ও পারস্য এই দুটি সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, কাজেই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হতো।[৪২]

উইকিপিডিয়াতে যুলকারনাইন ও আলেকজান্ডারকে নিয়ে একটি সারাংশ উল্লেখ করেছে। যেমন, The figure of Dhu al-Qarnayn (literally "the Two-Horned One") mentioned in the Quran is believed by scholars to be based on later legends of Alexander.[43] In this tradition, he was a heroic figure who built a wall to defend against the nations of Gog and Magog.[44] He then travelled the known world in search of the Water of Life and Immortality, eventually becoming a prophet.[45] The majority of modern researchers of the Quran as well as Islamic commentators identify Dhu al-Qarnayn as Alexander the Great.[46]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইবনে আবদুল বারর রহ., যুহাইর বিন বাক্কার রহ., হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ., আল্লামা ইবনে কাসির রহ., আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী প্রমুখ সত্যানুসন্ধানী আলিমের মতে, আল কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন ও ইতিহাসের আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বা ইসকান্দার এক নয়। সুতরাং বলা যায় যে, এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। যা ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের 'বুরহান' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে আলেকজান্ডার 'যুলকারনাইন' হওয়াকে নিম্নলিখিত প্রমাণসমূহের ভিত্তি অস্বীকার করা হয়েছে।[৪৭]

১। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের (জীবনের) ইতিহাসের এটা সর্বজন স্বীকৃত অধ্যায় যে, তিনি প্রাচীন গ্রিক ধর্মের অনুসারী ও মূর্তিপূঁজক ছিলেন। তিনি কখনোই মুসলমান ছিলেন না।

২। ইতিহাসবিদদের ঐকমত্যে আলেকজান্ডার অত্যাচারী ও জালিম শাসক ছিলেন। সচ্চরিত্র ও পুণ্যাত্মা ছিলেন না।

৩। এটাও একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, আলেকজান্ডারের বিজয় ও অভিযানের ধারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় নি।"

---

[৪২] *ফাতহুল বারি*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৮৪।

[৪৩] Roisman & Worthington 2010, Ibid, p. 120.

[৪৪] Roisman & Worthington 2010, Ibid, p. 122.

[৪৫] Roisman & Worthington 2010, Ibid, p. 122.

[৪৬] Griffith, Sidney (2021). "The Narratives of "the Companions of the Cave," Moses and His Servant, and Dhū 'l-Qarnayn in Sūrat al-Kahf". Journal of the International Qur'anic Studies Association. 6: 137–166.

[৪৭] মাওলানা শামছুল হক, *মুসলিম জাহানের দুই বাদশাহ হযরত সোলায়মান (আঃ) ও যুলকারনাইনের জীবনী* (ঢাকা: মাকতাবাতুস সোলায়মান, ১ম সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ.৮০।

উপরিউক্ত আলোচনান্তে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, ঐতিহাসিকগণ আলেকজান্ডারকে নিয়ে অনেক বিজয় গাঁথা, বীরত্ব, ভাস্কর্য অংকন, তার রাজ্য শাসন, তার ধর্মতান্ত্রিক বিষয়াবলী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বর্তমানে তাঁকে নিয়ে বাদ্যযন্ত্র নির্ভর গান ও একাধিক চলচিত্র নিমার্ণ হয়েছে। যেমন: Throughout time, art objects related to Alexander were being created. In addition to speech works, sculptures and paintings, in modern times Alexander is still the subject of musical and cinematic works. The song 'Alexander the Great' by the British heavy metal band Iron Maiden is indicative. Some films that have been shot with the theme of Alexander are:

1. Sikandar (1941), an Indian production directed by Sohrab Modi about the conquest of India by Alexander[48]
2. Alexander the Great (1956), produced by MGM and starring Richard Burton
3. Sikandar-e-Azam (1965), an Indian production directed by Kedar Kapoor
4. Alexander (2004), directed by Oliver Stone, starring Colin Farrell[49]

সাইরাস দ্য গ্রেট

ইতিহাসবেত্তাগণ পারস্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন : একটি হলো ইসকান্দার বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের দিগবিজয়ের পূর্বযুগ; দ্বিতীয়টি বিদ্রোহমূলক খণ্ড খণ্ড রাজ্যের যুগ এবং তৃতীয় হলো সাসানি বাদশাদের যুগ। ঐতিহাসিক বিবেচনায় এটাও মেনে নেয়া হয়েছে যে, এই তিনটি যুগের মধ্যে পারস্যের সম্মান এবং তার উন্নতি ও উৎকর্ষের যুগ খোরাসের (সাইরাসের) শাসনকাল থেকে শুরু হয়েছে। আর এই যুগের, খোরাসের শাসনামলের অবস্থাবলি পারস্যের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রিসের ঐতিহাসিকদের প্রচেষ্টাতেই আলোর মুখ দেখেছে। এ ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ খোরাসের সমসাময়িকও ছিলেন। এই বাদশাহকে ইহুদিরা (হিব্রু ভাষায়) খোরাস বলে, গ্রিকরা বলে সাইরাস, পারসিকরা বলে গোরাশ ও কায়আরশ এবং আরববাসীরা বলে কায়খসরু।[৫০]

---

[৪৮] Dwyer, Rachel (December 2005), 100 Bollywood Films. ISBN 9788174369901, Retrieved 6 April 2021.

[৪৯] https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great#cite_note-319

[৫০] আধুনিক ভাষায় তাঁর নামকরণে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন : আরবি كورش الكبير বা قوروش الكبير বা **قوروش دوم**; ইংরেজি: Cyrus II of Persia বা Cyrus the Great। বাংলা ভাষায় তাঁকে কুরুশও বলা হয়। লেখক সবসময় **خورس** শব্দটি ব্যবহার করেছেন। খোরাসের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৫৯৯ বা ৫৭৬-৫৭৫ সালে এবং তাঁর মৃত্যু ৫৩০

আর ইতিহাসবেত্তাদের মতেও পারস্য সাম্রাজ্যের এই তিনটি যুগকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা যায়। যেমন : আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ আল-বিদায় ওয়ান নিহায়ায় যে সকল ইঙ্গিত করেছেন, তা-ও এই বক্তব্যের সমর্থন করেছে। কেননা, তাঁরা বিদ্রোহমূলক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী খণ্ড খণ্ড রাজ্যব্যবস্থার পূর্বের অবস্থাবলির বর্ণনায় পারস্যের কিসরাদের (সম্রাটদের) যুগের মর্যাদা ও প্রতাপের কথা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, এই শাসনকাল পারস্য সাম্রাজ্যের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের যুগ ছিলো। তাঁরা বলেন, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল খণ্ড বিখণ্ড রাজ্যসমূহের মাঝের যুগটি ছিলো অত্যন্ত খারাপ ও অধঃপতনের যুগ।

কিন্তু আরদাশির বিন বাবাক সানানি অবনতি ও অধঃপতন ঠেকিয়ে পারস্যকে খোরাসের যুগে যে উন্নতি ও উৎকর্ষ ছিলো, সেই উন্নতি উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছে দেন।

فَاسْتَمَرَّ الأَمْرُ كَذٰلِكَ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ. حَتَّى كَانَ أَردشير بْنُ بَابِكَ مِنْ بَنِي سَاسَانَ بْن بَهْمَنَ بْنِ إِسْفِنْدِيَارَ بْنِ يَشْتَاسِبَ بْنِ لِهْرَاسِبَ، فَأَعَادَ مُلْكَهُمْ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَرَجَعَتِ المَمَالِكُ بِرُمَّتِهَا إِلَيْهِ.

অর্থাৎ, "আর এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলোর যুগ প্রায় পাঁচশো বছর অব্যাহত ছিলো। এই অবস্থায় সাসান সম্প্রদায়ের আরদাশির বিন বাবাক আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি হারানো রাজ্যগুলোকে ফিরিয়ে পূর্বের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো একত্র হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করলো।"[৫১]

وهٰذهِ الطبقةُ الأولى إلى أن غلبَ الاسكندر دارًا ورتبَ مُلُوكَ الطوائفِ ثم ملكتْ الأ كاسِرَةُ أولُهُمْ أَرْدَشِيْرُ بن بَابِكٌ.

অর্থাৎ, "দারাকে আলেকজান্ডারের পরাজিত করা পর্যন্ত এটা হলো পারস্য সম্রাটদের প্রথম স্তর। মধ্যখানে ছিলো বিচ্ছিন্নতামূলক খণ্ড রাজ্যসমূহের যুগ। তারপর হলো কিসরাদের[৫২] যুগ; প্রথম কিসরা ছিলেন আরদাশির বিন বাবাক।"[৫৩]

খ্রিস্টপূর্ব ৬২২ সালে বাবেল ও নিনাওয়ার রাজ্যগুলো চরম উন্নতি ও অগ্রগতির যুগে আরহণ করেছিল। আর খোরাসের শাসনামলের পূর্বে এই যুগেই ইরান দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব অংশকে মেডিয়া (মাহাত)[৫৪] বলা হতো এবং পশ্চিম অংশকে পারস্য বলা হতো। উভয় অংশেই গোত্রের নেতারা শাসনকার্য পরিচালনা করতো। আর গোত্রভিত্তিক খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলো তাদের অধীন ও অনুগত ছিলো। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ সালে নিনাওয়ার আসিরীয় রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটে। তখন মেডিয়া স্বাধীন

খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁর পিতার নাম Cambyses I ও এবং মায়ের নাম Mandana of Media। খোরাস হাখামানেশি Achaemenid Empire বা First Persian Empire) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা।

[৫১] *আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৫।

[৫২] পারস্য সম্রাটকে কিসরা বলা হয়।

[৫৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০।

[৫৪] Median Empire বা الميديون।

হয়ে গেলো এবং গোত্রভিত্তিক শাসনের স্থলে ধীরে ধীরে বাদশাহি শাসনের নিশান উড়তে লাগলো। তারপরও বাবেলের বাদশাহ বুখতেনাস্‌সারের বিপুল প্রতাপের সামনে ইরানের উন্নতি ও উৎকর্ষের কোনো সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। তবে এই অবস্থার মধ্যেই খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ সালে আল্লাহ তা'আলা 'অ্যাকিমিনিস' (Achaemenes) বা 'হাখামানেশি' (هخامنشی) বংশের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটালেন। তিনি প্রথম দিকে ইলশান নামক একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু ৫৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়বিচার, সুশাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, আল্লাহভক্তি এবং প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিস্ময়করভাবে মেডিয়া ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যকে তাঁর করতলগত করে দিলো। উভয় সম্রাজ্যের গোত্রভিত্তিক রাজ্যগুলোর শাসনকর্তারা স্বেচ্ছায় ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে তাদের বাদশাহ স্বীকার করে নিলো। ইনিই সেই ব্যক্তি, ইরানিরা যাকে গোরাশ বা কায়আরশ বলেন আর ইহুদিরা বলেন খোরাস।[৫৫]

পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান

খোরাশ মেডিয়া ও পারস্যকে একত্র করে একক সাম্রাজ্যের ঘোষণা দিলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁকে পশ্চিমাঞ্চলে অভিযানে বের হতে হলো। তার কারণ এই যে, খোরাসের শাসনভার গ্রহণের বহু পূর্বে মেডিয়া এবং ইরানের পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য লিডিয়ার (Lydia)[৫৬] (এশিয়া মাইনরের) মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো। কিন্তু খোরাসের সমসাময়িক লিডিয়ার রাজা কার্ডেসিসের[৫৭] পিতা[৫৮] খোরাসের নানা অ্যাস্টিয়াগিসের (Astyages) পিতার সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু খোরাস পারস্য ও মেডিয়াকে একত্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিলে এশিয়া মাইনরের রাজা কার্ডেসিস তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর পিতার কৃত সব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মেডিয়ার ওপর আক্রমণ করে বসলেন। তখন খোরাসও বাধ্য হয়ে তাঁর রাজধানী হামদান থেকে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হলেন। এই দুটি যুদ্ধের পরেই সমগ্র এশিয়া মাইনরকে নিজের অধিকারে নিয়ে নিলেন। যেমন: বিখ্যাত গ্রিক ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস (Herodotus) বলেন, খোরাসের এই অভিযান এমনই আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ছিলো যে, পেট্রিয়ার যুদ্ধে মাত্র চৌদ্দ দিনে তিনি লিডিয়ার সুদৃঢ় ও শক্তিশালী রাজধানীকে দখল করে নিয়েছিলেন। ওদিকে কার্ডেসিস বন্দি হয়ে অপরাধীরূপে খোরাসের সামনে দণ্ডায়মান হলেন।[৫৯]

কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত গোটা এশিয়া মাইনর খোরাসের ক্ষমতাধীন চলে এলেও তিনি সামনে দিয়ে এগিয়ে চললেন, এমনকি পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছলেন। অর্থাৎ তাঁর রাজধানী থেকে চৌদ্দশো মাইল পথ অতিক্রম করে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে স্থির হলেন।

---

[৫৫] *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.১৬৬।

[৫৬] পশ্চিম এশিয়া মাইনরের একটি রাজ্য ছিলো।

[৫৭] বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত লিডিয়ার এই রাজার নামের সঙ্গে লেখকের উচ্চারিত এই নামের গরমিল রয়েছে। যেমন : ইংরেজি- Croesus: আরবি- كرويسوس ; ফারসি- **کرزوس**। তিনি ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫৮] তাঁর পিতার নাম Alyattes।

[৫৯] খোরাস তাঁকে কোনো শাস্তি প্রদান করেন নি; বরং তাঁকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

ভূগোল বিশেষজ্ঞগণ বলেন, লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্তী ছিলো। এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা হলো এ রকম: এখানে স্মার্নার কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ বের হয়েছিলো এবং গোটা সীমান্ত অঞ্চল ঝিলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। আর ইজিয়ান সাগরের এই তীরের পানি উপসাগরের কারণে অত্যন্ত ঘোলা থাকে এবং সন্ধ্যাকালে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মনে হয় যে, সূর্য একটি ঘোলা পানির জলাশয়ের মধ্যে অস্তমিত হচ্ছে।

ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, খোরাস এশিয়া মাইনরকে বীরের মতো জয় করলেও যুগের অন্যান্য বাদশাহদের মতো বিজিত রাজ্যসমূহে জুলুম ও অত্যাচার চালান নি। সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে নির্বাসনেও পাঠান নি। তিনি সার্ডিসের জনসাধারণকে এটাও বুঝতে দেননি যে, এখানে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিপ্লব তো ঘটেছে, তবে কেবল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ কার্ডেসিসের জায়গায় খোরশের মতো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে হিরোডোটাস লিখেছেন, "সাইরাস দ্য গ্রেট (খোরাস) তাঁর সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা শত্রুসেনা ছাড়া অন্য কোনো মানুষের ওপর হাত উঠাবে না। আর শত্রুসেনার মধ্যে যারা তাদের বল্লম নিচু করে ফেলবে, তাদেরকে হত্যা করবে না। আর কার্ডেসিস যদি তরবারিও চালান, তারপরও তাঁর কোনো ক্ষতি করবে না।"[৬০]

রাজত্বের ব্যাপারে একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর যে মনোভাব ও বিশ্বাস থাকা উচিত খোরসের তাই ছিলো। গ্রিক ইতিহাসবিদ Ctesias তাঁর সম্পর্কে বলেন, "তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যে, রাজকোষের ধন-সম্পদ বাদশাহদের আমোদ-প্রমোদ বা সুখ ভোগের জন্য নয়; তা বরং জনসাধারণের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয় করা হবে এবং অধীন লোকেরা তার দ্বারা উপকৃত হবে।"[৬১]

পূর্বাঞ্চলে অভিযান

ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস বর্ণনা করেন, খোরাশ তখনো বাবেল জয় করেন নি; ইতোমধ্যে ইরানের পূর্বদিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কেননা, দূর প্রাচ্যের কয়েকটি জংলি ও যাযাবর গোত্র অবাধ্যাচরণ ও বিদ্রোহ করেছিলো। এরা ছিলো ব্যাট্রিয়া (Bactria বা باختر) অঞ্চলের গোত্রসমূহ। কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তার বরাতে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলটিকে আজকাল মাকরান (مكران) বলা হয়। এই অঞ্চলের যাযাবর গোত্রগুলো বিদ্রোহ করেছিলো। ইরানের জন্য এই অঞ্চলটি ছিলো দূর প্রাচ্যে। কেননা, তারপর পর্বতশ্রেণি আছে, যা সামনের দিকে চলার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তৃতীয় (উত্তরাঞ্চলে) অভিযান

বাবেল জয় করা ব্যতিরেকে ইতিহাস খোরাসের আরো একটি জয়কে বর্ণনা করেছে। আর এটি ঘটেছিলো ইরান থেকে উত্তর দিকে। এই অভিযানে তিনি কাস্পিয়ান সাগরকে ডান দিকে রেখে

[৬০] সাইরাস দ্য গ্রেট : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।
[৬১] সাইরাস দ্য গ্রেট : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত পৌছলেন। এই পর্বতমালার মধ্যে তিনি একটি গিরিপথ দেখলেন। পর্বতমালার দুই অংশের মধ্যে গিরিপথটিকে একটি ফটকের মতো দেখাচ্ছিলো। তিনি ওখানে পৌঁছলে একদল লোক তাঁর কাছে ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্রগুলো কর্তৃক লুণ্ঠনের অভিযোগ পেশ করলো, তারা গিরিপথের মধ্য থেকে বের হয়ে আক্রমণ করে এবং লুণ্ঠন ও লুটতরাজ করে আমাদের সর্বনাশ ও সর্বস্বান্ত করে দেয়। এই অভিযোগ শুনে খোরাস লোহা ও তামা ব্যবহার করে গিরিপথের ফটকটিকে বন্ধ করে দেন। তিনি ধাতবদ্রব্যের একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন, যার চিহ্ন ও ভগ্নাবশেষ আজো বিদ্যমান। গ্রিক ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস ও জেনোফন (Xenophon) বলেন, লিডিয়া জয় করার পর সাইথিয়ান (Scythians)[৬২] সম্প্রদায়গুলোর সামীন্ত-আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য খোরাস বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন।

এই সত্যটি একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, খোরাসের যুগে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সাইথিয়ান সম্প্রদায়ও ছিলো, যারা নিকটবর্তী জনপদে আক্রমণ চালিয়ে লুণ্ঠন ও লুটতরাজ করতো।

বাবেল বিজয়

গোরাশ বা খোরাসের বিজয়সমূহ এক বিশাল বিস্তৃত ভূভাগ দখল করে নিয়েছিলো। ইরানের দূর পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর সাগর[৬৩] থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগরের[৬৪] শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন খোরাস, আর এদিকে দূরপ্রাচ্যের মাকরান[৬৫] পর্বতমালা পর্যন্ত। আর দারা রাজ্যের পরিধির বিবরণকে নির্ভরযোগ্য মেনে নিলে সিন্ধুনদ পর্যন্ত জয় করে নিয়েছিলেন।[৬৬] আর উত্তরদিকে তিনি ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। এরপর তাঁকে ইরাকের বিখ্যাত ও সভ্যতামণ্ডিত, তবে উৎপীড়ক ও অত্যাচারী রাজ্য বাবেলের প্রতি মনোনিবেশ করতে হলো।

খোরাস থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে বাবেলের শাসকরূপে বনুকাদানযার (বুখতেনাস্‌সার) সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময়ের বিশ্বাস অনুসারে তিনি কেবল বাদশাহই ছিলেন না; বরং তাঁকে বাবেলের প্রতিমাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিমার অবতার এবং দেবতাও মনে করা হতো। ফলে তাঁর এই অধিকার ছিলো যে, যে রাজ্যকেই তাঁর ইচ্ছা নিজের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত করতেন, ওই রাজ্যের অধিবাসীদেরকে কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তিতে ভুগাতেন, তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন বা দাস

---

[৬২] এরা আরো কিছু নামে পরিচিত: Scyth, Saka, Sakae, Sai. Iskuzai, or Askuyai. আরবি ভাষায় এদেরকে বলা হয় الإصفوث أو السكوثيون।

[৬৩] North Sea: আটলান্টিক মহাসাগরের একটি প্রান্তীয়, ভূভাগীয় সাগর। এটি ইউরোপীয় মহীসোপানের ওপর অবস্থিত। সাগরটির পূর্বে নরওয়ে ও ডেনমার্ক, পশ্চিমে স্কটল্যান্ড ও ইনল্যান্ড এবং দক্ষিণে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স।

[৬৪] কৃষ্ণ সাগর দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের একটি সাগর। এটি ইউরোপ, আনাতোলিয়া ও ককেশাস দ্বার বেষ্টিত এবং ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর ও নানা প্রণালির মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণ সাগরের আয়তন ৪,৩৬,৪০০ বর্গকিলোমিটার।

[৬৫] পাকিস্তানের সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের দক্ষিণে একটি আধা-মরুভূমি সাগরতীরবর্তী এলাকা।

[৬৬] পিটার্স বুস্তানি, দায়িরাতুল মাআরিফ, চতুর্থ খণ্ড, ইরান।

বানিয়ে পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করতেন। ফলে বুখতেনাস্‌সারের অত্যাচার ও উৎপীড়ন ছিলো সীমাহীন এবং তাঁর রাজ্য দখলের নীতি ছিলো নির্মম ও পাশবিক। ইতোপূর্বে যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে।

বুখতেনাস্‌সার তাঁর রাজত্বকালে জেরুজালেমের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) ওপর তিন তিনবার আক্রমণ করেছিলেন। ফিলিস্তিনকে ধ্বংস ও বিনাশ করেছিলেন। ফিলিস্তিনের সব অধিবাসীকে ভেড়া ও বকরির পালের মতো হাঁকিয়ে বাবেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইহুদি ইতিহাসবিদ জোসেফ এস বলেন, বনু কাদানযার যেভাবে বনি ইসরাইলকে বাবেলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কোনো নির্মম থেকে নিমর্মতম কসাইও এমন নিষ্ঠুরতা ও রক্তপিপাসার সঙ্গে ভেড়াগুলোকে জবাইয়ের স্থানে নিয়ে যায় না।[৬৭]

আসিরীয় রাজত্বের বিলুপ্তির পর বাবেল আরো বেশি শক্তিশালী ও প্রতাপান্বিত রাজ্য হয়ে উঠেছিলো। সে সময় আশপাশের ও প্রতিবেশী শক্তিগুলোর কারোই এমন দুঃসাহস ছিলো না যে, সে ওই অত্যাচারী রাজ্যের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মূলোৎপাটন করে।

বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার কিছুদিন পর বুখতেনাসার মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন নাবোনিদাস (Nabonidus)[৬৮]। তিনি রাজত্বের যাবতীয় ভার রাজবংশের এক ব্যক্তি (আসলে তাঁর পুত্র) বেলশাযারের ওপর অর্পণ করেছিলেন

বেলশাযার জুলুম ও অত্যাচার, ভোগ ও বিলাস এবং আরাম ও আয়েশে বুখতেনাস্‌সারের চেয়ে অগ্রসর ছিলো; কিন্তু বুখতেনাস্‌সারের মতো সাহসী ও বীরদর্পী ছিলো না। ঠিক এ সময়টায় হযরত দায়িনাল আ. তাঁর ইলহামি ভবিষ্যদ্বাণী, মহৎ চরিত্র, উন্নত গুণাবলি এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণে এতটা প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, রাজ্যের শাসন ও পরিচালনায় প্রভাব বিস্তারকারী ও পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বেলশাযারকে খুব করে বুঝালেন, তাকে সব অন্যায় ও গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে চাইলেন, ভীতি প্রদর্শন করলেন; কিন্তু বেলশাযারের ওপর তার কোনো ক্রিয়াই হলো না। শেষ পর্যন্ত দানিয়াল (আ.) রাজত্বের ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

---

[৬৭] পিটার্স বুস্তানি, দায়িরাতুল মাআরিফ, চতুর্থ খণ্ড, বাবেল।

[৬৮] আসলে বুখতেনাস্‌সারের পর বাবেলের রাজা হন তাঁর পুত্র আমিল মারদুখ (امیل مردوخ বা Amil Marduk)। তিনি মাত্র দুই বছর (৬৬২-৬৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজা তাঁর ভগ্নিপতি Nergal shareyer / Neriglissar- এর চক্রান্তে তিনি নিহত হন। Neriglissar চার বছর (৫৬০-৫৫৬ খ্রি পূর্বাব্দ) রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন লাবাশি মারদুক (Labashi - Marduk)। তিনি মাত্র কিছুদিন রাজত্ব করেন। লাবাশি মারদুকের পর রাজা হন নাবোনিদাস। তিনি রাজত্ব করেন ১৬ বছর (৫৫৬-৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। নাবোনিদাস নিজে রাজ্য পরিচালনা করতেন না; তিনি তাঁর পুত্র বেলশাযারকে দিয়েই সব কাজ করাতেন। বুখতেনাস্‌সারের রাজত্বকাল ছিলো ৬০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ আর খোরাসের রাজত্বকাল ছিলো ৫৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ, বুখতেনাসারের মৃত্যুর তিন বছর পর খোরাসের রাজত্বকাল শুরু হয়। নাবোনিদাসের রাজত্বকালে খোরাস বাবেল আক্রমণ করেন বলেই মনে হয়। মূল বইয়ে (উর্দু কাসাসুল কুরআনে) বলা হয়েছে, বুখতেনাসারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নাবোনিদাস, যা বাস্তব নয়।

তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে এই সময়েই সেই ঘটনা ঘটলো। বেলশাযার একদিন তার প্রেয়সীর হঠকারিতামূলক আবদারে রাজি হয়ে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো, বুখতেনাস্‌সার জেরুজালেম থেকে যেসব পবিত্র পাত্র ও তৈজসপত্র লুণ্ঠন করে এনেছিলো, বেলশাযার সেগুলোকে তার প্রমোদাগারে নিয়ে গেলো, সেগুলোতে শরাব পান করলো। সে তখনো শরাবপানে মত্ত ছিলো, অকস্মাৎ সে বাতির আলোয় একটি দৃশ্য নিজের চোখে দেখতে পেলো। কোনো আকার ও আকৃতি সামনে আসা ছাড়াই অদৃশ্য থেকে একটি হাত প্রকাশিত হলো এবং প্রমোদাগারের প্রাচীরের গায়ে কয়েকটি বাক্য লিখে দিলো। তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে-

"সেই মুহূর্তে কোনো অদৃশ্য হাতের কেবল আঙ্গুলগুলো প্রকাশ পেলো। তা মশালদানির সামনে রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের চুনার ওপর লিখলো। বেলশাযার হাতের ওই অংশটুকুকে লিখতে দেখে অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন আশঙ্কা তাকে ভীত করে তুললো। লিপিকা যা লিখেছিলো তা ছিলো এমন : **منی منی** تقیل او فیرسین।[৬৯]

বেলশাযার ঘাবড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারকা-বিশ্যেষজ্ঞ, গণক ও জ্যোতিষী এবং বড় বড় জ্ঞানীগুণীকে ডেকে পাঠালো। কিন্তু তাদের কেউই এই জটিল সমস্যার সামাধান দিতে পারলো না। তারাও বাদশাহর মতো উদ্বিগ্ন হয়ে থাকলো। তখন তার রানী বললো, তুমি মহৎ ব্যক্তি দানিয়ালকে ডেকে আনো। রানীর কথামতো দানিয়াল আ. কে ডেকে আনানো হলো। তিনি বেলশাযারকে তার অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং ভোগ ও বিলাসিতার ব্যাপারে উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন-

"তুমি তোমার প্রমোদলীলায় জেরুজালেমের পবিত্র বস্তু ও পাত্রসমূহের অবমাননা করেছো এবং জুলুমের চরম সীমায় পৌঁছে গেছো। লিখিত বাক্যটির মর্মার্থ এই : আমি তোমাকে ওজন করে দেখেছি, কিন্তু তুমি ওজনে পূর্ণ হও নি, কম প্রমাণিত হয়েছো। আমি তোমার রাজত্বের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়েছি এবং তার সমাপ্তি ঘটিয়েছি। আমি তোমার রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পারস্য ও মেডিয়ার বাদশাহকে প্রদান করলাম।"[৭০]

এদিকে আরেক ঘটনা ঘটলো। বাবেলের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে বেলশাযারের অত্যাচার ও জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করছিলো। তাদের কয়েকজন সরদার পরামর্শ দিলো যে, প্রতিবেশী প্রতাপশালী ইরানের সাহায্য গ্রহণ করা হোক এবং তার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর কাছে নিবেদন করা হোক যে, তিনি যেনো আমাদেরকে বেলশাযারের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হোক যে, বাবেলবাসী সার্বিকভাবে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

---

[৬৯] দানিয়াল আ. এর সহিফা, পঞ্চম অধ্যায় আয়াত ২৫-২৮।

[৭০] আলোচ্যাংশে তাওরাত দারাকে বাবেলজয়ী বলেছে। তাওরাত যেভাবে বিষয়টা বর্ণনা করেছে তা খুবই গোলমালপূর্ণ। তাওরাত জায়গায় জায়গায় খোরাসের স্থলে দারার নাম এবং দারার স্থলে খোরাসের নাম উল্লেখ করে বিষয়টিকে এলোমেলো করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, খোরাসই প্রথম বাবেল জয় করেছিলেন। তারপর বাবেলবাসীরা বিদ্রোহ শুরু করলে দারা আক্রমণ করে সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাবেলের সরদারগণের একটি প্রতিনিধি দল খোরাসের দরবারে পৌছলো। তখন তিনি পূর্বাঞ্চলের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। খোরাস প্রতিনিধি দলকে অভিনন্দন জানালেন, তিনি তাদেরকে নিশ্চিন্ত করলেন যে, তিনি পূর্বাঞ্চলের অভিযান থেকে অবসর হয়ে অবশ্যই বাবেল আক্রমণ করবেন এবং বেলশাযারের মতো অত্যাচারী ও ভোগপ্রিয় বাদশাহর কবল থেকে মুক্ত করবেন। তারপর খোরাস পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গন থেকে ক্ষান্ত হয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাবেল আক্রমণ করলেন।

ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত অভিমত হলো যে, তৎকালে বাবেলের চেয়ে দুর্জয় ও দুর্দমনীয় আর কোনো এলাকা ছিলো না। বাবেলের প্রাচীরগুলো ছিলো কয়েক স্তরযুক্ত এবং ভীষণ দৃঢ় ও শক্তিশালী; কোনো বিজেতাই তা লঙ্ঘন করার দুঃসাহস রাখতো না। কিন্তু খোরাসের ন্যায়পরায়ণতা ও মায়ামমতা দেখে বাবেলের প্রজারা নিজেরাই তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েছিলো। বাবেলের এক গভর্নর গোবরিয়াস তাঁর সঙ্গী হয়েছিলো। হিরোডোটাসের বক্তব্য অনুযায়ী সে নদীতে নালা কেটে তার স্রোত অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। নদীর ওই দিক থেকেই খোরাসের সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করেছিলো। খোরাস নিজে ওখানে পৌছার আগেই বাবেল বিজিত হয় এবং বেলশাযার নিহত হলেন।

সাইরাস দ্য গ্রেট বা খোরাস : যুলকারনাইন

কতিপয় ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে আল কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন হলেন সাইরাস দ্য গ্রেট।[৭১] ১৯৫৫ সালে এ অভিমতটি প্রথম যিনি প্রদান করেন তিনি ছিলেন আলমানী ভাষাবিজ্ঞানী রিডশোলব। কিন্তু এ অভিমতটির পশ্চিমা পণ্ডিতগণ অনুসরণ করেননি।[৭২] তবে এটি আবুল কালাম আজাদ, জাওয়াদ আহমাদ গামেদীর মতো অনেক ভারতীয়, পাকিস্তানি এবং ইরানী পণ্ডিত এবং ভাষ্যকারদের দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছিল। যেমনটি তাফসীরকারক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন আত-তাবাতাবাঈ, গবেষক আল-আহমাদী মুহাম্মদ আলী এবং নাসির মাকারেম আল-শিরাজী তাঁদের তাফসীরে অভিমতটি উল্লেখ করেছেন।[৭৩] তারা বিশ্বাস করেন যে সাইরাস একজন মুসলিম ছিলেন। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে ড্যানিয়েল-৮ এ সহীফাটি উদ্ধৃত করেন। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুলকারনাইন মাদিয়া এবং পারস্যের একজন বাদশাহ ছিলেন। যেমন: أَمَّا الكَبْشُ الَّذِي رَأَيْتَهُ ذَا القَرْنَيْنِ فَهُوَ مُلُوكُ مَادِي وَفَارِسَ. وَالتَّيْسُ العَافِي مَلِكُ اليُونَانِ، وَالقَرْنُ العَظِيمُ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ هُوَ المَلِكُ الأَوَّلُ. অর্থাৎ, "অতঃপর কাবস্; যাকে আপনি যুলকারনাইন দু'শিং ওয়ালা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি মাদিয়া ও পারস্যের বাদশাহ।

[৭১] https://ar.wikipedia.org/wiki/Dhul Qurnayen/24/03/2023.

[৭২] Tatum ،James (1994). The Search for the ancient novel, Johns Hopkins University Press, p.343.

[৭৩] আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন আত-তাবাতাবাঈ, *আল-মিজান ফী তাফসীরিল কুরআন*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: মাওসুআতুল আলামি লিল-মাতবু'আত, ১৩৯২ হি.); Raheem, M. R. M. Abdur (1988). *Muhammad the Prophet*, Pustaka Nasional Pte Ltd. p. 231.

আর তাইসুল আফী হলো ইউনানের বাদশাহ। আর যার চোখের মাঝখানে যে বড় শিং আছে তিনি হলেন প্রথম বাদশাহ।"[৭৪]

Book of Isaiah (44:28, 45:1-6) এর মধ্যে সাইরাস (খোরাস) কে রাখাল, আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণকারী এবং লর্ড কর্তৃক মনোনীতরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। men from the rising and setting -এ কথা জানতে পারবে যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই অধীশ্বর নয়। এ সংক্রান্ত বাবেলের পতন এবং জেরুযালেমের পুনরভ্যুত্থানের কথা Book of Isaiah তে উল্লিখিত রয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, 'বখতে নসর' এর বন্দীদশা থেকে তাঁর কৃপায় ইহুদিদের অব্যাহতি এবং তিনি যে, একজন দিগ্বিজয়ী বীর, ন্যায়পরায়ণ নরপতি ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন- এসব কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় গ্রীক ঐতিহাসিক হিরুডটাস প্রমুখের লেখাতেও। ইসরাঈল বংশোদ্ভুত নয় এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বাইবেলে এত উচ্চ প্রশংসা অচিন্ত্যনীয়। সুতরাং সাইরাসের প্রতি ইহুদিদের আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিক।[৭৫]

ইহুদিরা সাইরাস দ্য গ্রেটকে শ্রদ্ধা করত। কেননা তার একটি অভিযান বাবেলের পতন এবং বনি ইসরাঈলের মুক্তির কারণ ছিল। এ (পৃথিবীর) শতাব্দীগুলো মেসোপটেমিয়ার রাজ্যসমূহের শক্তির একটি পরিচয় ছিল এবং সাইরাসের বিজয়গুলো পশ্চিমে সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর এবং পূর্বে সিন্ধু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং তার রাজ্য উত্তরে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। যদিও এর বিরোধীরা দেখেন যে সাইরাস দ্য গ্রেটের ব্যক্তিত্ব সেই চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা আল কুরআনে যুলকারনাইনকে একজন বিশ্বাসী নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যিনি আল্লাহর পথে লড়াই করেন। একইভাবে, সাইরাসকে কখনই যুলকারনাইন উপাধি দিয়ে ডাকা হয়নি। এবং সেই সাইরাস তার যুগের স্মৃতিস্তম্ভ এবং শিলালিপি অনুসারে জারদশতি তাওহীদপন্থী হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধু বিখ্যাত সাইরাস সিলিন্ডার যেটি তার ব্যাবিলন বিজয় এবং ইহুদিদের মুক্তির পর তার আদেশ দ্বারা লেখা হয়েছিল, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় দেবতাদের প্রধান, মারডুক, সাইরাসকে তাদের ব্যাবিলনের রাজা নাবো নিদের শাসন থেকে বাঁচাতে পাঠিয়েছিলেন।[৭৬]

১৫ শতকের ইউরোপীয় মানচিত্রে, একটি শিলালিপি রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে পারস্যের একজন রাজা (নাম আর্টক্সর) কিছু লোককে ইয়াজুজ ও মাজুজের দেশে বন্দী করেছিলেন। ইবনে নাদিম আর্টাক্সারক্সেসকে কিশতাসেব (কায়ানি রাজবংশের একজন রাজা) বলে মনে করেন।[৭৭]

যুলকারনাইন : আল কুরআনুল কারিম

[৭৪] সহীফায়ে দানিয়াল-৮:২০; https://st-takla.org./Bibles/BibleSearch.

[৭৫] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩০৪।

[৭৬] "খোরাস কি যুলকারনাইন?", islamexplained.com, সংগ্রহের তারিখ: ২৪/০৩/২০২৩ খ্রি.।

[৭৭] ʿAbd al-ʿAzīz Ḥamūdʿ Peli ،Audrey (2013), Map of the Oriental Islamic World. Centre français d'archéologie et de sciences sociales, p.109.

যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দু-ধরনের আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, যুলকারনাইন সম্পর্কিত তাওরাতের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণসমূহ ইতোপূর্বে লেখা হয়েছে। কিন্তু এখনো একটি বিষয় অনুল্লেখ থেকে গেছে। যে ব্যক্তিত্বের জন্য তাওরাত ও ইতিহাস থেকে বক্তব্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে, তিনিই কি কুরআন মাজিদে উল্লেখিত যুলকারনাইন? এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে এই ঘটনা সম্পর্কে কুরআনের সুরা কাহফে যে আয়াতগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পেশ করা প্রয়োজন। তারপর সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কুরআন মাজিদের সূরা আল কাহফে যুলকারনাইনের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ..... وَنُفِخَ فِي الصُّور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا}

"তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ..... একদল আর একদলের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে এবং শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে। এরপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো।"[৭৮]

কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলোতে যুলকারনাইনের যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যদি এগুলোকে তাওরাত ও প্রাচীন ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত ঘটনাবলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, তবে আপনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন যে, ধারণাপ্রসূত ব্যাখ্যা, অনুমাননির্ভর মন্তব্য ও অজ্ঞাত সম্ভাবনা থেকে বেঁচে থেকে খোরাস ব্যতীত অন্য কাউকেই যুলকারনাইন বলা যেতে পারে না।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার হলো সুরা কাহফের আয়াতগুলোর মর্মার্থকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে তাদের সঙ্গে খোরাস সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সামঞ্জস্যকে ভালোভাবে স্পষ্ট করা।

সুতরাং, যুলকারনাইন সম্পর্কে কুরআন মাজিদ কী কী তথ্য প্রকাশ করেছে এবং খোরাস-সম্পর্কিত ঘটনাবলি সেই তথ্যের সঙ্গে কীভাবে ঐক্য সাধন করেছে তা নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে পর্যায়ক্রমে অনুধাবনযোগ্য।

০১. কুরআনুল কারিমের বর্ণনা পদ্ধতি বলছে যে, কুরআন অন্যের জিজ্ঞাসার জবাবে যুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রশ্নকারীরা এই উপাধির সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করেছে। কুরআন নিজের পক্ষ থেকে এই উপাধি নির্বাচন করে নি।

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا}

অর্থ: "তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, "আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করবো।"[৭৯]

[৭৮] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৩-৯৯।

সামঞ্জস্যবিধানঃ বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত এটা প্রমাণিত যে, এই প্রশ্ন ইহুদিদের শেখানো ছিলো। তাদের শেখানো মতো মক্কার কুরাইশরা এই প্রশ্ন করেছিলো। প্রশ্নে উল্লেখ ছিলো যে, এমন একজন বাদশাহর অবস্থা বর্ণনা করুন যিনি সূর্যোদয়ের স্থান ও সূর্যাস্তের স্থান ভ্রমণ করেছেন, যাঁকে তাওরাতে কেবল এই জায়গায় এই উপাধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওরাত বলছে যে, দানিয়াল (আ.) এর কাশফের মধ্যে ইরানের একজন বাদশাহকে দুই শিঙবিশিষ্ট ভেড়ার আকৃতিতে দেখা যাচ্ছিলো জিবরাইল আ. দুই শিঙবিশিষ্ট (যুলকারনাইন) ভেড়ার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, এর দ্বারা সেই বাদশাহ উদ্দেশ্য যিনি পারস ও মেডিয়া এই দুটি রাজ্যের অধিপতি হবেন। আর নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ. এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইতিহাস উভয়ই এ ব্যাপারে একমত যে, ইরানের এই বাদশাহ ছিলেন খোরাস, যিনি পারস্য ও মেডিয়া রাজ্যকে একত্র করে সাম্রাজ্যের রূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ইহুদিদের আগ্রহ ও অনুরাগের কারণ এটাই ছিলো যে, তাদের নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই বাদশাহ ছিলেন তাদের মুক্তিদাতা। ফলে ইহুদিদের প্রদত্ত উপাধি 'যুলকারনাইন' ইরাকের রাজবংশের মতটাই বিখ্যাত ও প্রিয় হয়ে উঠেছিলো তার বাদশাহ খোরসের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছিলো। তাতে ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হযরত দানিয়াল আ.-এর স্বপ্নকে খোদাই করে প্রদর্শন করেছে।

আর নবী ইয়াসা'ইয়ার আ.-এর সহিফার এক জায়গায় খোরাসকে 'উকাব' (ঈগল পাখি) নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

"আমি খোদা, আমার মতো কেউই নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থা, প্রচীনকালের কথাসমূহ যা এখনো পূর্ণ হয় নি, আমি বলে দিচ্ছি আমার কল্যাণ অব্যাহত থাকবে এবং আমি আমার যাবতীয় ইচ্ছা পূরণ করবো। উকাবকে (ঈগল) আমি পূর্বদিক থেকে নিয়ে আসবো। সে ব্যক্তি আমার ইচ্ছা সম্পন্ন করবে।"[৮০]

ইসতাখার শহরের কাছে খোরাসের যে প্রস্তরনির্মিত প্রতিকৃতিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে একটি সামষ্টিক চিন্তার রূপ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে তার মাথার উভয় পাশে শিঙ আছে এবং মস্তকের ওপর একটি ঈগল পাখি আছে। খোরাস ব্যতীত পৃথিবীর অন্যকোনো বাদশাহ সম্পর্কে এ ধরনের চিন্তা করা হয় নি।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদিদের মুক্তিদাতা, আল্লাহ তাআলার মসিহ ও আল্লাহর রাখালের প্রতি ইহুদিদের আন্তরিক অনুরাগ ছিলো। এই বাদশাহ সম্পর্কিত ঘটনাবলির জ্ঞানকেই তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের সত্যতার মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে। আর এ প্রেক্ষিতেই কুরআন বাদশাহ খোরাসের উপযোগী ঘটনাবলি বিবৃত করেছে।

---

[৭৯] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৩।

[৮০] সহীফায়ে ইয়াসা'ইয়ার, ৪৬তম অধ্যায়, আয়াত ৯-১১।

০২. আল কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, যুলকারনাইন অতি প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাজত্বের সব ধরনের সরঞ্জাম ও শক্তি দিয়েছিলেন।

{إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا}

অর্থ: (আল্লাহ তাআলা বলেন,) 'আমি তো তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।'[৮১]

সামঞ্জস্য: তাওরাত এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের বিবরণ থেকে খোরাস সম্পর্কে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি ইরানের গোত্রভিত্তিক ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একত্র করে একক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও বাবেল ও নিনাওয়ার রাজ্যগুলোকে দখল করেছিলেন। ফলে ভৌগলিক বিবেচনায় তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাজত্বের সব ধরনের সরঞ্জাম ও শক্তি দিয়েছিলেন।

০৩. আল কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, যুলকারনাইন তিনটি উল্লেখযোগ অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

সামঞ্জস্য: নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খোরাস উল্লেখযোগ্য যিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

০৪. আল কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, যুলকারনাইন প্রথমে পশ্চিম দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

{**فَأَتْبَعَ سَبَبًا** (৮৫) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ}

অর্থ: 'তারপর এক পথ অবলম্বন করলো। চলতে চলতে সে যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌঁছলো তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো।'[৮২]

সামঞ্জস্য: গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস এবং অন্য কয়েকজন ইতিহাসবেত্তার বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাদশাহ খোরাস পশ্চিমদিকেই সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। তখন তাঁকে লিডিয়া (এশিয়া মাইনর)-এর রাজা কার্ডেসিসের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লিডিয়ায় অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিলো। লিডিয়া (এশিয়া মাইনর) ইরানের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিলো। আর লিডিয়ার রাজধানী সার্ভিস ছিলো এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলের সর্বশেষ সীমান্তবর্তী এলাকায়। হিরোডোটাসের বক্তব্য অনুযায়ী এই অভিযানটি ছিলো অলৌকিক ধরনের; খোরাস পশ্চিম দিকে জয় করতে করতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এশিয়া মাইনরের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলেন এবং সার্ভিসের মতো শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য শহরকে জয় করেছিলেন। তখন তার সামনে

[৮১] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৪।

[৮২] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৫-৮৬।

সমুদ্র ছাড়া কিছুই ছিলো না। এটি ছিলো স্মার্নার কাছে ইজিয়ান সাগরের এক তীর, যেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকার ফলে তা ঝিলে পরিণত হয়েছিলো। এখানকার পানি সবসময় ঘোলা থাকে। সন্ধ্যাকালে সূর্য যখন অস্তমিত হয়, মনে হয় ঘোলা পানির জলাশয়ে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে।

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

অর্থ: 'তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো।'

০৫. আল কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইকে ওখানকার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি যেমন ইচ্ছা তাদের সঙ্গে আচরণ করতে পারেন। তাদের বিদ্রোহের পরিণতি হিসেবে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন, অথবা, ইচ্ছা হলে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

{وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا}

অর্থ: "এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলো।' আমি বলেছিলাম, হে যুলকারনাইন, তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের বিষয়টি সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।"[৮৩]

সামঞ্জস্যবিধান: ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং প্রখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটাস ও জেনোফোনের (Xenophon) ঐতিহাসিক বক্তব্যসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, খোরাস (কায়খসরু/কায়আরশ) লিডিয়া জয় করে অন্যান্য বাদশাহর মতো ওই এলাকা কিছু ধ্বংস করেন নি; বরং ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়কর্মশীল বাদশাহর মতো ব্যাপক ক্ষমার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। দেশাবাসীকে তিনি নির্বাসনে পাঠান নি কার্ডেসিসকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া কাউকে এটা বুঝতে দিলেন না যে, লিডিয়ায় রাজত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য কার্ডেসিসের বীরত্বসুলভ সাহসিকতার পরীক্ষার জন্য প্রথমে তাঁকে চিতায় পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কার্ডেসিস যখন বীরের মতো চিতায় গিয়ে বসলেন, তখন তাঁকেও ক্ষমা করে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদার আচরণ করলেন।

০৬. আল কুরআনুল কারিম যুলকারনাইনের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছে তিনি মুমিনও ছিলেন এবং ন্যায়বিচারক ও সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন।

{قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (৮৭) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا}

অর্থ: "সে বললো যে-কেউ সীমা লঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেবো, তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।'[৮৪]

[৮৩] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৬।

সামঞ্জস্যঃ তাওরাতে বর্ণিত জেরুজালেম-সম্পর্কিত খোরাসের ফরমান, দারার অঙ্কিত শিলালিপি এবং তাঁর ঘোষণাসমূহ যা তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে আবেস্তার সাক্ষ্য এবং ইতিহাসের বর্ণনা এই দলিল-প্রমাণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, খোরাস ও দারা মুসলমান ছিলেন এবং ওই যুগের সত্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন। বরং ওই সত্য ধর্মের প্রচারক ছিলেন। তাঁরা ইবরাহিম যারদাশতের অনুসারী, এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতকারী এবং আখেরাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের ধর্ম বনি ইসরাইলের নবীদের শিক্ষার একটি শাখার মর্যাদা রাখতো। দারার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তা পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো।

০৭. আল কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, যুলকারনাইন পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি চলতে চলতে সূর্যের উদায়াচলের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছলেন। ওখানে একটি যাযাবর সম্প্রদায় দেখতে পেলেন।

{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (৮৯) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا}

অর্থ: "আবার সে এক পথ ধরলো, চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলো তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি।"[৮৫]

সামঞ্জস্যঃ ইতিহাসের আলোকে বলা যায় যে, খোরাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিযান হয়েছিলো পূর্বাঞ্চলে। মাকরানের যাযাবর গোত্রগুলো বিদ্রোহ করলে তিনি এই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এরা খোরাসের রাজধানী থেকে বহু দূরবর্তী এলাকায় পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করতো। এদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের পশ্চিমাঞ্চলের ও পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য অভিযান দুটির জন্য সূর্যাস্তের স্থান ও সূর্যোদয়ের স্থান শব্দ ব্যবহার করেছে। এ থেকে কারো কারো এই ভুল ধারণা হয়েছে যে, যুলকারনাইন অন্যকারো অংশীদারত্ব ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের সম্রাট হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর উভয় পাশে স্থলভাগের শেষ সীমা পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন। অথচ এই ধরনের সাম্রাজ্য ইতিহাসের ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে কোনো সম্রাটের জন্যই প্রমাণিত হয়নি; আর কুরআনও এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য এসব ঘটনা বর্ণনা করেনি। কুরআনের বর্ণনার স্পষ্ট ও পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই যে, যুলকারনাইন তাঁর রাজত্বের কেন্দ্রস্থলের বিবেচনায় পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। পশ্চিম দিকে তিনি স্থলভাগ শেষে যেখানে সমুদ্র শুরু হয়েছে ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। আর পূর্বদিকে ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যেখানে যাযারব গোত্রগুলো ছাড়া কোনো শহরকেন্দ্রিক বসবাস ছিলো না। এই উদ্দেশ্য মতটাই স্পষ্ট যে, বিনা দলিলে কেউ ভুল বুঝতে পারেন এই আশঙ্কায় উপরিউক্ত বক্তব্য যদি উদ্ধৃত করা না হতো, তারপরও প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাষার প্রচলিত

---

[৮৪] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৭-৮৮।

[৮৫] আল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৮৯-৯০। তারা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করতো। তাদের ঘরবাড়ি বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিলো না।

নিয়ম অনুসারে স্পষ্ট উদ্দেশ্যটাই বুঝতো যা আমরা বুঝেছি। যেমন : আজো আমরা ভারতবর্ষে বসবাস করে দূরপ্রাচ্য ও দূর পশ্চিমাঞ্চল দ্বারা দূর-দূরান্তের দেশ উদ্দেশ্য করে থাকি, যা আমাদের পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই শব্দগুলোকে কেবল এই কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেই না যে, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল দ্বারা ওই সীমান্ত উদ্দেশ্য, যার পরে পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ স্থানের আর কোনো অংশই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য দলিল-প্রমাণ বা লক্ষণ ও ইঙ্গিতের মাধ্যমেও কোনো কোনো সময় এই অর্থও হয়ে থাকে।

কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের অভিযান সম্পর্কে দূর পূর্বাঞ্চল ও দূর পশ্চিমাঞ্চল এর যে পরিভাষা ব্যবহার করেছে, তা যদি আরো গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়, তা হলে বুঝা যাবে যে, যুলকারনাইন বা খোরাস সম্পর্কে তাওরাত এই একই বর্ণনা প্রদান করেছিলো। ফলে কুরআন মাজিদ প্রশ্নকারীদেরকে যুলকারনাইনের ঘটনা শোনানোর সময় ওই পরিভাষাই অবলম্বন করেছে।

দেখুন, নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ. এর সহিফায় খোরাস সম্পর্কে হুবহু একই বর্ণনা বিদ্যমান আছে-

"আল্লাহ তাআলা তাঁর খোরাস সম্পর্কে বলছেন .... আমি আমার বান্দা ইয়াকুব এবং আমার মনোনীত ইসরাইলের জন্য তোমার নাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে তোমাকে ডেকেছি। আমি তোমাকে অনুগ্রহের সঙ্গে ডেকেছি, যেনো তুমি আমাকে জানো না। আমিই আল্লাহ, আর কেউ নয়। আমি ব্যতীত আর কোনো আল্লাহ নেই। আমিই তোমার শক্তি বৃদ্ধি করেছি, যদিও তুমি আমাকে চিনতে পারো নি। যেনো সূর্যোদয়ের স্থান (مطالع الشمس) থেকে সূর্যাস্তের স্থান (مغرب الشمس) পর্যন্ত মানুষ জানে যে, আমি ব্যতীত আর কেউ নেই। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেউ নেই।[৮৬]

আর নবী যাকারিয়া (আ.) এর সহিফায় বনি ইসরাইল সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"রাব্বুল আফওয়াজ বলেন, দেখো, আমি আমার লোকদেরকে সূর্যোদয়ের স্থান (مطالع الشمس) থেকে ও সূর্যাস্তের স্থান (مغرب الشمس) থেকে উদ্ধার করে নেবো এবং আমি তাদের নিয়ে আসবো। তারা (বনি ইসরাইল) জেরুজালেমে বসবাস করবে।[৮৭]

বলা বাহুল্য, এই উভয় সহিফাতেই (مطالع الشمس) এবং (مغرب الشمس) দ্বারা বিশ্বের স্থলভাগের দুই পাশের চূড়ান্ত সীমান্ত উদ্দেশ্য নয়; বরং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের রাজ্য বা বাসস্থান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দিক উদ্দেশ্য।

০৮. আল কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, যুলকারনাইনকে তৃতীয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিলো। তিনি এমন একটি স্থানে পৌঁছলেন যেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গিরিপথের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে পৌঁছে একটি জাতিসত্তার সন্ধান পেলেন যারা তাঁর কথা বুঝতে পারতো না। তারা কোনো উপায়ে যুলকারনাইনকে বুঝিয়ে দিলো যে, পর্বতমালার ভেতর থেকে বের

[৮৬] সহীফায়ে ইয়াসা'ইয়ার, ৪৫তম অধ্যায় : আয়াত ১-৬।
[৮৭] সহীফায়ে ইয়াসা'ইয়ার, ৮ম অধ্যায় : আয়াত ৮।

হয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ আমাদেরকে উৎপীড়ন করে এবং জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে। আপনি কি আমাদেরকে এই সহযোগিতাটুকু করতে পারবেন যে, আপনি আমাদের থেকে ব্যয় গ্রহণ করে এই দুইটি পর্বতের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন, যাতে ওদের ও আমাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাদেরকে ঠেকিয়ে দেয়। যুলকারনাইন বললেন, আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত সবকিছুই আছে এবং এই কাজের জন্য আমার কোনো পারিশ্রমিকেরও প্রয়োজন নেই। অবশ্য প্রাচীর নির্মাণ করতে তোমরা আমাকে সাহায্য করো। তারা যুলকারনাইনের আদেশে লোহার টুকরো সংগ্রহ করলো। যুলকারনাইন সেগুলো দিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন। তারপর তামা গলিয়ে প্রাচীরটির ওপর ঢেলে দিয়ে সেটিকে আরো শক্তিশালী করে দেন।

সামঞ্জস্যঃ ইতিহাসের অবশ্যস্বীকার্য সাক্ষ্য-প্রমাণ এটাই প্রমাণ করছে যে, খোরাস উত্তরদিকে একটি উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ওখানে ককেশিয়া (কোকা বা কোহেকাফ) পর্বতশ্রেণিতে দুইটি পাহাড়ের কাছে এই সম্প্রদায় দেখতে পেলেন। পাহাড় দুটির মধ্যস্থলে একটি প্রাকৃতিক গিরিপথ ছিলো। পাহাড়ের অপর দিক থেকে সাইথিয়ান জংলি ও অসভ্য লুটেরা দলে দলে এসে এই নিরীহ সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করতো এবং লুণ্ঠন করে গিরিপথের মধ্য দিয়ে ফিরে যেতো। খোরাস যখন এ এলাকায় পৌঁছেন তখন এই জনপদের লোকেরা তাঁর কাছে আক্রমণকারী লুটেরাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং আবেদন করে যে, আপনি এই পাহাড় দুটির মধ্যবর্তী গিরিপথে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিন। খোরাস তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন এবং লোহা ও তামা ব্যবহার একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন।

গাগ ও মিগাগ অসভ্য (সাইথিয়ান)[৮৮] গোত্রগুলো তাদের হিংস্রতা ও রক্তপিপাসা সত্ত্বেও খোরাস কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরকে ভাঙতে সক্ষম হলো না। তারা প্রাচীরটির ওপর দিয়ে পেরিয়ে এসেও আক্রমণ করতে পারলো না। এইভাবে পাহাড়ের এ পাশের বসবাসকারীরা সাইথিয়ান গোত্রগুলোর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো ।

অসভ্য ও হিংস্র সম্প্রদায়সমূহের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় অনেক প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথে লোহা ও তামার মিশ্রণে যে প্রাচীর নির্মিত হয়েছে, খোরাসের নির্মিত এই প্রাচীর ব্যতীত যা ককেশিয়া (কোকা বা কোহেকাফ) পর্বত শ্রেণিতে দেখা যায়- এমন প্রাচীর পৃথিবীর বুকে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।

সুতরাং, সাক্ষ্য ও দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এমন দাবি করা যেতে পারে যে, কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করেছে তার প্রেক্ষিতে খোরাসই হলেন যুলকারনাইন এবং দারইয়ালের গিরিপথের প্রাচীরটিই কুরআনের বিবৃত প্রাচীরের অনুরূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের উপরিউক্ত অভিমতটির সাথে সমসাময়িক আলিমগণও একমত পোষণ করেছেন যে, খোরাসই আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত যুলকারনাইন।

[৮৮] তাদের আরো নাম হলো Scyth, Saka, Sakae, Sai, Iskuzai

হিমায়রিয় রাজাদের থেকে একজন রাজা

সাহাবী ও তাবেয়ীদের জন্য প্রণীত কতেক ইসলামী নির্দেশনাবলীতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলকারনাইন ছিলেন হিমিয়ার রাজাদের একজন। আর হিময়ারের উত্তরসূরি রাজাদের "যু" অক্ষর সহ উপাধি ছিল। যেমন: যু নাওয়াস আল-হিমিয়ারি, রাজা সাইফ বিন যী ইয়াজান, রাজা যু রাইন আল-হিমিয়ারি, রাজা আমর যু ঘামদান,[৮৯] রাজা আমের যু রিয়াশ,[৯০] রাজা ইফ্রিকিস বিন যী আল-মানার, রানী লামিস বিনতে যী মারা' এবং তাদের মধ্যে আরও অনেকে।[৯১]

ঐতিহাসিকগণ তাঁর নাম নিয়ে মতভেদ করেছিল। তারা বলেছিল: তার নাম আল-সাব বিন মারায়েদ। তিনিই প্রথম অনুসারী। তিনিই বিইরুস সাবই' ইবরাহীমের জন্য শাসন পরিচালনা করেছিলেন। কাস বিন সাদা- এর খুতবায় তিনি বলেছিলেন: "হে ইয়াদের লোকেরা! কোথায় আল-সাব যুলকারনাইন, ভীতি প্রদর্শনকারী রাজা, বৃদ্ধদের অপমানকারী, দুই হাজার বছর বয়সী, তখন তা ছিল চোখের একটি মুহূর্ত।"[৯২] ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি কে ছিলেন? তিনি বললেন: "তিনি হিময়ার থেকে এসেছেন এবং তিনি হলেন আল-সাব বিন মারাইদ এবং তিনি হলেন সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে সবকিছুর জন্য একাধিক উপায়-উপকরণ দিয়েছেন।" কাব আল-আহবারকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন: "আমাদের মতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আমাদের নিকট যে ধারবাহিকতা ও সালাফদের থেকে ইলম পৌঁছেছে তা বলা যায় যে, তিনি হিমায়রী অধিবাসীর। তিনি হলেন আস-সা'ব।"[৯৩] আল মাকরিযী এটি উল্লেখ করেছেন তার নাম আল-সাব বিন মারাছিদ বিন আল-হারিস আল-রাইশ বিন আল-হাম্মাল সেদ বিন আদ বিন মানাহ বিন আমের আল-মালতাত বিন সাকস্ক বিন ওয়ায়েল বিন হিমিয়ার বিন সাবা বিন ইয়াশজুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতান বিন হুদ।[৯৪]

কেউ কেউ বলেছেন: তার নাম ছিল মারযবী বিন মারযাবা। আদ-দারে কুতনী ও ইবনে মাকুলা উল্লেখ করেছেন যে, তার নাম ছিল হার্মিস। বলা হয় যে, তিনি হলেন হারদিস বিন ফায়তুন বিন রুমি বিন লানাতি বিন কাসলুজিন বিন ইউনান বিন ইয়াফাস বিন নূহ। কেউ কেউ বলেন, যে তিনি হলেন আফ্রিদুন বিন আসফিয়ান, যিনি রাজা আদ-দাহককে হত্যা করেছিলেন।[৯৫] আবু জাফর আল-তাবারী

---

[৮৯] নিশওয়ান ইবনে সা'ইদ আল-হুমায়রি আল-ইয়ামিনী, খুলাসাতুল সিরাতিল জামিয়াতি লি-'আজাইবি আখবারিল মুলুকিত তাবিবিআহ (বৈরূত: দারুল আওদাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রি.)।

[৯০] আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হুমায়রী আল-মাআফিরী, আত-তায়জানু ফী মুলুকি হিমায়রি (ইয়ামেন: মারকাযুদ দিরাসাতি ওয়াল আবহাসিল ইয়ামিনাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৭ হি.)।

[৯১] https://www.maajim.com/dictionary/%D8%B0%D9%88

[৯২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৮৯।

[৯৩] ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ, *আত-তিজান ফী মুলুকি হিমায়ির* (সানা: মারকাযুদ দারাসাতি ওয়াল আবহাসিল ইয়ামিনিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৭ খ্রি.)।

[৯৪] তাকীউদ্দীন আবীল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী আল মাকরিযী, *আল-মাওয়ায়িযু ওয়াল ই'তিবারু* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ.১-৪।

[৯৫] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৮৯।

বলেন: "আল-খিযির হলেন তখনকার সময়ের আফ্রিদুন আল-মালিক ইবনে আল-দাহহাক। প্রথম সারির আহলে কিতাব আলিমদের মতে বলা হয়েছিল: মূসা বিন ইমরান (আ.)। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি যুলকারনাইনের (সেনাবাহিনীর) অগ্রভাগে ছিলেন। যিনি ইবরাহীম আল-খলিলের যুগে ছিলেন। যুলকারনাইনের সাথে খিযিরও আবু হায়াতের স্থানের সন্ধানে একত্রে পৌঁছেছিলেন। তিনি সেখান থেকে পানি পান করলেন। যুলকারনাইন এর সন্ধান পাননি। আর তিনি তার সাথে ছিলেন না। অতঃপর তিনি চিরস্থায়ী হলেন। তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। অন্যান্যরা বলেছেন যে, যুলকারনাইন যিনি ইবরাহীম খলিলের সময়ে ছিলেন, তিনি হলেন আফ্রিদুন বিন আল-দাহহাক। আর খিযির (আ.) তাঁর সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। এ অভিমতটি দুর্বল।[৯৬]

ইবনে হিশাম এই কথাটিও উল্লেখ করেছেন (নির্দিষ্টভাবে নয়)[৯৭] যে তিনি হিমিয়ার রাজাদের একজন উত্তরসূরি ছিলেন যা তার গ্রন্থ 'আল-তিজান' এবং আবু রায়হান আল-বিরুনি তাঁর গ্রন্থ 'আল-আসারুল বাকিয়্যাতি আনিল কুরুনিল খালিয়াহ' উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি, নিশওয়ান আল-হিমায়রী তার কিতাব "শামসুল উলুম" এবং 'খুলাসাতুস সায়রিল জামিয়াতি লি'আজাইবি আখবারিল মুলুকিত তাবাবিআতি'সহ হিমায়রিয় প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁদের দাদা যুলকারনাইনকে নিয়ে গর্ব করেছেন।

অনেক ঐতিহাসিক এই বিবৃতিগুলিকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, যুলকারনাইন এবং তিনি হিময়ার থেকে এসেছেন এমন কবিতাগুলি সমর্থিত নয় এবং ইসলামের পরে লেখা হতে পারে। হিমিয়ার রাজাদের সম্পর্কে খবরগুলি আরও বানোয়াট গল্পের মতো। তাদের পক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ নেই।[৯৮]

আখনাতুন

সৌদি শুরা কাউন্সিলের সদস্য হামদি বিন হামজা আবু জায়েদ তার বই ডিকোডিং দ্য সিক্রেটস অফ যুলকারনাইন অ্যান্ড ইয়াজুজ অ্যান্ড মাজুজে উল্লেখ করেন যে, যুলকারনাইন আর কেউ নয়, তিনি হলেন আখনাতুন। যিনি মিশরীয় বাদশাহ। তিনি তাঁর প্রজাদের তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৯৯]

সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে যুলকারনাইন

যুলকারনাইন ছিল লেখক-সাহিত্যিকদের প্রিয় বিষয়। বুক অফ ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটসের আরবি ও ফার্সি সংস্করণগুলির মধ্যে একটিতে আলেকজান্ডার বা যুলকারনাইনের ভারতীয় ঋষিদের সাথে সাক্ষাতের গল্প বর্ণনা করা হয়েছে , যাদের বাড়ির দরজায় কবর খনন করা ছাড়া আর কোন

---

[৯৬] *আল-মাওয়ায়িযু ওয়াল ই'তিবারু*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১-৪।

[৯৭] ইবনে হিশাম, আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ.৪।

[৯৮] ইবনে খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা* (বৈরূত: দারুল আরকাম ইবনে আবীল আরকাম, ২০১৬ খ্রি.)।

[৯৯] হুমায়দি ইবনে হামযাহ আস সারিসারি আল জাহনী, *ফাক্কু আসরারু যীল কারনাইন (আখনাতুন) ওয়া ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ* (রিয়াদ: ফিহরাসাতু মাকতাবাতুল মুলুক ফাহাদ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.)।

সম্পত্তি ছিল না; তাদের রাজা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা এটি করেছিল কারণ জীবনের একমাত্র নিশ্চিততা ছিল মৃত্যু।[১০০] যেমনিভাবে সুফি কবি জালালুদ্দিন রুমিও তার একটি রচনায় যুলকারনাইনের পূর্ব যাত্রা বর্ণনা করেছেন।[১০১]

মালয় ভাষায় লেখা একটি মহাকাব্য "حكايات إسكندر ذو القرنين" আলেকজান্ডার যুলকারনাইন এর কাল্পনিক কাজের বর্ণনা দেয়, কারণ মহাকাব্যটি বিশ্বাস করে যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং জুলকারনাইন এক ব্যক্তি। মহাকাব্যটি দাবি করে যে যুলকারনাইন ছিলেন একজন মহান রাজা, যিনি সরাসরি ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার মিনাংকাবাউ রাজ্যগুলোকে শাসন করতেন।[১০২] তিনি ছিলেন সুমাত্রার রাজাদের পূর্বপুরুষ। যেমন রাজা রাজেন্দ্র তাসুলা, যার বর্ণনা চোল মালয়ের ঐতিহাসিক নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৩]

উপরিউক্ত নীতিদীর্ঘ আলোচনান্তে বলা যায় যে, ঐতিহাসিকগণ যুলকারনাইনের পরিচয় নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, কেউ সাইরাস দ্য গ্রেট, কেউ হিমারিয় বাদশাহ, কেউ আখনাতুন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে যুলকারনাইন হিসেবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু একমাত্র সাইরাস দ্য গ্রেট ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের গুণাবলি খুঁজে পাওয়া যায় না। আল কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহওয়ালা ও প্রজারঞ্জক বাদশাহ। সে বর্ণনা অনুযায়ী সাইরাস, খোরাস বা কায়রুস এর সাথে ঐতিহাসিক মিলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা তিনি প্রাচীন কালের খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিযান পরিচালনায় যুলুম ও অত্যাচারের চিহ্ন ছিল না, বরং তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান।

---

[১০০] Yamanaka & Nishio 2006, Ibid.

[১০১] Berberian 2014.

[১০২] Early Modern History, p.60; Balai Seni Lukis Negara (Malaysia) (1999), Seni dan nasionalisme: dulu & kini. Balai Seni Lukis Negara.

[১০৩] S. Amran Tasai; Djamari; Budiono Isas (2005). *Sejarah Melayu: sebagai karya sastra dan karya sejarah : sebuah antologi*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. p.67; Radzi Sapiee (2007). *Berpetualang Ke Aceh: Membela Syiar Asal*. Wasilah Merah Silu Enterprise, p.69; *Dewan bahasa*. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1980, p.333, 486.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুলকারনাইন এর রাজত্বকাল ও রাজ্যের পরিধিঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

যুলকারনাইন ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী বাদশাহ। পৃথিবীতে তাঁর পরিভ্রমণ ছিলো অত্যন্ত সহজ। তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীর সকল পথ। ফলে দিবস-রজনী অথবা ঋতুবিবর্তন তাঁর চলার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতো না। নিম্নে যুলকারনাইন এর রাজত্বকাল ও রাজ্যের পরিধি সম্পর্কে ইতিহাসবিত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপস্থাপন করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا}

অর্থ: "আমি তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং সববিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।"[১০৪]

একাধিক তাফসীর গ্রন্থের আলোকে আলোচ্য আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা:

{إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ} بِتَسْهِيلِ السَّيْرِ فِيهَا {وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} يَحْتَاجُ إِلَيْهِ {سَبَبًا} طَرِيقًا يُوصِلُهُ إِلَى مُرَادِه

অর্থাৎ, "আমি তো তাকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। পৃথিবীতে ভ্রমণ করাকে সহজ করে দিয়ে। এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম। যার দিকে সে মুখাপেক্ষী ছিল। এমন পথ যার মাধ্যমে সে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হতো।"[১০৫]

وقال عَلِيٌّ: سَخَّرَ لَهُ السَّحَابَ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا، وَمَدَّ لَهُ فِي الْأَسْبَابِ وَبَسَطَ لَهُ النُّورَ فَكَانَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَلَيْهِ سَوَاءً، فَهَذَا مَعْنَى تَمْكِينِهِ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ أَنَّهُ سَهَّلَ عَلَيْهِ السَّيْرَ فِيهَا وَذَلَّلَ لَهُ طُرُقَهَا.

অর্থাৎ, "আলী (রা.) বলেছেন, মেঘমালাকে আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। মেঘমালার উপর তিনি আরোহণ করতেন। তার উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রাতদিন তার জন্য ছিল সমান। আর পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেওয়ার তাৎপর্য হলো, পৃথিবীতে চলাফেরা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। আর সহজ করার তাৎপর্য হলো, তার জন্য সর্বত্র সর্বপ্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রাত দিনের পরিবর্তনের বা মৌসুমের পরিবর্তনের কারণে তার গতি রোধ হতো না, তার ভ্রমণ বন্ধ হতো না।"[১০৬]

---

[১০৪] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৪।

[১০৫] *তাফসীরে জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩।

[১০৬] *তাফসীরুল বাগভী*, প্রাগুক্ত ৩য় খণ্ড, পৃ.২১২।

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ أَيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْوُصُول إِلَى أَغْرَاضِهِ سَبَباً أَيْ طَرِيقًا مُوَصِّلًا إِلَيْهِ، وَالسَّبَبُ مَا يتوصل به إِنِي الْمَقْصُودِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ قُدْرَةٍ أَوْ آلَةٍ،

অর্থাৎ, {وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ سَبَبًا}: অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ তাতে পৌঁছার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর উপকরণ হলো যা দ্বারা তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। যেমন: জ্ঞান, শক্তি অথবা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।[১০৭]

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয় আয়াতে **مِن كلّ شيءٍ** বলে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগের যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: {إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ سَبَبًا} অর্থ: 'অবশ্যই আমি, তাকে পৃথিবীতে বেশ কিছু ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং তাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ সরবরাহ করেছিলাম।' [আল-কাহাফ: ১৮:৮৪] অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বানিয়েছিলেন এবং তাঁকে এমন এক রাজত্ব দান করেছিলেন যে সকল দিক থেকে তাঁর জন্যে সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন আসতো, আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দিয়েছিলেন তার জন্যে শাসন ক্ষমতার সকল ব্যবস্থাদি ও সহজলভ্য বিজয়, তার সুবিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অজস্র সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে নানা প্রকার উপায়-উপাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো-আর তাকে দান করা হয়েছিলো আশি বছরের এক সুদীর্ঘ বয়স, দান করা হয়েছিলো সুবিশাল সাম্রাজ ও প্রচুর ধন সম্পদ এবং পৃথিবীর জীবনে যতো প্রকার সুখ সম্পদের অধিকারী মানুষ হতে পারে তা সবই তাকে দেয়া হয়েছিলো।[১০৮]

উপরিউক্ত আলোচনান্তে যুলকারনাইনের বয়স ও তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে তিনটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তা হলো:

وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ مَكَثَ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةِ سَنَةٍ يَجُوبُ الْأَرْضَ، يَدْعُو أَهْلَهَا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَفِي كُلّ هَذِهِ الْمُدَّةِ نَظَرٌ.

অর্থাৎ, "কোন কোন আহলি কিতাব উল্লেখ করেছেন, যুলকারনাইন এক হাজার ছয় শ' বছর আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেন এবং মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। কিন্তু তাঁর এ বয়সকাল সম্পর্কে যে সব মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।"[১০৯]

উক্ত বর্ণনাটি ছাড়াও আরও দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

---

[১০৭] *আল-বাহরুল মুহিত ফীত তাফসির*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ.২২০।

[১০৮] *তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১২তম খণ্ড, পৃ.৩২৭।

[১০৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৪৪-৫৪৫।

إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، ..... وَأَنَّهُ مَاتَ وَعُمْرُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ سَنَةٍ، وَهَذَا غَرِيبٌ.

অর্থাৎ, তবে ইসহাক ইবনে বিশর আব্দুল্লাহ ইবনে যিনাদের মাধ্যমে জনৈক আহলি কিতাব থেকে বর্ণনা করেন যে, "যুলকারনাইন যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তিন হাজার বছর। এ বর্ণনাটি 'গরীব' পর্যায়ের।"

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: وَبَلَغَنِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ عَاشَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: كَانَ عُمْرُهُ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ **سَنَةً**، وَكَانَ بَعْدَ دَاوُدَ بِسَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ بَعْدَ آدَمَ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَكَانَ مُلْكُهُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.

অর্থাৎ, ইবনে আসাকির (রহ.) অন্য এক সূত্রে বলেছেন, "যুলকারনাইন ছত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। কারও মতে তিনি বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। দাউদ (আ.) এর সাতশ' চল্লিশ বছর পর এবং আদম (আ.) এর পাঁচ হাজার একশ' একাশি বছর পর তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন এবং ষোল বছর রাজত্ব করেন।"[১১০]

উপরিউক্ত আলোচনান্তে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি (রহ.) এর মতে যুলকারনাইন হলো খোরাস বা সাইরাস। ইরানিরা তাকে কায়খসরু ও ইহুদিরা তাকে খোরাস বলেন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৫৯৯ বা খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৬-৫৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১১১]

সর্বোপরি, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ বলে প্রশংসা করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শেষ পর্যন্ত তিনি অভিযান পরিচালনা করেছেন। সমস্ত ভূ-খণ্ডের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। সকল দেশের অধিবাসীরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনি পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুত তিনি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত এক সফল ও বিজয়ী বীর এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহ। তাঁর সম্পর্কে বিশুদ্ধ কথা হল, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।"[১১২]

---

[১১০] উল্লেখ্য, ইবনে আসাকিরের এ বক্তব্য দ্বিতীয় ইসকান্দারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, প্রথম ইসকান্দারের ক্ষেত্রে নয়। তিনি দুই ইসকান্দারের মধ্যে প্রথম জন ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। প্রকৃত পক্ষে ইসকান্দার দু'জন। আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞজনের উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনার শুরুতে সে বিষয়ে উল্লেখ করে এসেছি। যার দুই ইসকান্দারকে একজন ভেবেছেন তাদের মধ্যে সীরাত লেখক আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম অন্যতম। হাফিজ আবুল কাসিম সুহায়লী এর জোর প্রতিবাদ করেছেন ও কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং উভয় ইসকান্দারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করে দেখিয়েছেন। সুহায়লী বলেছেন, সম্ভবত প্রাচীর যুগের কতিপয় রাজা-বাদশহা প্রথম ইসকান্দারের সাথে তুলনা করে দ্বিতীয় ইসকান্দারকেও যুলকারনাইন নামে আখ্যায়িত করেছেন। দ্র. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২০৭।

[১১১] *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.১৬৫-১৬৬।

[১১২] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২৭২।

কিন্তু একজন মানুষ কি তার নিজের উপর নির্ভর করে তার শক্তি, অভিজ্ঞতা ও তার সেনাবাহিনী দ্বারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও তার অধিবাসীদের উপর শাসন করতে পারে?

বিশ্বাসযোগ্য যে, যদি তিনি উক্ত কার্যাদি সম্পাদন করতে পারেন, তবে তা তার জন্য বিরল হুকুম। কেননা মানুষ নির্দিষ্ট শক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ, বয়স সীমিত এবং শক্তিও সীমিত। যা ইচ্ছা তাই সে করতে পারে না। ইচ্ছা করলেই শাসনভার পরিচালনা করা যায় না। যদি এমন বিষয় ঘটে, তবে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শক্তি দ্বারাই হয়ে থাকে। আশ্চর্যজনক ইতিহাস ও বিরল সময়ে বড় বড় কার্যাবলী সম্পদে এরূপ দৃষ্টান্তের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পরিকল্পনাকারী এবং যে কোন কাজ সহজকারী।

যুলকারনাইনের রাজত্বকালঃ

فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال في أعظم ملوك الأرض ذى القرنين إذ قال إنا مكنا له في الأرض فلم يكن جميع ملكه وسلطنته إلا بتمكين الله تعالى إياه في جزء من الأرض والأرض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم وجميع الولايات التى يحظى بها الناس من الأرض غبرة من تلك المدرة ثم تلك الغبرة أيضا من فضل الله تعالى وتمكينه

অর্থাৎ, "বান্দার মাওলা আল্লাহর শক্তিদান ছাড়া তার (বান্দার) কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই; যেমন তিনি বলেছেন যুলকারনাইনের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজত্ব করার প্রসঙ্গ নিয়ে। কেননা, তিনি বলেন: আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম।" পৃথিবীর একটি অংশেই শুধু আল্লাহ তাঁকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দানের দ্বারা তার সমগ্র রাজত্ব ও ক্ষমতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। গোটা পৃথিবীকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে বিশ্বের পরিধি ও সকল রাষ্ট্রের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার দ্বারা। পৃথিবীর যে অংশকে মানুষ জয় করেছে, অতঃপর পৃথিবীর ঐ অংশটাও আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর কর্তৃত্ব এই বক্তব্যের দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, গোটা পৃথিবীর যে অংশে মানুষ বসবাস করত। আল্লাহ অনুগ্রহ ও তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা নিয়ে যুলকারনাইন পৃথিবীর সেই অংশে রাজত্ব করেন।"[১১৩]

فَقَالَ: {إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} [الكهف: 84] أَيْ: وَسَّعْنَا مَمْلَكَتَهُ فِي الْبِلَادِ وَأَعْطَيْنَاهُ مِنْ آلَاتِ الْمَمْلَكَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ مَا يُحَاوِلُهُ مِنَ الْمُهِمَّاتِ الْعَظِيمَةِ وَالْمَقَاصِدِ الْجَسِيمَةِ.

قَالَ ثُبَيْطٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، كَيْفَ بَلَغَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ؟ فَقَالَ: سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ، وَمُدَّتْ لَهُ الْأَسْبَابُ، وَبُسِطَ لَهُ ي النُّورِ. وَقَالَ: أَزِيدُكَ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ، وَسَكَتَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ বলেন, "আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম ও প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।" [আল-কাহাফ: ১৮:৮৪] অর্থাৎ তাকে বিরাট রাজত্ব দিয়েছিলাম এবং রাষ্ট্রের এমন

[১১৩] ইমাম আবু হামেদ আল গাজ্জালি, *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩০৪-৩০৫।

সব উপায়-উপকরণ তার করায়ত্ত করে দিয়েছিলাম যার সাহায্যে সে বিরাট কাজ সমাধান করতে ও বড় বড় উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারতো। কুতায়বা ..... হাবীব ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন। হাবীব বলেন, আমি আলী ইবনে আবি তালিবের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, যুলকারনাইন কী উপায়ে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন? আলী (রা.) বললেন, মেঘমালাকে তাঁর অনুগত করে দেয়া হয়েছিল, সকল উপকরণ তাঁর হস্তগত করা হয়েছিল এবং তাঁর জন্যে আলো বিচ্ছুরিত করা হয়েছিল। এ পর্যন্ত বলে জিজ্ঞেস করলেন, আরও বলা লাগবে না কি? শুনে লোকটি চুপে হয়ে গেল, আর আলী (রা.)ও থেমে গেলেন।[১১৪]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরুল কুরআনুল আযীম" -এ রাজত্বের পরিধি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণীর আদলে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। যা নিম্নরূপ:

আল্লাহ তা'আলার বাণী: إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي الْأَرْضِ 'আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।'[১১৫] অর্থাৎ তাকে আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছিলাম এবং সাথে সাথে তার প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যেই সকল উপায় উপকরণের প্রয়োজন ছিল যেমন, সেনাবাহিনী, যুদ্ধাস্ত্র, কিল্লাসমূহ সব কিছু দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। আরব ও আজমের সকল বাদশাহ তার অনুগত হয়েছিলেন। এ কারণে কেউ কেউ বলেন, যেহেতু যুলকারনাইন সূর্যের দুইপ্রান্ত মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এই কারণে তাকে যুলকারনাইন বলা হয়।[১১৬]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 'আর তাকে আমি প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করেছিলাম।'[১১৭] ইবনে আব্বাস (রা.), সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (রহ.) সহ আরো অনেকে অত্র আয়াতের তাফসীর করেন, আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলাম। কাতাদাহ (রহ.) অপর এক ব্যাখ্যা বলেছেন, আমি তাকে পৃথিবীর সকল মনযিল ও এর চিহ্নসমূহ সম্পর্কে অবগত করেছিলাম। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে সকল ভাষা শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি যে কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন, তিনি তাদের ভাষায় তাদের সাথে কথা বলিতেন।[১১৮]

ইবনে লাহীআহ (রহ.) বলেন, সালেম ইবনে গায়যান (রহ.)....মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান হতে বর্ণিত যে, একবার মুআবীয়াহ কাব ইবনে আহবার (রা) কে বললেন, আপনি না বলেন, যুলকারনাইন সুরাইয়া নক্ষত্রের সাথে তাঁর ঘোড়া বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন যদি তা অস্বীকার করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 'আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান

[১১৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৪৩।
[১১৫] আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৪।
[১১৬] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৮৭।
[১১৭] আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৪।
[১১৮] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৮৭।

করেছিলাম।'[১১৯] মুআর্বীয়াহ (রা) যে কাব এর কথাকে অস্বীকার করলেন এ বিষয়ে মু'আবীয়াহ (রা)-এর অস্বীকৃতি সঠিক ছিলেন। মু'আবীয়াহ (রা) কাব সম্পর্কে বলতেন, তিনি যা কিছু বর্ণনা করতেন তা মিথ্যা হতো অবশ্য তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলতেন না। তার অভ্যাস ছিল যেখানে যা কিছু পেতেন সেটাকে সত্য মনে করে বর্ণনা করতেন। তার লিখিত সহীফা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দ্বারা পরিপূর্ণ। যার অধিকাংশ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বাজে কথা হতে মুক্ত ছিল না। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিশুদ্ধ হাদীসের উপস্থিতিতে ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের প্রয়োজনও নেই। ঐ সকল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলমানদের মধ্যে বহু ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। কাব আহবার (রা) وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا এর যে ব্যাখ্যা করেছেন এর সাক্ষ্য হিসেবে যে রেওয়ায়েত তার সহীফায় বিদ্যমান তা সঠিক নয়। কারণ, কোন মানুষের পক্ষে সুরাইয়া নক্ষত্রে পৌঁছা সম্ভব নয় এবং না তাদের আসমানে আরোহণ করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বিলকীস সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 'তাকে সর্বপ্রকার বস্তু দান করা হয়েছিল।'[১২০] এর অর্থ হলো, সাধারণতঃ রাজা বাদশাগণকে যে সকল বস্তু দেয়া হয় এর সব কিছুই তাকে দান করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে দেশ বিজয়ের জন্য শত্রু দমনের জন্য অহংকারী বাদশাদিগকে অধিনস্ত করবার জন্য মুশরিকদেরকে বাধ্য করবার জন্য যে সকল উপায়-উপকরণ ও আসবাবের প্রয়োজন ছিল এর সব কিছুই তাকে দান করেছিলেন।

হাফিয জিয়া মাকদিসী (র) এর মুখতারাহ নামক গ্রন্থে বর্ণিত, কুতায়বাহ (র)....আবূ আওয়ানাহ, সাম্মাক হাবীব ইবনে হাম্মাদ (র) হতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমি আলী (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করিল, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবে কিভাবে পৌঁছে ছিলেন? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তার জন্য মেঘমালাকে অধিনস্থ করেছিলেন, সকল উপায় উপকরণ নির্ধারণ করেছিলেন এবং তাকে পূর্ণ শক্তি দান করেছিলেন।[১২১]

যুলকারনাইনের রাজ্যের পরিধিঃ

{فَأَتْبَعَ سَبَبًا (৮৫) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (৮৬) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (৮৭) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (৮৮) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (৮৯) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (৯০) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (৯১) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (৯২) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا}

[১১৯] আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৪।

[১২০] আল-কুরআন, সূরা আন-নমল, ২৭:২৩।

[১২১] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৮৭-১৮৯।

অর্থ: "অতঃপর সে একটি পথ অবলম্বন করল। অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে একটি কর্দমাক্ত পানির ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেল এবং সে এর কাছে একটি জাতির দেখা পেল। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি তাদেরকে আযাবও দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদাচরণও করতে পার'। সে বলল, 'যে ব্যক্তি যুলম করবে, আমি অচিরেই তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তাকে তার রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তাকে কঠিন আযাব দেবেন'। 'আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমি আমার ব্যবহারে তার সাথে নরম কথা বলব'। তারপর সে আরেক পথ অবলম্বন করল। অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে এসে পৌঁছল তখন সে দেখতে পেল, তা এমন এক জাতির উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য আমি সূর্যের বিপরীতে কোন আড়ালের ব্যবস্থা করিনি। প্রকৃত ঘটনা এটাই। আর তার নিকট যা ছিল, আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তারপর সে আরেক পথ অবলম্বন করল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না।"[১২২]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে যুলকারনাইনের রাজ্যের পরিধি বিবরণ সুস্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর তিন দিকে তাঁর রাজ্যের পরিধি বিস্তার করেছেন। ১. সূর্যের অস্তস্থল অর্থাৎ পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চল, ২. সূর্যের উদয় স্থল অর্থাৎ পূর্বাঞ্চল এবং ৩. উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ আল কুরআন যাকে দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর নির্মাণের বর্ণনা উপস্থান করেছেন। নিম্নে দু'টি তাফসীরের ধারবাহিক হুবহু বর্ণনার আলোকে যুলকারনাইনের রাজ্যের পরিধি তুলে ধরা হলো:

১. ইবনে আববাস (রা) **فَأَتْبَعَ سَبَبًا** অর্থ করেছেন, অতঃপর যুলকারনাইন আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশিত পথ ধরে চললেন। মুজাহিদ (রহ.) এর অর্থ করেছেন, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যবর্তী একটি পথ ধরে চললেন। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, যুলকারনাইন যমীনের মনযিল ও চিহ্নসমূহ অবলম্বন করে চললেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রহ.) বলেন, **فَأَتْبَعَ سَبَبًا** অতঃপর তিনি যমীনের চিহ্ন ধরে চললেন। ইকরিমাহ, উবাইদ ইবনে ইয়ালা ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। মাতর (রহ.) বলেন, পূর্বে যে সকল চিহ্নসমূহ আলামতসমূহ বিদ্যমান ছিল তিনি এর সাহায্যে পথ চলতে লাগলেন।[১২৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: **حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ** তিনি চলতে চলতে অবশেষে যখন পৃথিবীর পশ্চিম দিকে সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছলেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে আসমানে যেই প্রান্তে সূর্য অস্ত যায় তা উদ্দেশ্য নয়। কোন কোন কিচ্ছা বর্ণনাকারী বলেছেন যুলকারনাইন চলতে চলতে সূর্যাস্তের স্থানও অতিক্রম করে চলে গেছেন এবং সূর্য তার পশ্চাতে অস্ত যাইতেছিল এটি সত্য নয় বরং এটি আহলে কিতাবদের পক্ষ হতে বাজে কথা এবং তাদের মধ্যে যারা ধর্মহীন তাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথা।

---

[১২২] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৮৫-৯৩।

[১২৩] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯১।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ তিনি সূর্যকে দেখতে পেলেন যেন তা সমুদ্রের মধ্যে অস্ত যাচ্ছিল। যে কেউ সমুদ্রতীরে দাঁড়ায় সে সূর্যকে সমুদ্রের মধ্যেই অস্ত যেতে দেখে। অথচ সূর্য চতুর্থ আসমানে প্রতিষ্ঠিত। এ আসমান হতে সূর্য পৃথক হয় না। الحمئة শব্দটি এক কিরাত অনুসারে الحمأة হতে নির্গত হয়েছে অর্থ মাটি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ "তবুও তারা বলত, নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়া হয়েছে, বরং আমরা তো যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।"[১২৪] এখানে حماءٍ অর্থ মাটি ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে।

وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب حدثنى نافع بن أبي نعيم، سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول {فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع: وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني، ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء.

অর্থাৎ, ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ এর অর্থ করতেন মাটি বিশিষ্ট পানির মধ্যে অস্ত যায়। একবার কাব আহবারকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তোমরা কুরআন সম্পর্কে অধিক বেশী জান কিন্তু আমি কিতাবের মধ্যে যা পাই তা হলো, সূর্য কালো মাটির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইবনে আব্বাস (রা) হতে অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এ ব্যাখ্যা করেছেন।[১২৫]

আবু দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে দীনার (র).... ইবনে আব্বাস (রা) উবাই ইবনে কাব (রা) হতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) তাকে حَمِئَة পড়াইছেন।[১২৬]

আলী ইবনে আবু তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হতে وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ গরম পানির মধ্যে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখতে পেলেন।[১২৭]

হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন বিশুদ্ধ মত হলো উভয় কিরাতেই মাশহুর ও সুপরিচিত কিরাত এবং এর যেটিই কারী পড়বে বিশুদ্ধ পড়বে বলেই ধরতে হইবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, দুইটি কিরাতের অর্থে কোন বিরোধ নাই। কারণ সূর্যের অন্তকালে ঐ স্থানে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় সূর্যের কিরণ সরাসরি পানিকে স্পর্শ করার কারণে পানি গরম হতে পারে এবং ঐ স্থানের মাটি কালো বর্ণের হবার কারণে এর পানিও ঐ একই বর্ণ ধারণ করতে পারে। যেমন কাব আহবার ও অন্যান্য মনীষীগণ বলেছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লা (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন, আওয়াম....আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

---

[১২৪] আল কুরআন, সূরা আল হিজর, ১৫ : ২৮।

[১২৫] আবু জাফর আত-তাবারী, *তাফসির আত তাবারি* (বৈরূত: মুআসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), ১০ম খণ্ড, পৃ.১৬।

[১২৬] সুলায়মান ইবনে দাউদ আবু দাউদ আল-ফারসী আল-বসরী আত-তায়ালিসী, *মুসনাদ আত-তায়ালিসী* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.), পৃ.৫৩৬।

[১২৭] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯১।

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ فَقَالَ فِي نَارِ اللَّهِ الْحَامِيَةِ لَوْلَا مَا يَزَعُهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَأَهْلَكَتْ مَا عَلَى الْأَرْضِ

অর্থাৎ, "একবার সূর্যাস্তের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, যদি আল্লার নির্দেশে এর তাপ হ্রাস করা না হতো তবে তা পৃথিবীর সব কিছুকে জালিয়ে ভষ্ম করে দিত।"[১২৮] ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু এর মারফু হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। সম্ভবত, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র)-এর বক্তব্য এবং এটি তিনি সে দু'টি থলে হতে নিয়েছেন যা তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে পেয়েছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।[১২৯]

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন হাজ্জাজ ইবন হামজা (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার মুআবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ পড়লেন তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমরা তো একে عَيْنٍ حَمِئَةٍ পড়ি। অতঃপর মুআবীয়াহ (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আয়াতটি কি রকম পড়েন? তিনি বলিলেন, যেমন আপনি পড়েন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমি মুআবীয়াহ (রা) কে বললাম, আমার ঘরেই তো কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তখন মুআবীয়াহ (রা) কাব ইবনে আহবার-এর নিকট লোক প্রেরণ করে জিজ্ঞেসা করলেন, সূর্য কোথায় অস্ত যায় তাওরাতে এ সম্পর্কে কি উল্লেখ রয়েছে। তিনি বললেন, কোন আরবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করুন। তারা এ বিষয়ে অধিক ভাল জানে। তবে সূর্য কোথায় অস্ত যায় এ সম্পর্কে আমি তাওরাতে যা পেয়েছি তা হলো সূর্য পানি ও মাটি অর্থাৎ কাদার মধ্যে অস্ত যায়। এ কথা বলে তিনি পশ্চিম দিকে ইংগিত করলেন। ইবনে হাযের এ ঘটনা শ্রবণ করে বললেন, যদি আমি তখন উপস্থিত থাকতাম তবে আপনার সমর্থনে 'তুব্বা'র এ কবিতা দু'টি পড়ে শুনাতাম। যাতে তিনি যুলকারনাইন এর আলোচনা করেছেন।

بلَغَ الْمُشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ + لَسْبَابُ أَمْرُ مِنْ حَكِيمٍ مُرشد

فَرَأَى مَغَيْبُ الشَّمُس عِنْدَ غُرُوبهَا + فِي عَيْنِ ذِي خَلبٍ وَثَاطُ حَرُمَةٍ

অর্থাৎ, "যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন কারণ মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের সময় একে কালো মাটির ন্যায় কাদার মধ্যে অস্ত যেতে দেখলেন।"[১৩০]

অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন কবিতার মধ্যে উল্লেখিত কর الثَّاطُ -الخُلب ও الْحَرّمَدُ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, الخَطَبُ অর্থ মাটি পেলা الثَّاطُ অর্থ, কাদা ও الْحَرّمَدُ অর্থ কালো। অতঃপর

---

[১২৮] *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৯৩৪, ১১তম খণ্ড, পৃ.৫২৬।
[১২৯] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯২।
[১৩০] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯২।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন এই লোকটি যাহা বলেন, তুমি উহা লিখিয়া রাখ।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, একদা ইবনে আব্বাস (রা) সূরা কাহাফের এ আয়াত وَجَدَهَا تَغْرِبُ فِيْ حَمِئَةٍ পাঠ করলেন। তখন কাব তা শোনে বললেন সে সত্তার কসম যার হাতে কাবের প্রাণ! তাওরাতে এই বিষয়টি যেমন অবতীর্ণ হয়েছে এর অনুরূপ এ আয়াতকে ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতিত অন্য কাউকেও পাঠ করতে শুনি নাই। তাওরাতে আমি এ বিষয়টি এরূপ পেয়েছি, "সূর্য কালো কাদার মধ্যে অস্ত যায়"। আবু ইয়ালা মুসেলী বলেন, ইসহাক ইবনে ইসরাঈল হিশাম ইবনে ইউসুফ-এর সূত্রে "তাফসীরে ইবনে জুরাইজ" এর মধ্যে وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যেখানে সূর্য অস্ত যায় তার নিকটবর্তী একটি শহর ছিল যার বার হাজার দরজা ছিল যদি শহরবাসীর শব্দ না হতো তবে সূর্যাস্তকালে তারা সূর্যাস্তের শব্দগুলোতে পেত। وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا 'এবং এর নিকটবর্তী একটি সম্প্রদায়কে তিনি পেলেন'। উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেছেন, তারা আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায় ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বাণী:[১৩১] قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যুলকারনাইনকে কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করলেন এবং তাকে এ এখতিয়ার দিলেন, ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে হত্যা করতে ও বন্দি করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে তিনি ইন্ সাফও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অতঃপর তিনি আদল ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করলেন। এ বিষয়টিই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ 'যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকিবে তাকে অতিশীঘ্র শাস্তি দিব।'[১৩২] কাতাদাহ (র) বলেন, এর অর্থ হলো তাকে হত্যা করে শাস্তি দিব। সুদ্দী (রহ.) বলেন, তামা গরম করে তাদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হতো এমন কি তারা এর মধ্যে গলে যেত। ওহাব ইবন মুনাব্বাহ (র) বলেন, যালিমদেরকে তাদের উপর লেলিয়ে দেয়া হতো অতঃপর তারা তাদের মহলে ও ঘরে প্রবেশ করত এবং চতুর্দিক হতে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলত। আল্লাহ তা'আলার বাণী: ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا 'অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে তখন তিনি তাকে চরম শাস্তি দান করবেন।[১৩৩] এ আয়াত দ্বারা পরকাল প্রমাণিত হল।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى 'আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমাদের আহ্বানের অনুসরণ করেছে তার জন্য

[১৩১] আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, ১৮ : ৮৬।
[১৩২] আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, ১৮ : ৮৭।
[১৩৩] আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, ১৮ : ৮৭।

পরকালে উত্তম বিনিময় রয়েছে।' وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا 'এবং আমিও তার সম্মান করব এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দান করব।'[১৩৪]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (৮৯) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (৯০) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا}

অর্থ: "আবার সে এক পথ ধরল, চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় হওয়ার স্থলে পৌঁছল তখন সে দেখল তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এই যার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।"[১৩৫]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যাস্তের স্থানে ভ্রমণ শেষে সূর্যোদয়ের স্থানের দিকে সফর শুরু করলেন এবং যে কোন সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে তিনি অতিক্রম করতেন তাদেরকে পরাজিত করে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তারা তার অনুসরণ করলে তো ভাল, নচেৎ তাদেরকে লাঞ্ছিত করতেন এবং তাদের মাল ধন-সম্পদ হালাল মনে করতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এত সংখ্যক খাদেম সাথে নিতেন যারা তার সেনাবাহিনীর সাহায্য করতে যথেষ্ট হতো। বনী ইসরাঈলদের সূত্রে জানা যায় যে, যুলকারনাইন এক হাজার ছয়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রচারার্থে পৃথিবী ভ্রমণ করতে থাকেন। এমনকি তিনি সুর্যাস্তের স্থান ও সূর্যোদয়ের স্থলে পৌছে যান। যখন তিনি সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছলেন যেমন ইরশাদ হয়েছে وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا 'তখন তিনি সূর্যকে এমন একটি কওমের উপর উদয় হতে দেখতে পেলেন যাদের জন্য সূর্যের কিরণ হতে আত্মরক্ষার জন্য কোন আবরণ সৃষ্টি করিনি।'[১৩৬] অর্থাৎ তাদের কোন ঘর ছিল না যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারত আর কোন গাছপালাও ছিল না যার ছায়ায় বসে সূর্যের উত্তাপ হতে আত্মরক্ষা করতে পারত। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, তারা লাল বর্ণের ছিল। উচ্চতা ছিল কম। তাদের সাধারণ খাবার ছিল মাছ।[১৩৭]

আবু দাউদ তায়ালেসী (রহ.) বলেন, আবুস সাত, হাসান বসরী (র) কে لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছেন তিনি বলেন, তাদের বসতি এমন ছিল যে সেখানে ঘর নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। সূর্যোদয় হলে তারা পানির মধ্যে চলে যেত। সূর্যাস্ত হলে বের হয়ে পড়ত এবং জীব-জন্ত যেমন চরিয়া বেড়ায় তারা তদ্রুপ চলে বেড়াত। হাসান (র) বলেন, রেওয়ায়েতটি সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত।[১৩৮]

---

[১৩৪] আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, ১৮ : ৮৮।
[১৩৫] আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, ১৮:৮৯-৯১।
[১৩৬] আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, ১৮:৯০।
[১৩৭] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৩।
[১৩৮] *তাফসীরে তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১৬তম খণ্ড, পৃ.১২।

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ঐ সম্প্রদায় এমন এক স্থানে বাস করত যেখানে কোন ফসল উৎপন্ন হত না। সূর্যোদয় হলে তারা পানির মধ্যে চলে যেত এবং সূর্যাস্ত হলে তারা বের হয়ে দূরে তাদের জমিতে চলে যেত। সালামাহ ইবনে কুহাইল (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা এমন একটি জাতি যাদের কোন আশ্রয় স্থল ছিল না। তাদের ছিল দু'টি বড় বড় কান। একটি তারা বিছানা হিসাবে ব্যবহার করিত এবং অপরটি তারা পরিধান করত। আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, মামার (র) কাতাদাহ (র) হতে বর্ণনা করেন আলোচ্য আয়াতের মধ্যে যে কওমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা জংলী ও বর্বর জাতি ছিল।[১৩৯]

ইবনে জারীর (রহ.) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তারা কখনও কোন ঘর কিংবা প্রাচীর নির্মাণ করে নাই এবং অন্য কোন লোকও ঘর নির্মাণ করে নাই। যখন সূর্যোদয় হতো তখন তারা পানির মধ্যে প্রবেশ করত এবং যতক্ষণ না সুর্যাস্ত যেত তারা সেখানেই অবস্থান করত। আর এর কারণ ছিল এই যে সেখানে কোন পাহাড়ও ছিল না যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারত। একবার সেখানে একটি সেনাদলের আগমন ঘটল তখন স্থানীয় লোকজন তাদেরকে বলল সাবধান। এ স্থানে যেন তোমাদের উপর সূর্যোদয় না হয়। তারা বলিল আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু তোমরা বল দেখি, এই হাড়সমূহ কিসের? তারা বলল, একবার একটি সেনাদল এখানে উপস্থিত হলে তাদের উপর সূর্যোদয় হয়েছিল। ফলে তারা এখানেই মৃত্যুবরণ করে। এই কথা শ্রবণ করতেই তারা দ্রুত চলে গেল।[১৪০]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا অর্থাৎ যুলকারনাইন এবং তার সেনাবাহিনীর যাবতীয় সংবাদ সম্পর্কে আমি অবগত, এর কিছুই আমার জন্য গোপন নয়। যদিও তার লোকজন দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। ইরশাদ হয়েছে لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ 'যমীনে ও আসমানে অবস্থিত কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নয়।'[১৪১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

অর্থ: "আবার সে এক পথ ধরল, চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারতেছিল না।"[১৪২]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যোদয়ের স্থান ভ্রমণ শেষ করে অন্য এক পথ ধরে চলতে লাগলেন এবং অবশেষে প্রাচীরের ন্যায় দু'টি পাহাড়ের নিকট পৌঁছলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে

---

[১৩৯] আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম ইবনে নাফী' আল-হুমায়রি আল-ইয়ামিনী আস-সনাআনী, *তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪৬।

[১৪০] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৪।

[১৪১] আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ০৫।

[১৪২] আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, ১৮ : ৯২-৯৩।

একটি গিরীপথ ছিল এই গিরীপথের মাধ্যমেই ইয়াজুজ মাজুজ তুরকিস্তানে প্রবেশ করিত। তারা সেখানে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিত। ক্ষেত খামার জীবজন্তু ও ধ্বংস করিত এবং মানুষকে হত্যা করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত তারা মানুষেরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ইরশাদ হয়েছে,

"إن الله تعالى يقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بَعْثَ النار. فيقول: وما بَعْثُ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمّتين، ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج".

অর্থাৎ, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামের অংশ আপনি পৃথক করে রাখুন। তিনি বলবেন, জাহান্নামের অংশ কি পরিমাণ? তিনি বললেন প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং একজন জান্নাতে। এ সময় শিশু বৃদ্ধ আতঙ্কগ্রস্ত হবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে তারা যে দিকে থাকবে তাদের সংখ্যাই হবে অধিক অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ।"[১৪৩]

২. আল্লাহ তা'আলা সূরা আল কাহাফের ৮৫ ও ৮৬নং আয়াতে বলেন,

فَأَتْبَعَ سَبَبًا (৮৫) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

অর্থ: 'চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছালো, তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখলো এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো।'[১৪৪]

এখানে '**حَمِئَةٍ**' অর্থ পঙ্কিল, কর্দমাক্ত। বাগবী লিখেছেন, একবার মুয়াবিয়া কাব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কীভাবে অস্তমিত হয়? তওরাতে তোমরা এ সম্পর্কে কোনো কিছু দেখেছো নাকি? তিনি বললেন, তওরাতে লেখা রয়েছে, সূর্য অস্তমিত হয় পানি ও কাঁদার মধ্যে। বায়যাবী লিখেছেন, সম্ভবতঃ যুলকারনাইন পৌঁছে গিয়েছিলেন কোনো মহাসাগরের পাড়ে এবং সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখেছিলেন মহাসাগরের অগাধ জলরাশির মধ্যে। তাঁর ওই দৃষ্টিকোনকেই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে এভাবে- সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখলো। কুতাইবিও এরকম বলেছেন।[১৪৫]

---

[১৪৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৫৩০; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২২২। উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা হাকেম আন-নিসাবুরী (রহ.) বলেন, শায়খাইনের শর্ত মোতাবেক এ হাদিসটি সহীহ। কিন্তু ইবনে কাসীর (রহ.) এর উল্লেখিত আলোচ্য হাদিসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম যাহবীও একই মত পোষণ করেন। [দ্র. *আল মুসতাদরাক*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৬১০।]

[১৪৪] আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৮৫-৮৬।

[১৪৫] আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল বায়যাবী, *তাফসিরুল বায়যাবী* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৪।

'সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো এ সম্পর্কে বায়যাবী লিখেছেন, ঐ মহাসমুদ্রের পাড়ে বাস করতো চামড়ার পোশাক পরিহিত একদল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে যে সকল মৃত মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী তটভূমিতে এসে আটকে যেতো, সেগুলোকেই ভক্ষণ করতো তারা।[১৪৬]

এরপর বলা হয়েছে 'আমি বললাম, হে জুল-কারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।' একথার অর্থ- আমি প্রত্যাদেশ করলাম, হে জুল-কারনাইন! তুমি ওই সম্প্রদায়কে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাও। যদি তারা তোমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদেরকে শাস্তি দাও। আর যদি তোমার আহ্বানকে গ্রহণ করে তারা ইমানদার হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি প্রদর্শন করো সদয় আচরণ। তাদেরকে শিক্ষা দাও আল্লাহর বিধান।[১৪৭]

এখানে 'ইম্মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'তাকসীম' (تقسيم) (ভেদ) এর জন্য। প্রত্যাখ্যানের জন্য নয়। যেমন এই আয়াতে 'আও' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাকসীমের (বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে) জন্য-

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে।"[১৪৮] অর্থাৎ, বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন রকম বিধান; যদি তারা তওবা করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করো; আর যদি তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর অনড় থাকে, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দান করো।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, এখানে 'ইম্মা' (إما) পদটি বিয়োজক অব্যয়। এক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়ে কর্তার ইচ্ছার স্বাধীনতা সন্নিহিত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ জুলকারনাইনকে এখানে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে তিনি ওই সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করতে পারবেন অথবা দিতে পারবেন সত্য ধর্মের দাওয়াত। কেউ কেউ বলেছেন, জুল-কারনাইনকে এখানে এই মর্মে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন অথবা করবেন বন্দী। হত্যা অপেক্ষা বন্দীত্বতো উত্তম। তাই শেষে বলা হয়েছে- অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।[১৪৯]

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে- 'সে বললো, যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিবো, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।' একথার অর্থ- আল্লাহ্ নির্দেশ পাওয়ার পর জুল-কারনাইন তাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং বললেন, আমার এই আহ্বান যে গ্রহণ করবে না, সে সীমালংঘনকারী। আমি তাকে শাস্তি দিবো।

---

[১৪৬] *তাফসিরুল বায়যাবী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৪।
[১৪৭] *তাফসীর আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৪।
[১৪৮] আল কুরআন, সূরা আল মায়িদাহ, ০৫ : ৩৩।
[১৪৯] *আত-তাফসীর আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৪।

কারণ সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। আর মৃত্যুদণ্ডের পরেও তাদের রক্ষা নেই। মৃত্যু-উত্তর জীবনে পুনরায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সরাসরি শুরু হবে কঠিনতর শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে 'তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।' এখানে 'ইউসরা' শব্দটির অর্থ সহজ বা নম্র। মুজাহিদ বলেছেন শব্দটির অর্থ উত্তম। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ জুল-কারনাইনকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের প্রতি নম্র আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরকম নির্দেশ সাধারণতঃ নবীদেরকে দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী।

وَالأَصَح يَكُنْ نَبِيًّا وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْإِلْهَامُ، إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ، يَعْنِي إِمَّا أَنْ تَقْتُلَهُمْ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ، وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً، يَعْنِي تَعْفُو وَتَصْفَحُ. وَقِيلَ: تَأْسِرُهُمْ فَتُعَلِّمُهُمُ الْهُدَى، خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ.

অর্থাৎ, প্রকৃত কথা এই যে তিনি নবী ছিলেন না। আলোচ্য আয়াত সমূহের নির্দেশগুলো তাঁকে প্রত্যাদেশ বা ওহীর মাধ্যমে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছিলো ইলহামের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহর অলীগণকে দেয়া হয়ে থাকে। আমি বলি, সম্ভবতঃ তিনি কোনো নবীর মাধ্যমে আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রত্যাদেশগুলো পেয়েছিলেন। অথবা কোনো নবী প্রত্যাদেশগুলোর দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন প্রতিনিধিরূপে। এভাবে তাঁকে নবীর প্রতিনিধি স্বরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিলো সত্য ধর্ম প্রচারের।[১৫০]

এর পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে- 'আবার সে এক পথ ধরলো।' একথার অর্থ জুলকারনাইন এবার যাত্রা করলেন অন্য এক রাজ্যের দিকে।

এর পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে 'চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছলো, তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরায় আমি সৃষ্টি করিনি।' একথার অর্থ- যুলকারনাইন এবার পথ চলতে শুরু করলেন পূর্ব দিকে। চলতে চলতে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন এক জনপদ। বিস্ময়ের সঙ্গে আরো দেখলেন জনপদবাসীদের শরীর ও সূর্যের মধ্যে কোনো আড়াল নেই। অর্থাৎ তাদের ঘরবাড়ী যেমন নেই, তেমনি নেই কোনো পোশাক আশাক। সভ্য সমাজের সঙ্গে তারা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত।[১৫১]

এর পরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে 'প্রকৃত ঘটনা এটাই'। একথার অর্থ- যুলকারনাইনের পশ্চিম ও পূর্বের এই অভিযানের মধ্যেই বিবৃত হয়েছে প্রকৃত কাহিনী। অর্থাৎ এজগতে তার কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীর উভয় প্রান্ত পর্যন্ত। অথবা কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে- তিনি পৃথিবীর

[১৫০] *তাফসীরুল বাগভী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২১৩।
[১৫১] *আত-তাফসীর আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৫।

পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসীদের সঙ্গে একই রকম আচরণ করেছিলেন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দিয়েছিলেন শাস্তি এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গে করেছিলেন সদয় আচরণ। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। আবার কথাটির মর্মার্থ এরকম হওয়া সম্ভব যে- পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে জুল-কারনাইন যেভাবে সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেছিলেন, সে রকমই কর্দমাক্ত জলধি থেকে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে সূর্যকে উদিত হতেও দেখেছিলেন তিনি। কিংবা মর্মার্থ হবে- পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তবাসীদের জন্য যেমন সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি, তেমনি অন্তরাল সৃষ্টি করিনি পূর্বপ্রান্তবাসীদের জন্যও। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা।[১৫২]

এরপর বলা হয়েছে 'তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।' একথার অর্থ- কেবল আমিই জানি জুল-কারনাইনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা। তার সেনাসংখ্যা, সমরাস্ত্র, ধনসম্পদ, তার জ্ঞানের পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে অন্য কেউই কোনো কিছু জানে না। জানি শুধু আমি।

এখানে 'أَحَطْنَا' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জুল-কারনাইনের বিপুল সংখ্যক সৈন্য, বিশাল সমরসম্ভার ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কথা।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে আর সে এক পথ ধরলো। একথার অর্থ জুল-কারনাইন এবার ধরলো নতুন এক পথ। চলতে শুরু করলো দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে 'চলতে চলতে সে যখন পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলো, তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পেলো, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না। এ কথার অর্থ- পথ চলতে চলতে জুলকারনাইন এবার এসে পৌঁছলেন দু'টি বৃহৎ পর্বতের মধ্যস্থলে। সেখানে দেখলেন অনেক লোকের বসবাস। কিন্তু তাদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করা হয়ে পড়লো কঠিন। কারণ তাদের ভাষা দুর্বোধ্য।

سُدٌّ (পেশ যোগে) ও سَدٌّ (যবর যোগে) শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ প্রাচীর বা প্রতিবন্ধক। ইকরামা বলেছেন, মানব নির্মিত প্রতিবন্ধককে বলে سَدٌّ এবং سُدٌّ বলে প্রাকৃতিক অন্তরায়কে। এখানে 'سَدَّيْنِ' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দুই বৃহৎ পর্বতের মধ্যবর্তী ওই স্থানকে, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন একটি সুবৃহৎ প্রাচীর। উল্লেখ যে, ওই সুবৃহৎ প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিলো আর্মিনিয়া ও আজারবাইজানে। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন মন্তব্য করেছেন, তুরস্কের শেষ প্রান্তে রয়েছে দু'টি বৃহৎ পর্বতমালা। ওই পর্বতমালার অপর পাশে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজদের বসবাস। আলোচ্য আয়াতে ওই পর্বতমালার কথাই বলা হয়েছে। এই মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন সাঈদ ইবনে

[১৫২] *আত-তাফসীর আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৫।

মানসুর তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের স্বীয় তাফসীরে।[১৫৩]

'مِنْ دُوْنِهِمَا' অর্থ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে। لَا يَفْقَهُونَ قَوْلًا অর্থ: যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের কথা অন্য অঞ্চলের লোক বুঝতো না। তারাও বুঝতো না অন্য এলাকার লোকের ভাষা।[১৫৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, যুলকারনাইনের রাজত্বকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও তাঁর রাজত্বকাল ছিল তাওহীদ নির্ভর। অর্থাৎ তিনি তাঁর শাসনকালে (ষোলশ' বছর বা তিন হাজার বছর কিংবা ষোল বছর) সমগ্র পৃথিবীর লোকদের আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবান করেছেন। হাদীসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় যে, 'পৃথিবী শাসন করেছে এমন চারজন বাদশাহ রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম দু'জন হলেন সুলায়মান ইবনে দাউদ ও যুলকারনাইন।' সুতরাং একথা পরিস্কার ভাবে বলা যায় যে, যুলকারনাইনের রাজ্যের পরিধি ছিল সমগ্র পৃথিবী।

[১৫৩] *আত-তাফসীর আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৫।
[১৫৪] প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৫।

পঞ্চম অধ্যায়
যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কুরআন ও হাদিসে ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রসঙ্গ
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইয়াজুজ-মাজুজ দমনে যুলকারনাইন এর ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে ইয়াজুজ-মাজুজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিকগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি ইসরাঈলি বর্ণনাতেও ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। মূলত যুলকারনাইনের বিশ্ব পরিভ্রমণ নিয়ে আলোচনা করতে হলে 'ইয়াজুজ-মাজুজ' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে দাঁড়ায়। ইতিহাসবেত্তাগণ তাদের পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তা হলো:

ইয়াজুজ-মাজুজ পরিচিতি

ইয়াজুজ (**يأجوج**) ও মাজুজ (**مأجوج**) শব্দ দু'টি অনারবী। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দ দু'টি আরবী। আরববাসীরা বলে থাকে 'আজুজ জুলমু।' অর্থাৎ 'আসরাউ' (দ্রুতগতিসম্পন্ন)।[১]

وهما لغتان أصلهما من أجيج النار وهو ضوؤها وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم

অর্থাৎ, "ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দু'টোর উৎকলন ঘটেছে 'আজীজুন্ নার' থেকে। আজীজুন্ নার অর্থ অগ্নিকুণ্ড, অগ্নি-দহন; ক্ষতিগ্রস্ততা। ইয়াজুজ মাজুজেরা ছিলো অসংখ্য। তাই তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে আগুনের ঝলক, অগ্নিকুণ্ড এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে।"[২]

إنَّ يَأْجُوج وَمَأْجُوج" بالهَمْز وَتَرْكه : هُمَا اسْمَانِ أَعْجَمِيَّانِ لِقَبِيلَتَيْنِ فَلَمْ يَنْصَرِفَا

অর্থাৎ, "يأجوج ও **مأجوج** শব্দ দুটি হামযাসহ ও হামযা ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত হয়েছে। এটা অনারব দু'টি গোত্রের নাম। **علم** ও **عجمة** এর কারণে শব্দ দুটি غير منصرف হয়েছে।"[৩]

هم من أولاد يافث بن نوح. قال الضحاك: هم جيل من الترك. قال السدي: الترك سرية من يأجوج ومأجوج، خرجت فضرب ذو القرنين السد [فبقيت خارجه، فجميع الترك منهم. وعن قتادة: أنهم اثنان وعشرون قبيلة، بنى ذو القرنين السد] على إحدى وعشرين قبيلة فبقيت قبيلة واحدة فهم الترك سموا الترك لأنهم تركوا خارجين.

অর্থাৎ, "তারা নূহের (আ.) পুত্র ইয়াফেসের বংশধর। দাহহাক বলেছেন, তারা তুর্কী বংশোদ্ভূত। সুদ্দী বলেছেন, তুর্কী ইয়াজুজের একটি সেনাদল ছিলো ওই এলাকায়। যুলকারনাইন সেখানে পৌঁছলে তারা ওই দুই পর্বতমালার ওপারে সরে যায়। সকল তুর্কী তাদেরই বংশধর। কাতাদা বলেছেন, ইয়াজুজদের শাখা গোত্র ছিলো বাইশটি। যুলকারনাইন যখন সেখানে প্রাচীর নির্মাণ করলেন, তখন একটি গোত্র রইল

---

[১] *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ.৩২৬।

[২] *তাফসীরুল বাগভী*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২০২।

[৩] *তাফসীরে জালালাইন*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২৪৫।

এপারে। আর ওপারে আটকা পড়ে গেলো অবশিষ্ট একুশটি গোত্র। এপারের গোত্রটি তুর্কী। কেননা ইয়াজুজদের মূল জনগোষ্ঠী এদেরকে ত্যাগ করেছিলো। এভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার কারণেই এদের নাম হয়েছে তুর্কী।"[৪]

ইয়াজুজ-মাজুজের উৎপত্তি ও বিকাশঃ

وقد حكى النووي، رحمه الله، في شرح "مسلم" عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج **خلقوا من ماء خرج من آدم فاختلط بالتراب، فخلقوا من ذلك**. فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم، وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جدًا، [ثم] لا دليل عليه لا من عقل ولا [من] نقل، ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب، لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم.

অর্থাৎ, "আল্লামা নববী (রহ.) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কিছু লোক থেকে বর্ণনা করেছেন। আদম (আ) এর ধাতু হতে দুই এক ফোঁটা ধাতু মাটিতে মিশ্রিত হয়েছিল তা দ্বারাই ইয়াজুজ মাজুজ সৃষ্টি হয়েছে।[৫] এই বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ মাজুজ আদম (আ.) এর ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু হাওয়া (আ.) এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেনি। এটা অত্যন্ত দুর্বল মত। এ বর্ণনাটির পক্ষে আকলী কিংবা নকলী কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। কোন কোন আহলে কিতাব এ প্রসঙ্গে যা কিছু বর্ণনা করে থাকে এর উপর বিশ্বাস করা যায় না।"[৬]

وفي مسند الإمام أحمد، عن سَمُرَة؛ أن رسول الله قال: "وَلَدُ نوح ثلاثة:سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك". قال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبي الترك، قال: [إنما سموا هؤلاء ترگا؛ لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك، ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثرًا طويلا عجيبًا في سير ذي القرنين، وبنائه السد، وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم، [وطولهم] وقصر بعضهم، وآذانهم. وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدها، والله أعلم.

অর্থাৎ, "ইমাম আহমদ (রা) সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিল। আরব জনক, সাম, সুদান জনক হাম এবং তুর্ক জনক ইয়াফিস।[৭] কোন কোন উলমায়ে কিরামের বক্তব্য হল, ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হল তুর্ক জনক ইয়াফিসের বংশধর। তুরকিস্তানের অধিবাসীদেরকে তুর্ক-বলে এ কারণে নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু তারা প্রাচীরের ঐ পারের সম্প্রদায়কে বর্জন করে এপারে চলে এসেছে। বস্তুতঃ তারা ঐ ইয়াজুজ মাজুজের আত্মীয়স্বজন। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হল দুষ্ট ও অশান্তি সৃষ্টিকারী। এ ক্ষেত্রে ইবনে জারীর (র) ও ইবনে

---

[৪] *তাফসীরুল বাগভী*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২০২।

[৫] ইহইয়া ইবনে সরফ আন-নববী মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া, *আল-মানাহিজ ফী শরহি সহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ* (লন্ডন: মুআসসাসাতু কুরতুবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ.৯৭।

[৬] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৫।

[৭] *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৯।

মুনাব্বাহ (রা) হতে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুকারনাইনের আশ্চার্য ভ্রমণ কাহিনী, প্রাচীর নির্মাণ ও তাঁর পর্যটন কালের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ এই রেওয়ায়েতটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বটে কিন্তু তা বিশুদ্ধ নয়।[৮] ইবনে আবূ হাতিম (র) তার পিতা থেকেও অনেক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু এর সনদও সহীহ নয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।"[৯]

"ইয়াজুজ-মাজুজ কয়েকটি গোত্রের সমষ্টি; তারা শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকে এক আশ্চর্যজনক ও অভিনব জীবনের অধিকারী। যেমন : তাদের দেহের উচ্চতা এক বিঘত বা দেড় বিঘত, বেশি থেকে বেশি হলে এক হাত। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি দীর্ঘকায়; তাদের কান দুটি এত বড় যে, একটি চাদর আর অপরটি বিছানার কাজ দেয়। তাদের চেহারা চওড়া-চ্যাপ্টা, দেহের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। আল্লাহ তাআলা তাদের খাদ্যের জন্য বছরে দুইবার সাগর থেকে বড় বড় মাছ বের করে নিক্ষেপ করেন। মাছগুলোর লেজ ও মাথার দূরত্ব এত দীর্ঘ যে, কোন একজন দশদিন ও দশরাত একাধারে চলার পরই এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। অথবা, তাদের খাদ্য একটি সাপ, যা প্রথমে আশপাশের যাবতীয় স্থলচর প্রাণীকে হজম করে ফেলে। তারপর আল্লাহ তাআলা সাপটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, ফলে সাপটি সাগরের কয়েক মাইল পর্যন্ত যাবতীয় সামুদ্রিক জীব-জন্তু খেয়ে ফেলে। তারপর আকাশে বিশাল মেঘ জমা হয় আর ফেরেশতা অতিকায় সাপটিকে ওই মেঘের ওপর রেখে দেন। মেঘ সাপটিকে গোত্রগুলোর মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দেয়। তা ছাড়া ইয়াজুজ-মাজুজ এক ধরনের বারযাখি[১০] জীব; তারা আদম (আ.) এর ঔরসজাত হলেও হাওয়া আ.-এর গর্ভজাত নয়।[১১]

وروي أن عيسى عليه السلام إذا نزل بالبيت المقدس ليقتل الدجال عندها يظهر يأجوج ومأجوج وهم أربع وعشرون أمة لا يجتازون بحي ولا ميت من إنسان إلا أكلوه ولا ماء إلا شربوه فيجتاز أولهم ببحيرة طبرية فيشربون جميع ما فيها ثم يجتاز الأخير منهم وهي ناشفة فيقول أظن أنه قد كان ههنا ماء ثم يجتمعون بالبيت المقدس فيفزع عيسى ومن معه من المؤمنين فيعلو على الصخرة ويقوم فيهم خطيبا فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول اللهم انصر القليل في طاعتك على الكثير في معصيتك فهل من منتدب فينتدب رجل من جرهم ورجل من غسان لقتالهم ومع كل واحد خلق من عشيرته فينصرهم الله عليهم حتى يبيدوهم ولهذا الخبر مع استحالته في العقل نظائر جمة في كتب **الناس و لله أعلم**

قيل إن يأجوج ومأجوج ابنا يافث بن نوح عليه السلام وهما قبيلتان من خلق جاءت القراءة فيهما بهمز وبغير همز وهما اسمان أعجميان واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من أجت النار ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة المحرق من ملوحته ويكون التقدير يفعول ومفعول ويجوز أن يكون يأجوج فاعولا وكذلك مأجوج قال هذا لو كان الأسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما فأما

---

[৮] *তাফসীরে তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১৬তম খণ্ড, পৃ.১৪।

[৯] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৫।

[১০] বারযাখ শব্দের অর্থ আড়াল, অন্তরাল, পর্দা এবং মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশ।

[১১] *মু'জামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

الأعجمية فلا تشق من العربية وروي عن الشعبي أنه قال سار ذو القرنين إلى ناحية يأجوج ومأجوج فنظر إلى أمة صهب الشعور زرق العيون فاجتمع إليه منهم خلق كثير وقالوا له أيها الملك المظفر إن خلف هذا الجبل أمما لا يحصيهم إلا الله وقد أخربوا علينا بلادنا يأكلون ثمارنا وزروعنا قال وما صفتهم قالوا قصار صلع عراض الوجوه قال وكم صنفا هم قالوا هم أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى قال وما أساميهم قالوا أما من قرب منهم فهم ست قبائل يأجوج ومأجوج وتاويل وتاريس ومنسك وكمارى وكل قبيلة منهم مثل جميع أهل الأرض وأما من كان منا بعيدا فإنا لا نعرف قبائلهم وليس لهم إلينا طريق فهل نجعل لك خرجا على أن تسد عليهم وتكفينا أمرهم قال فما طعامهم قالوا يقذف البحر إليهم في كل سنة سمكتين يكون بين رأس كل سمكة وذنبها مسيرة عشرة أيام أو أكثر قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة تبذلون لي من الأموال في سده ما يمكن كل واحد منكم ففعلوا ثم أمر بالحديد فأذيب وضرب منه لبنا عظاما وأذاب النحاس ثم جعل منه ملاطا لذلك اللبن وبنى به الفج وسواه مع قلتي الجبل فصار شبيها بالمصمت وفي بعض الأخبار قال السد طريقة حمراء وطريقة سوداء من حديد ونحاس ويأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة منهم الترك قبيلة واحدة كانت خارج السد لما ردمه ذو القرنين فسلموا أن يكونوا خلفه وسار ذوي القرنين حتى توسط بلادهم فإذا هم على مقدار واحد ذكرهم وأنثاهم يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف طول الرجل المربوع لهم مخاليب في مواضع الأظفار ولهم أضراس وأنياب كأضراس السباع

وعن النبي أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد البيت المقدس وإن الصلاة في بيت المقدس خير من ألف صلاة في غيره وأقرب بقعة في الأرض من السماء البيت المقدس ويمنع الدجال من دخولها ويهلك يأجوج ومأجوج دونها.....

উক্ত রেওয়ায়েতগুলো উদ্ধৃত করে আল্লামা ইয়াকুত হামাবি রহ. তাঁর গ্রন্থ 'মুজামুল বুলদানে' একটি মন্তব্য তুলে ধরেছেন। তা হলো:

ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات فيه والله أعلم بصحته وعلى كل حال فليس في صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز

অর্থাৎ, "আমি যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছি সেগুলোর ভিন্নতা ও পার্থক্যের ফলে কিছুতেই আমি সেগুলোর বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করতে পারি না। রেওয়ায়েতগুলো শুদ্ধ না অশুদ্ধ সে ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে সর্বাবস্থায় (বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে) প্রাচীরের বিষয়টি বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। মহাগ্রন্থ কুরআন মাজিদে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।"[১২]

ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর ও তাদের সংখ্যা:

قال أهل التواريخ: أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث، فسام أبو العرب والعجم والروم، وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة، ويافث أبو الترك والخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج، قال ابن عباس في

[১২] *মু'জামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২০০।

رواية عطاء: هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء. روي عن حذيفة مرفوعا: إن يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة أربعمائة ألف أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح وهم من ولد آدم يسيرون إلى خراب الدنيا. وقيل: هم ثلاثة أصناف، صنف منهم أمثال الأرز شجر بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماء، وصنف منهم عرضه وطوله سواء، عشرون ومائة ذراع، وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد، وصنف منهم يفترش أحدهم [إحدى أذنيه] ويلتحف الأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه ومن مات منهم. أكلوه، مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشارق وبحيرة طبرية. **وعن علي** أنه قال: منهم من طوله شبر ومنهم من هو مفرط في الطول.

অর্থাৎ, ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নুহের ছিলো তিন পুত্র সাম, হাম, ইয়াফেস। আরব, অনারব ও রোমের অধিবাসীরা সামের বংশধর। আবিসিনিয়া, জুনাজ ও নাওবার অধিবাসীরা হচ্ছে হামের বংশধর। আর ইয়াফেসের বংশধরেরা হচ্ছে তুর্কী, খুজর, সাক্বালিবাহ ও ইয়াজুজ-মাজুজ। আতার বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে ইয়াজুজ মাজুজদের সংখ্যা দশগুণ বেশী। মারফু সূত্রে হুযায়ফা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইয়াজুজ ও মাজুজ ভিন্ন ভিন্ন দু'টো সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা চার লক্ষ। তারাও বাবা আদমের বংশভূত। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মরে না, যতক্ষণ না তাদের বংশের একহাজার সন্তান অস্ত্রধারণের উপযোগী হয়। তারা পৃথিবীর অনাবাদী অঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়বে। কেউ কেউ বলেছেন, ইয়াজুজ মাজুজেরা তিনভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর ইয়াজুজ মাজুজ সামের আরজ বৃক্ষের সমান লম্বা। অর্থাৎ তাদের উচ্চতা একশত বিশ হাত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য একশত বিশ হাত। প্রস্থও তাই। তাদের আঘাতে পাহাড় ও লৌহা স্বস্থানে স্থির থাকতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর ইয়াজুজ মাজুজেরা তাদের একটি কান বিছিয়ে দেয় এবং আরেকটি কান নড়া চড়া করতে থাকে। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তারা বের হয়ে এসে ঘোড়া, শুকর এবং বন্য জন্তুসমূহ খেয়ে ফেলবে। মৃত জীবিত কোনো কিছু বাছ বিচার করবে না। তাদের অগ্রবর্তী দল যখন সিরিয়ায় পৌঁছবে, তখন পশ্চাদবর্তী দল থাকবে খোরাসানে। তারা পান করবে পশ্চিমের সাগর ও তাবারি সাগরের পানি (Sea of Galilee)।[১৩] বাগবী আরো লিখেছেন, আলী (রা.) বলেছেন, তাদের কারো কারো উচ্চতা হবে এক বিঘত এবং প্রস্থ হবে এক হাত। আবার কেউ কেউ হবে এর চেয়ে অধিক লম্বা।[১৪]

وَتَقَدَّمَ فِي الحَدِيثِ المَرْوِيِّ فِي " المُسْنَدِ " و " السُّنَنِ ": أَنَّ نُوحًا وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ ; وَهُمْ سَامٌ، وَحَامٌ، وَيَافِثُ، فَسَامٌ أَبُو العَرَبِ، وَحَامٌ أَبُو السُّودَانِ وَيَافِثُ أَبُو التُّرْكِ، فَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ طَائِفَةٌ **مِنَ التُّرْكِ**، وَهُمْ مَغْلُ المَغُول، وَهُمْ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَكْثَرُ فَسَادًا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَنِسْبَتُهُمْ إِلَيْهِمْ كَنِسْبَةِ هَؤُلَاءِ إِلَى غَيْرِهِمْ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ التُّرْكَ إِنَّمَا سُمُّوا بِذَلِكَ حِينَ بَنَى ذُو **القَرْنَيْنِ** السَّدَّ وَأَلْجَأَ يَأْجُوجَ **وَمَأْجُوجَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ**، فَبَقِيَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ كَفَسَادِهِمْ فَتُرِكُوا مِنْ وَرَائِهِ. فَلِهَذَا قِيلَ لَهُمُ: التُّرْكُ.

---

[১৩] *আদ-দুররুল মানসুর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৪৫৭।

[১৪] *তাফসীরুল বাগভী*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২০২।

অর্থাৎ, মুসনাদ ও সুনান এর বরাতে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, নূহ (আ.) তিন পুত্র ছিলেন সাম, হাম ও ইয়াফিছ। এদের মধ্যে সাম হচ্ছেন আরবদের পূর্বপুরুষ, হাম সুদানীদের পূর্বপুরুষ এবং ইয়াফিছ তুর্কীদের পূর্বপুরুষ। সুতরাং ইয়াজুজ-মাজুজ তুর্কীদেরই গোত্র। এরা মোঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত। দুর্ধর্ষতা এবং ধ্বংস সাধনে এরা মোঙ্গলদের অন্যান্য শাখার তুলনায় অগ্রগামী। সাধারণ মানুষের তুলনায় মোঙ্গলদের যে অবস্থান; সাধারণ মোঙ্গলদের তুলনায় ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থা তদ্রূপ। কথিত আছে, তুর্কীদের এরূপ নাকরণের কারণ হল বাদশাহ যুলকারনাইন যখন তাঁর ঐতিহাসিক প্রাচীর তৈরি করেন, তখন ইয়াজুজ-মাজুজকে ঐ প্রাচীরের পেছনে থাকতে বাধ্য করেন। ওদের একটি গোত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীরের এদিকে রয়ে গিয়েছিল। এদের দুর্ধর্ষতা পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ের ছিল না। ওদেরকে প্রাচীরের এ পাশে রেখে দেয়া হয়েছিল। তাই তাদের নাম হয়েছে তুর্ক বা পরিত্যক্ত।[১৫]

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ خُلِقُوا مِنْ نُطْفَةِ آدَمَ حِينَ احْتَلَمَ، فَاخْتَلَطَتْ بِتُرَابٍ فَخُلِقُوا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ حَوَّاءَ، فَهُوَ قَوْلٌ حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَاوِيُّ، فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ " وَغَيْرِهِ، وَضَعَّفُوهُ، وَهُوَ جَدِيرٌ بِذَلِكَ ; إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ، بِنَصِّ الْقُرْآنِ. وَهَكَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ عَلَى أَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَطْوَالٍ مُتَبَايِنَةٍ جِدًّا ; فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ كَالنَّخْلَةِ السَّحُوقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ غَايَةٌ فِي الْقِصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَرِشُ أُذُنًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَيَتَغَطَّى بِالْأُخْرَى، فَكُلُّ هَذِهِ أَقْوَالٌ بِلَا دَلِيلٍ، وَرَجْمٌ بِالْغَيْبِ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ.

অর্থাৎ, ধারণা করা হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সৃষ্টি আদম (আ.) এর স্বপ্নদোষকালীন বীর্য থেকে। ঐ বীর্য মাটির সাথে মিলিত হয় এবং তা থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা হাওয়া (আ.) এর গর্ভজাত সন্তান নয়। শায়খ আবু যাকারিয়া নববী সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং এ বক্তব্য যথার্থভাবেই দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ এর পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই। বরং কুরআনের আয়াত দ্বারা আমরা যা প্রমাণ করেছি যে, এ যুগের সকল মানুষই নূহ (আ.) এর বংশধর, উপরোক্ত বক্তব্য তার বিপরীত। যারা ধারণা পোষণ করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের অবয়ব বিভিন্ন প্রকারের এবং শারীরিক দৈর্ঘ্যে তাদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান বিস্তর। কতক হল সুদীর্ঘ খেজুর গাছের মত, আর কতক একেবারে খাটো। তাদের কতক এমন যে, এক কান বিছিয়ে অপর কান দিয়ে নিজেকে ঢেকে নেয়। এ সব উক্তির কোন প্রমাণ নেই, এগুলো নেহায়েত কাল্পনিক উক্তি।[১৬]

উক্ত বিচিত্র ও অভিনব বক্তব্যের খণ্ডন:

وَوَقَعَ فِي " فَتَاوَى الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين " يَأْجُوج وَمَأْجُوج مِنْ أَوْلَاد آدَم لَا مِنْ حَوَّاء عِنْدَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء فَيَكُون إِخْوَاننَا لِأَبٍ كَذَا قَالَ وَلَمْ نَرَ هَذَا عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف إِلَّا عَنْ كَعْب الْأَحْبَار ، وَيَرُدّهُ الْحَدِيث الْمَرْفُوع أَنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّة نُوح وَنُوح مِنْ ذُرِّيَّة حَوَّاء قَطْعًا.

[১৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৫৩।

[১৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৫৩।

অর্থাৎ, "শায়খ আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন নববি (রহ.) এর ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে ইয়াজুজ-মাজুজ আদম আ. এর ঔরসজাত হলেও হযরত হাওয়া আ.-এর গর্ভজাত নয়। এইভাবে তারা আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই হয়েছে। কিন্তু আমার পূর্ববর্তী সময়ের উলামায়ে কিরামের মধ্যে কাব আল-আহবার ব্যতীত অন্য কারো থেকে এ ধরনের বক্তব্য পাই নি। তবে মারফু হাদিস এই বক্তব্যকে খণ্ডন করেছে এভাবে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ নূহ (আ.) এর বংশধর এবং নুহ আ. নিশ্চিতভাবে হাওয়া আ.-এর বংশধর।"[১৭]

وَقَدْ أَشَارَ النَّوَوِيّ وَغَيْرِه إِلَى حِكَايَة مَنْ زَعَمَ أَنَّ آدَم نَامَ فَاحْتَلَمَ فَاخْتَلَطَ مَنِيّه بِتُرَابٍ فَتَوَلَّدَ مِنْهُ وَلَد يَأْجُوج وَمَأْجُوج مِنْ نَسْله ، وَهُوَ قَوْل مُنْكَر جِدًّا لَا أَصْل لَهُ إِلَّا عَنْ بَعْض أَهْل الْكِتَاب.

অর্থাৎ, "ইমাম নববি ও অন্য উলামায়ে কেরাম ওই ব্যক্তির বর্ণিত কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যিনি দাবি করেছেন, আদম (আ.) ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন তাঁর স্বপ্নদোষ হয়। তাঁর বীর্যের বিন্দুগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তা থেকে আদম আ. এর ঔরসে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্ম হয়। এই বক্তব্য অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য এবং তার কোনো ভিত্তি নেই। তবে আহলে কিতাবের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) কারো কারো থেকে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।"[১৮]

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْأَقْوَالُ فِيهِمْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ نَوْعٌ مِنَ التُّرْكِ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَفِيهِمْ شَرٌّ، وَهُمْ كَثِيرُونَ، **وَكَانُوا** يُفْسِدُونَ فِيمَا يُجَاوِرُهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَيُخَرِّبُونَ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْبِلَادِ، وَيُؤْذُونَ مَنْ **يَقْرُبُ** مِنْهُمْ.

অর্থাৎ, "ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে মতভেদপূর্ণ অনেক বক্তব্য আছে। বিশুদ্ধ বক্তব্য এই যে, তারা তুর্কিদের একটি শাখা। তাদের শক্তি যেমন ছিলো, তেমনি তাদের মধ্যে অরাজকতাও ছিলো। তারা ছিলো অসংখ্য। তারা তাদের আশপাশের এলাকায় অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো। যেসব দেশে তারা সক্ষম হতো সেসব দেশকে তারা বিরানভূমিতে পরিণত করে ছাড়তো। তারা প্রতিবেশীদের উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা দিতো।"[১৯]

إن يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه وغيره واعتمده كثير من المتأخرين.

অর্থাৎ, "ইয়াজুজ ও মাজুজ ইয়াফেস বিন নুহ আ. এর বংশধর থেকে দুটি গোত্র। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও অন্য উলামায়ে কেরাম এ বিষয়েই দৃঢ় মত পোষণ করেন। পরবর্তীকালের অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতও এটিই।"[২০] অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন,

---

[১৭] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ১৩তম খণ্ড, পৃ.১০৭।

[১৮] *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ.১২৯।

[১৯] আয উদ্দিন ইবনে আসীর, *আল-কামিল ফিত তারিখ* (বৈরূত: দারুল কিতাবীল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ.২৫২।

[২০] *রুহুল মা'আনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানি*, প্রাগুক্ত, ১৬তম খণ্ড, পৃ.৩৮।

أخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق السدي من أثر قوى الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج.

অর্থাৎ, ইবনে জারির ও ইবনে মারদুইয়্যাহ সুদ্দির সূত্রে একটি শক্তিশালী রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, তুর্কিরা ইয়াজুজ ও মাজুজের শাখাসমূহ থেকে একটি শাখা।"[২১]

"ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের উৎসমূলের দিক থেকে ইয়াফেস বিন নুহ আ.-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। এই নামটি أجيج النار শব্দ থেকে গৃহীত। শব্দটির অর্থ অগ্নিশিখা বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এতে তাদের শক্তিমত্তা ও সংখ্যাধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কোনো কোনো গবেষক ইয়াজুজ ও মাজুজের বংশমূল সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন, মোগল (মঙ্গোলিয়ান) ও তাতারদের বংশধারা তুর্ক নামক এক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আর এই ব্যক্তিকেই আবুল ফিদা মাজুজ বলা হয়। সুতরাং, এ থেকে জানা গেলো যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মঙ্গোলিয়ান ও তাতার গোত্রসমূহ। এই গোত্রগুলোর বিস্তার এশিয়ার উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে তিব্বত ও চীন হয়ে মুহিতে মুনজামিদ পর্যন্ত চলে গেছে। আর পশ্চিমদিকে তুর্কিস্তানের অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ফাকিহাতুল খুলাফা ওয়া মাফাকিহাতু যুরাফা, ইবনে মাসকুইয়াহর তাহযিবুল আখলাক এবং রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা এসব গ্রন্থের রচয়িতাগণ সবাই এ কথাই বলেছেন যে, এই গোত্রগুলোকেই ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হয়।"[২২]

ইয়াজুজ ও মাজুজের আবাসস্থল এবং তাদের ভৌগলিক অবস্থান:

وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ من الترك وهم قفجاق، وبلاد الشركس منهم أيضاً. وفي الشرق منه بلاد يأجوج يفصل بينهما جبل قوقيا المحيط، وقد مر **ذكره**، يبدأ من البحر المحيط في شرق الإقليم الرابع ويذهب معه إلى آخر الإقليم في الشمال، ويفارقه مغرباً وبانحراف إلى الشمال حتى يدخل في الجزء التاسع من الإقليم الخامس، فيرجع إلى سمته الأول حتى يدخل في هذا الجزء التاسع من الإقليم من جنوبه إلى شماله بانحراف إلى **المغرب**، وفي وسطه ههنا السد الذي بناه الأسكندر، ثم يخرج على سمته إلى الإقليم السابع وفي الجزء التاسع منه، فيمر فيه إلى الجنوب إلى أن يلقى البحر المحيط في شماله، ثم ينعطف معه من هنالك مغرباً إلى الإقليم السابع إلى الجزء الخامس منه، فيتصل هنالك بقطعة من البحر المحيط في غربيه. وفي وسط هذا الجزء التاسع هو السد الذي بناه الأسكندر كما قلناه. والصحيح من خبره في القرآن، وقد ذكر عبد الله بن خرداذبه في كتابه في الجغرافيا أن الواثق رأى في منامه كأن السد انفتح فانتبه فزعاً، وبعث سلاماً الترجمان، فوقف عليه، وجاء بخبره، ووصفه في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا.

---

[২১] *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, ১৬তম খণ্ড, পৃ.৩৮।

[২২] আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী, *জাওয়াহিরুল কুরআন* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউল উলুম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), ৯ম খণ্ড, পৃ.১৯৯।

وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد مأجرج متصلة فيه إلى آخره على قطعة من هنالك من البحر المحيط أحاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في الشرق.

অর্থাৎ, "এই অঞ্চলের নবম অংশের পশ্চিম প্রান্তে তুর্কিদের খিফশাখ গোত্রের আবাসভূমি। তাদেরকে ক্বিফজাকও বলা হয়। তুর্কিদের শারকাস গোত্রের এলাকাও এখানেই। আর পূর্ব প্রান্তে ইয়াজুজ ও মাজুজের আবাসভূমি। আর এই দুটির মধ্যস্থলে কোহেকাফ পৃথককারী সীমা। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা আটলান্টিক সাগর থেকে শুরু হয়েছে, (আটলান্টিক সাগর পৃথিবীর চতুর্থ অংশে অবস্থিত), এর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে সপ্তমাংশের শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। আর আটলান্টিক সাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক হয়ে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পঞ্চমাংশের নবমাংশে প্রবেশ করে। এখান থেকে পুনরায় নিজের প্রথম প্রান্তের দিকে ঘুরে যায়। এমনকি সপ্তমাংশের নবমাংশে প্রবেশ করে, এখানে পৌঁছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিক হয়ে চলে যায়। এই পর্বতশ্রেণির মধ্যস্থলে সিকান্দারের প্রাচীর অবস্থিত। আর সপ্তমাংশের নবমাংশের মধ্যভাগেই ওই সিকান্দারি প্রাচীর অবস্থিত, যার উল্লেখ আমরা এইমাত্র করলাম এবং যার সম্পর্কে কুরআন মাজিদও সংবাদ দিয়েছে। আর আবদুল্লাহ বিন খারদাযাবাহ তাঁর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থে আব্বাসি খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহর স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াসিক বিল্লাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, দেয়ালটি খুলে গেছে। তিনি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠলেন এবং সালাম তরজুমানকে অবস্থা জেনে আসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সালাম ফিরে এসে ওই দেয়ালের অবস্থা ও অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করলেন।" আর সপ্তমাংশের দশমাংশে ইয়াজুজ ও মাজুজের বসতিগুলো অবস্থিত। তা অবিচ্ছিন্নভাবে শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। এই অংশটুকু আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। যা তার উত্তরপূর্ব অংশকে এভাবে বেষ্টন করে রয়েছে যে, দৈর্ঘ্যে উত্তর দিকে চলে গেছে আর কতক প্রস্থে পূর্বাংশে গেছে।"[২৩]

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গে নানাবিধ বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে তাদের কতেক অতিশয় দৈর্ঘ্য, আবার কতেক অতিশয় খাটো। কতেকের কান মাটি পর্যন্ত লেগেছে কিংবা কানকে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি বর্ণনাগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা। সঠিক তথ্যটি উপস্থাপন করতে হলে ইবনে কাসীর (রহ.) এর নিম্নোক্ত অভিমতটি খুবই প্রনিধানযোগ্য। তা হলো:

الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ وَعَلَى أَشْكَالِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ» وَهَذَا فَيْصَلٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ.

অর্থাৎ, "সঠিক মত হল এই যে, তারা আদম (আ.) এর বংশধর এবং তাদের আকৃতি-প্রকৃতিও সাধারণ মানুষের ন্যায়ই। নবী করিম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তার দৈর্ঘ ছিল ষাট

[২৩] *মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০।

হাত। তারপর মানুষ ক্রমান্বয়ে খাটো হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।" এ বিষয়ে এটিই চূড়ান্ত ফয়সালা।"[২৪]

সুতরাং নামকরণের এই কারণটিকে একটি আশ্চার্যজনক বিষয় হিসেবেই মনে হয়। তারপরও এ থেকে এ কথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, সভ্য সম্প্রদায়গুলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের পর তাদের সমবংশীয় কেন্দ্রভূমির গোত্রগুলোর সঙ্গে অপরিচিত হয়ে যেতো এবং তাদেরকে আর ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হতো না। ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দুটি কেবল ওইসব গোত্রের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যারা তাদের কেন্দ্রভূমিতে আগের মতোই জংলি বর্বর ও হিংস্র অবস্থায় থেকে গিয়েছিলো।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আল-কুরআনে যে 'ইয়াজুজ-মাজুজের' কথা বলা হয়েছে, সে ইয়াজুজ-মাজুজ কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার স্বীয় ইচ্ছায় দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে। এ সম্পর্কে বর্তমান সময়ের নানা জনগোষ্ঠির কথা মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবেত্তা ও গবেষকগণ উপস্থাপন করেছেন। তা প্রত্যেকেরই নিজস্ব অভিমত। আল-কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা মতে, তারা কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে দাজ্জালের ফেতনার পরে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে। এর পূর্বে যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত সেই প্রাচীর তারা ভেদ করতে পারবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا - قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا - وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ **جَمْعًا**

অর্থ: "এরপর তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না। সে বলল, 'এটা আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য'। আর সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, তারা একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গমালার মত আছড়ে পড়বে এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব।"[২৫]

উক্ত আলোচনান্তে বলা যায় যে, ঐতিহাসিকগণ ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয় নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে ইয়াজুজ-মাজুজ হলো ইয়াফিস বিন নুহ (আ.) এর বংশধর। এরা অত্যাচারী ও অবাধ্য জাতি। কিয়ামতের পূর্বে তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকৃত রূপ একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[২৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৫৪।

[২৫] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কুরআন ও হাদিসে ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রসঙ্গ

ইহুদিদের পরামর্শক্রমে কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। তন্মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন হলো: 'কে ঐ ব্যক্তি যে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেছেন? এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-কাহাফের ৮৩ থেকে ৯৯ নং আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। তন্মধ্যে ৯৩-৯৯ নং আয়াত পর্যন্ত ৬টি আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াজুজ-মাজজ দু'পর্বতের পাদদেশের অধিবাসীদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করত। তারা যুলকারনাইনের কাছে ইয়াজুজ-মাজুজের ক্ষতিসাধন থেকে পরিত্রাণের জন্য আবেদন করে দু'পাহাড়ের গিরিপথে একটি প্রাচীর নির্মাণের আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে যুলকারনাইন তাদের কায়িক শ্রম গ্রহণের মাধ্যমে লৌহা ও তামা মিশ্রিত একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছেন। এছাড়া সহীহ বুখারীসহ একাধিক হাদিস গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজের আলোচনা বিদ্যমান। সে ধারবাহিকতায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিম্নে ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গটি আলোকপাত করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (৯৩) قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (৯৪) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (৯৫) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (৯৬) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} - {قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (৯৮) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا}

অর্থ: "অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন'? সে বলল, 'আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব'। 'তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও'। অবশেষে যখন সে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে দিল, তখন সে বলল, 'তোমরা ফুঁক দিতে থাক'। অতঃপর যখন সে তা আগুনে পরিণত করল, তখন বলল, 'তোমরা আমাকে কিছু তামা দাও, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই'। এরপর তারা (ইয়া'জূজ ও মা'জূজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না। সে বলল, 'এটা আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আর

আমার রবের ওয়াদা সত্য'। আর সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, তারা একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গমালার মত আছড়ে পড়বে এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব।"[২৬]

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। উল্লেখিত আলোচনা ছাড়াও সূরা আম্বিয়ার ৯৬নং আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

{حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (٩٦) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ}

অর্থ: "অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসলে হঠাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম বরং আমরা ছিলাম যালিম'।"[২৭]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তাগণের অভিমত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

يقول تعالى مخبرًا عن ذي القرنين: {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا} أي: ثم سلك طريقًا من مشارق الأرض. {حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} وهما جبلان متناوحان بينهما ثُغْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادًا، ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم، عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين: "إن الله تعالى يقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بَعْثَ النار. فيقول: وما بَعْثُ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمّتين، ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج".

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে, যুলকারনাইন পূর্ব দিকে সফর শেষ করে একপথ ধরে চলতে থাকেন। চলতে চলতে দেখতে পান যে, দু'টি পাহাড় পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে কিন্তু ঐ পাহাড় দ্বয়ের মাঝে একটি ঘাঁটি রয়েছে, যেখান দিয়ে ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হয়ে তুর্কীদের উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে থাকে। তারা তাদেরকে হত্যা করে, তাদের বাগান ও ক্ষেত খামার নষ্ট করে, শিশুদেরকেও মেরে ফেলে এবং সবদিক দিয়েই তাদের সর্বনাশ সাধন করে। ইয়াজুজ মাজুজও মানুষ, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ আদমকে (আ.) বলবেনঃ "হে আদম (আ.)!" তিনি তখন বলবেনঃ "লাব্বায়কা ওয়া সাদাইকা (এই তো আমি হাযির আছি)।" আল্লাহ তা'আলা বলবেন: "আগুনের অংশ পৃথক কর।"তিনি বলবেনঃ "কতটা অংশ পৃথক করবো?" জবাবে মহান আল্লাহ বলবেন: "প্রতি হাজার হতে নয়শ' নিরানব্বই জনকে পৃথক কর

[২৬] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯৩-৯৯।
[২৭] আল কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯৬।

(অর্থাৎ হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং একজন জান্নাতী)।" এটা ঐ সময় হবে যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "তোমাদের মধ্যে দু'টি দল এমন রয়েছে যে, তারা যার মধ্যে থাকবে তাকে বেশী করে দিবে। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ।"[২৮]

কাব আহবার বলেছেন, আদম সন্তানগণের মধ্যে তারা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কথিত আছে, একদিন স্বপ্নে আদমের বীর্য স্খলিত হলো। আর ওই স্খলিত বীর্য থেকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন ইয়াজুজ মাজুজকে। সুতরাং পিতৃসম্পর্কের দিক থেকে তারা আমাদের ভাই কিন্তু মাতৃ সম্পর্কের দিক থেকে তারা আমাদের কেউ নয়। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, যুলকারনাইন ছিলেন রোম দেশের অধিবাসী। জনৈক বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। যৌবন কালেই তিনি হয়ে ওঠেন পুণ্যবান। ওই সময় আল্লাহ্ তাকে বললেন, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এমন এক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে আমি তোমাকে প্রেরণ করবো। তাদের মধ্যে একটি গোত্র থাকবে পৃথিবীর পশ্চিমতম প্রান্তে। আরেকটি গোত্র থাকবে পূর্বতম প্রান্তে। পশ্চিমতম প্রান্তের লোকদেরকে বলা হবে নাসেক। আর পূর্বতম প্রান্তের অধিবাসীদের নাম হবে মানসাক। আরো দু'টো গোত্র থাকবে তাদের। একটি সর্বাপেক্ষা উত্তরে। আরেকটি সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে। উত্তরের লোকদের নাম হাবিল। আর দক্ষিণের লোকদের নাম কাবিল। তাদের অবশিষ্ট শাখা গোত্রসমূহ থাকবে পৃথিবীর মধ্যভাগে জ্বিন ও মানুষের সঙ্গে। যুলকারনাইন বললেন, এরপরে আমি কোন্ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো? আর কথা বলবো তাদের সঙ্গে কোন ভাষায়? আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবো প্রবল পরাক্রান্তরূপে। তোমার ভাষাকেও করবো ব্যাপকভাবে প্রসারিত। কোনো কিছু তোমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবে না। আমি তোমাকে পরিধান করাবো আতঙ্ক প্রকাশক পরিচ্ছদ। ফলে কেউ তোমার অন্তরায় সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না। আলো ও অন্ধকারকে করে দিবো তোমার সহযোগী। আলো তোমাকে পথ দেখাবে এবং অন্ধকার অবস্থান করবে তোমার পশ্চাতে। এরপর যুলকারনাইন শুরু করলেন তাঁর অভিযান। প্রথমে যাত্রা করলেন সূর্যাস্তের দিকে। চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন নাসেকদের কাছে। সেখানে কিছুকাল তিনি আল্লাহর ইবাদত করলেন। তারপর তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন সত্য ধর্মের দিকে। কেউ কেউ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। আর কেউ কেউ হয়ে উঠলো বিদ্রোহী। যুলকারনাইন তাদের উপরে অন্ধকারকে প্রবল করে দিলেন। অন্ধকার প্রকাশ করে দিলো তাদের শরীর ও গৃহের অভ্যন্তরভাগ। শেষে তারাও গ্রহণ করলো সত্যধর্মের আমন্ত্রণ। জুল-কারনাইন তখন তাদেরকে নিয়ে গঠন করলেন এক সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। তারপর ওই সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন উত্তরতম প্রান্তের হাবিলদের নিকটে। সেখানেও একইভাবে বাস্তবায়ন করলেন তাঁর পরিকল্পনা। তারপর নাসেক ও হাবিলদের দ্বারা গঠিত সেনাদলকে নিয়ে তিনি গমন করলেন পূর্বতম প্রান্তের অধিবাসী মানসাকদের নিকটে। এখানেও তিনি পূর্বোক্ত নিয়মে গঠন করলেন সমরকর্মীর একটি দল। তারপর সকলকে নিয়ে হাযির হলেন সর্বদক্ষিণের কাবিলদের কাছে। সেখানেও তিনি গঠন করলেন একটি সেনাবাহিনী। তারপর সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন পৃথিবীর মধ্যভাগে; সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছলেন তুরস্কের পূর্বসীমানায়। সেখানে বসবাস করতো

[২৮] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৫।

একদল বিশ্বাসী পুণ্যবান। তারা বললো, হে যুলকারনাইন! এখানকার এই দুই পর্বতমালার মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটির দিকে লক্ষ্য করুন। এই পথ দিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতো হিংস্র একদল মানুষ মাঝে মাঝে এসে আমাদের উপরে আক্রমণ চালায়। তাদের দাঁত হিংস্র প্রাণীর মতো সুতীক্ষ্ণ। তারা সাপ ও বিচ্ছু ধরে খায়। গাধা ও অন্যান্য বন্য পশুকেও চিরে ফেঁড়ে খেয়ে ফেলে। তাদের বংশ বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত দ্রুত। তাই তাদের জনসংখ্যা অত্যধিক। হে মহামান্য সম্রাট! আপনি তাদের আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এই প্রবেশ পথটিতে নির্মাণ করে দিন একটি সুদৃঢ় প্রাচীর। নির্মাণ ব্যয় জোগান দিবো আমরা। যুলকারনাইন বললেন, আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে দান করেছেন বিপুল বিক্রম ও অঢেল সম্পদ। সুতরাং তোমাদেরকে নির্মাণ ব্যয় নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু পাথর, লোহা ও তামা সংগ্রহের কাজে শ্রমদান করো। তার আগে আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়ার চেষ্টা করি। একথা বলে জুল-কারনাইন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রবেশ করলেন ইয়াজুজ মাজুজদের এলাকায়। দেখতে পেলেন, সেখানকার মানুষ সকলেই সমমাপের। তাদের সকলের শরীরের দৈর্ঘ্য সমতল ভূমির মানুষের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। তাদের দাঁত হিংস্র প্রাণীর মতো সরু ও ধারালো। সমস্ত শরীরে রয়েছে ঘন ও মোটা পশম। ওই পশমের মাধ্যমেই তারা শরীরকে রক্ষা করে প্রচণ্ড গরম ও তীব্র শীতের প্রভাব থেকে। তাদের কান দু'টো বৃহদাকৃতির। অত্যধিক তাপ ও শৈত্যের সময় তারা একটি কান মাটিতে বিছিয়ে দেয় এবং অন্য কান দ্বারা আবৃত করে তাদের শরীর। যেখানেই তারা সমবেত হয়, সেখানেই লিপ্ত হয়ে পড়ে যৌনকর্মে। এ সকল কিছু দেখে যুলকারনাইন ফিরে এলেন এবং সেখানে সমবেত জনতাকে বললেন, এবার শুরু করতে হবে প্রাচীর নির্মাণের কাজ। প্রথমে মাটি খনন করতে হবে পানির স্তর পর্যন্ত। তারপর ওই বিশাল ও গভীর গহ্বর পূরণ করে দিতে হবে পাথরের টুকরা দিয়ে। তারপর ওই ভিত্তির উপর বিগলিত তামা ও অন্যান্য মালমসলা দিয়ে নির্মাণ করতে হবে সুদৃশ্য, সুগঠিত ও সুদীর্ঘ প্রাচীর। যুলকারনাইনের পরিকল্পনা অনুসারে এক সময় শেষ হলো প্রাচীর নির্মাণের কাজ। প্রাচীরটি দেখে মনে হতে লাগলো, যেনো আর একটি দুর্ভেদ্য পর্বত জেগে উঠেছে মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে। বায়যাবী লিখেছেন, বর্ণিত কাহিনীটির মধ্যে রয়েছে বনী ইসরাইলদের অতিরঞ্জন।"[২৯]

ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণনা মতে, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম আবুল আব্বাস দামেস্কী (রহ.) .... নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন,

ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ
النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِنَا فَسَأَلْنَاهُ فَقُ سُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ
فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا
فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَ تُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ
شَابٌّ جَعْدٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَا يَا عِبَادَ اللَّهِ
اثْبُتُوا قُلْنَ ا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ
ائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي هُوَ كَسَنَةٍ أَيَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا

[২৯] *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ.৩২৬-৩২৮।

وا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ قَالَ فَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ

فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ وَهِيَ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ وَأَسْبَغُهُ ضُرُوعًا وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ قَالَ وَيَأْمُرُ بِرَجُلٍ فَيُقْتَلُ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ بِلُ إِلَيْهِ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ فَيَتْبَعُهُ رِكُهُ فَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ الشَّرْقِيِّ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي لَا يَدَانِ لَكَ بِقِتَالِهِمْ فَحَوِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَيَبْعَثُ ِ وَجَلَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ } فَيَرْغَبُ عِيسَى أَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتًا إِلَّا قَدْ مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتِنُهُمْ فَيَرْغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ السَّكْسَكِيُّ عَنْ كَعْبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمُهَبَّلِ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ يَا يَزِيدَ وَأَيْنَ الْمُهَبَّلُ قَالَ مَطْلَعُ الشَّمْسِ قَالَ وَيُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ قَالَ فَيَوْمَئِذٍ يَأْكُلُ النَّفَرُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنْ الْإِبِلِ تَكْفِي الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْبَقَرِ تَكْفِي الْفَخِذَ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ تَكْفِي أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ فَبَيْنَا هُمْ ِ ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا طَيِّبَةً تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ وَعَلَيْهِمْ أَوْ قَالَ وَعَلَيْهِ تَقُومُ السَّاعَةُ

অর্থাৎ, “রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একদিন ভোরবেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য। [উদাহরণত সে কানা হবে।] পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। [উদাহরণত জান্নাত ও জাহান্নাম তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরো অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বর্ণনার ফলে [আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম] যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। [অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।] বিকালে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরজ করলাম, আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন যাতে বুঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরো কিছু কথা বলেছেন যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার তুলনায় অন্যান্য ফিতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। [অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।] যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। [কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।] পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। [তার লক্ষণ এই যে] সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে। [এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।] যদি আমি [কুৎসিত চেহারার] কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে কুনা। (জাহেলিয়াতের আমলে কুৎসিত চেহারায় বনু খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।] যদি কোনো মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। [এতে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।] দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তার মোকাবিলায় সুদৃঢ় থেকো। আমরা আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন, সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই হবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের [পাঁচ ওয়াক্ত] নামাজই পড়ব? তিনি বললেন, না। বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাজ পড়তে হবে। আমরা আবার আরজ করলাম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন, সে মেঘখণ্ডের মতো দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। সে মাটিকে আদেশ দেবে। ফলে সে শস্যশ্যামল হয়ে যাবে। [তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চড়বে।] সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দিবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের কাছে কোনো অর্থকড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে, তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে। যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন পরিপূর্ণ যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে। যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে [জীবিত হয়ে। দাজ্জালের কাছে প্রফুল্লচিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দুটি রঙ্গিন চাদর পরে দামেস্কে মসজিদের পূর্ব দিকের সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। [মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।] তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মতো

স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। ঈসা (আ.) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুলুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। [এই জনপদটি এখনও বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।] তিনি সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শুনাবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। [সেমতে তিনি তাই করবেন।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাঁদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনোদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না। ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ দীনারের চেয়ে উত্তম মনে করা হবে। ঈসা (আ.) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবেন। [আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করবেন।] তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যধি পাঠাবেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং [মৃতদেহ পঁচে] অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। [এ অবস্থা দেখে পুনরায়] ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করবেন। [যেন এ বিপদও দূর করে দেওয়া হয়] আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। [মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবেন।] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোনো নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন, তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। [ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,] একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। [চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন] আল্লাহ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত

হবে। শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো প্রকাশ্যে অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।[৩০]

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলার আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে [যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।[৩১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا

অর্থ: "অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না।"[৩২]

হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির (রহ.) এর নিম্নলিখিত বাক্য থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, আল্লাহর বাণী: حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ "সে যখন দুই প্রাচীরের (পর্বতের) মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো।" এখানে দুটি প্রাচীরের উদ্দেশ্য দুটি পাহাড়। পাহাড় দুটি পরস্পর মুখোমুখি এবং মধ্যস্থলে আছে উন্মুক্ত স্থান। এই উন্মুক্ত স্থান থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজেরা তুর্কি বসতি ও শহরের ওপর আক্রমণ করতো, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো, কৃষিতে ও মানুষদের ধ্বংস করতো।[৩৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী, {وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا} অর্থাৎ, 'এবং যুলকারনাইন প্রাচীর দুইটির নিকটবর্তী এলাকায় এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইলেন যাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইবে দূরে ছিল এবং তাহাদের ভাষা ছিল আজমী এই কারণে তাহারা যুলকারনাইনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইতেছিল না।"[৩৪]

আল-কুরআনুল কারীম যুলকারনাইনের প্রাচীরের ব্যাপারে দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। একটি বিষয় হলো, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি দুটি পর্বতের মধ্যস্থলে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই প্রাচীরটি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথটি বন্ধ করে দিয়েছে। এই গিরিপথের মধ্য দিয়েই ইয়াজুজ ও মাজুজেরা এপাশে বসবাসকারী অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করতো।

---

[৩০] *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, ২৯তম খণ্ড, হাদিস নং-১৭৬২৯, পৃ.১৭২।

[৩১] আল্লামা জালালুদ্দিন আল মহল্লী ও জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, সম্পা. মাওলানা আহমদ মায়মুন, অনু. মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০১১ খ্রি.), পৃ.১২০।

[৩২] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:

[৩৩] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১০৩।

[৩৪] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৯৩।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا

অর্থ: 'তারা বলিল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে অতএব প্রাচীর নির্মাণের জন্য কি আপনার জন্য আমরা খাজনা ধার্য করিয়া দিব।'[৩৫]

ইবনে জুরাইজ (র) আতা (র) এর মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (রা) হইতে خَرْجًا অর্থ اَجْرًا عَظِيْمًا বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যুলকারনাইন যদি একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন তবে তারা তাঁকে অনেক বিনিময় দান করবে। এর জবাবে যুলকারনাইন সরলতার সহিত তাদের উদ্দেশ্যে বললেন مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে সাম্রাজ্য ও ধন-সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই আমার পক্ষে উত্তম। যেমন সুলায়মান (আ.) বলেছেন أتمنونني بما اتاني الله خير فما أتاكم তোমারা কি আমাকে মাল দ্বারা সাহায্য করতে চাইতেছ? অথচ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যাহা দান করেছেন তা তোমাদের মাল অপেক্ষা উত্তম। যুলকারনাইনও অনুরূপ কথাই বললেন, তোমরা যে মাল আমার জন্য ব্যয় করবে তা অপেক্ষা আমার মাল উত্তম। তোমাদের মালের আমার প্রয়োজন নাই বরং তোমরা শ্রম ও প্রাচীর নির্মাণের সরঞ্জাম জোগাড় করে দিয়ে এ কাজে আমার সাহায্য কর।[৩৬] এতদসংক্রান্ত সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনা রয়েছে। তা হলো:

لَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ قَالَ رَأَيْتَهُ

অর্থাৎ, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি বললো, আমি প্রাচীরটিকে রঙিন (ইয়ামানি) চাদরের মতো দেখেছি। (যার এক পার্শ্ব লাল এবং আরেক পার্শ্ব কালো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তা দেখেছো।"[৩৭]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا - آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ "এই আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত আনিয়া দাও।"[৩৮] زُبَرَ শব্দটি زُبْرَةٌ এর বহুবচন অর্থ, লোহার পাত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। লোহার এই টুকরা ইটের মত হয় এবং দামেস্কের এক কিনতার পরিমাণ কিংবা উহা অপেক্ষা কিছু বেশী।[৩৯]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ যুলকারনাইন লোহার ইটকে একের উপর এক রাখিয়া যখন দৈর্ঘ প্রস্থে দুই পাহাড়ের মাথা সমান করিলেন (দৈর্ঘ প্রস্থ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম

---

[৩৫] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৯৪।
[৩৬] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৬।
[৩৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.৪১১।
[৩৮] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৯৪।
[৩৯] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৬।

একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন) তখন তিনি বলিলেন اِنْفُخُوْا তোমরা চতুর্দিক হইতে ফুঁকাইতে থাক এমন কি উহা যেন সম্পূর্ণ আগুনে পরিণত হয়। যখন লোহার প্রাচীর আগুনের অংগারে পরিণত হইল তখন তিনি বলিলেন اٰتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا তোমরা গলিত তামা লইয়া আস আমি চতুর্দিক হইতে উহার উপর ঢালিয়া দিব। ইবনে আব্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, قِطْرٌ অর্থ তামা। কেহ কেহ বলেন, গলিত তামা وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ আর "তাহার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করিলাম" আয়াতটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে। গলিত তামা ঢালিয়া দেওয়ার পর যখন উহা ঠাণ্ডা হইয়া গেল তখন উহা সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হইল এবং সজ্জিত চাদরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।[৪০]

আলোচ্য আয়াতাংশ الصَّدَفَيْنِ 'সদাফাইনি' অর্থ দুই প্রান্তর। 'সদ্‌ফুন' অর্থ ঝুঁকে যাওয়া বা আকৃষ্ট হওয়া। 'তাসাদিফ' অর্থ সামনাসামনি হওয়া। 'উফরিগ' অর্থ ফেলে দেওয়া, বইয়ে দেওয়া, ভাগ করে দেয়া বা ঢেলে দেয়া। 'কিত্বরান' অর্থ গলিত তামা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে- তারপর যখন লৌহপিণ্ডের মাধ্যমে নির্মিত প্রাকার দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলো, তখন জুল-কারনাইন বললেন, এবার তোমরা এর উপরে কাষ্ঠখণ্ড একত্র করে সেগুলোতে আগুন জালিয়ে দাও এবং বিভিন্ন স্থানে হাঁপর স্থাপন করে সেগুলোতে সকলে মিলে দম দিতে থাকো। সকলে তাই করলো। বিশাল লোহার দেয়ালটি হয়ে গেলো আগুনের মতো লাল ও উত্তপ্ত। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা নিয়ে এসো বিগলিত তাম্র। আর ওই তরল তাম্রকে ঢেলে দাও প্রাচীরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত, যেভাবে আমি ঢেলে দিতে বলি। উল্লেখ্য যে, এভাবে সম্রাট জুল-কারনাইনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্মিত হলো একটি বিশালাকায় পর্বত-সদৃশ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বাগবী লিখেছেন প্রাচীরটির উচ্চতা ছিলো একশত হাত, প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাত এবং দৈর্ঘ্য এক ফারসাখ।[৪১]

قَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنَا بِشْر بْن يَزِيد حَدَّثَنَا سَعِيد عَنْ قَتَادَة قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا سُول اللَّه قَدْ رَأَيْت سَدّ يَأْجُوج وَمَأْجُوج قَالَ " اِنْعَتْهُ لِي " قَالَ كَالْبَرْدِ الْمُحَبَّر طَرِيقَة سَوْدَاء وَطَرِيقَة حَمْرَاء قَالَ " قَدْ رَأَيْته " هَذَا حَدِيث مُرْسَل.

অর্থাৎ, "ইবনে জারীর (রহ.) বলেন, বিশর ইবনে ইয়াযীদ....কাতাদা হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বলতো উহা কেমন? সে বলিল, নকশা করা চাদরের ন্যায়। উহাতে লাল কালো নকশা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ঠিক দেখিয়াছ হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত।"[৪২]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

---

[৪০] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৬।

[৪১] *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ.৩২৯।

[৪২] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-মাওয়ারিদী, *তাফসিরুল মাওয়ারিদী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৪৪।

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ـ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

অর্থ: "এরপর তারা তা অতিক্রম করিতে পারল না বা ভেদ করতেও পারল না। তাতে ছিদ্র করতেও পারল না। সে বলল, এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।"[৪৩]

এ সম্পর্কে সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ـ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

অর্থ: "অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসলে হঠাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম বরং আমরা ছিলাম যালিম'।"[৪৪]

উপরিউক্ত সূরা আল-কাহাফ ও সূরা আল-আম্বিয়ার বর্ণিত আয়াতসমূহের পার্থক্য:

وينبغى أن يعلم قول ذى القرنين "قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا" قولا من جانبه لا قرينة على جعله منه من أشراط الساعة إنما أراد وعدا أنه كاله ..... فإن قوله تعالى بعد ذالك ولعله لا علم بذالك وإنما أراد وعدا أنه كاله "وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ" للاستمرار التجددى. نعم قوله تعالى "حتى إذا فُتِحَت يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ" هو من أشراط الساعة لكن ليس فيه للردم ذكر فاعلم الفرق.

অর্থাৎ, "এখানে জানার বিষয় হলো, যুলকারনাইনের উক্তি 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য' তাঁর নিজের উক্তি। এখানে কোনো সঙ্কেত বা আলামত বিদ্যমান নেই যার ফলে প্রাচীরের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। আর সম্ভবত যুলকারনাইনও এ-ব্যাপারে (ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন কিয়ামতের আলামত হওয়া প্রসঙ্গে) কিছু জানেন না। তিনি وَعْدُ رَبِّي বা 'আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি' বলে ওই প্রাচীরটির কোনো একসময়ে ভেঙে- চুরে যাওয়াকেই উদ্দেশ্য করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলার উক্তি 'সেই দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে নিত্য পুরাবৃত্ত কাল বুঝাচ্ছে। (অর্থাৎ, সবসময়ের জন্য এই অবস্থা চলতে থাকবে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজদের কোনো কোনো গোত্র কোনো কোনো গোত্রের ওপর আক্রমণ করবে। অবশেষে তাদের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের সময় চলে আসবে।) তবে সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তাআলার বাণী 'এমনকি যখন

[৪৩] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯৭-৯৮।
[৪৪] আল কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯৬-৯৭।

ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে' অবশ্যই কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্তর্গত। কিন্তু এতে প্রাচীরের কোনোই উল্লেখ নেই। সুতরাং, এই পার্থক্যটুকু সবসময় মনে রাখতে হবে।"[৪৫] অতঃপর বিষয়টিকে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে এভাবে বলা যায় যে,

واعلم أن ما ذكرته ليس تأويلا فى القرأن بل زيادة شيء من التاريخ و التجربة بدون إخراج لفظه من موضوعه.

অর্থাৎ, "আর মনে রাখুন, উল্লেখিত আয়াতগুলোর তাফসিরে আমি যা-কিছু বললাম তা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়। বরং কুরআনের কোনো শব্দকে তার উদ্দেশ্যগত অর্থ থেকে বিকৃত না করে অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের আলোকে অবস্থার কিছুটা অতিরিক্ত বিবরণ।"[৪৬]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا অর্থ: "তারা প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই আর তাতে ছিদ্রও করতে পারে নাই।"[৪৭]

আয়াতটি এই কথারই প্রমাণ যে ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরে একটুও ছিদ্র করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, রওহ্ (রহ.).... আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন,

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدِّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ عَز وَجَل أَنْ يَبْعَثَهُمْ إِلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَسْتَثْنِي فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيُنَشِّفُونَ الْمِيَاهَ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا كَهَيْئَةِ الدَّمِ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَقَهَرْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ

অর্থাৎ, "ইয়াজুজ মাজুজ প্রত্যহ প্রাচীরটিকে ছিদ্র করতে চেষ্টা করে এমন কি তারা তা ছিদ্র করে সূর্যের কিরণ দেখিবার কাছাকাছি হয় তখন তাহাদের নেতা তাহাদিগকে বলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও, আগামীকল্য আমরা উহা ভেদ করিয়া যাইব। পুনঃরায় তাহারা উহা ছিদ্র করিতে আসিলে প্রাচীরটিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মজবুত পায়। অবশেষে তাহাদের সময় যখন শেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বাহির করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন তাহারা একদিন ছিদ্র করিতে করিতে সূর্যের আলো দেখিবার উপক্রম হইবে তখন তাহাদের নেতা বলিবে তোমরা ফিরিয়া যাও, ইনশাআল্লাহ

[৪৫] *আকিদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০১।
[৪৬] *আকিদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।
[৪৭] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯৭।

আগামী কল্য উহা ছিদ্র করিয়া ফেলিব। পরদিন আসিয়া তাহারা দেখিবে প্রাচীরটি তেমনি রহিয়াছে যেমন তারা রাখিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহারা সমস্ত নদ-নদীর পানি পান করিয়া শেষ করিবে এবং মানুষ তাহাদের ভয়ে কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে এবং এমনি অবস্থায় উহা প্রত্যাবর্তন করিবে যেন উহা রক্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিবে আমরা পৃথিবীকে জয় করিয়া আসমানও বিজয় করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের ঘাড়ে ফোঁড়া বাহির হইবে এবং সকলেই মৃত্যু বরণ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা) এর প্রাণ পৃথিবীর জীব-জন্তু উহা ভক্ষণ করিবে এবং খুব হৃষ্ট পুষ্ট হইবে এবং আল্লাহর খুব শোকর করিবে।"[৪৮]

ইমাম আহমদ (র)....কাতাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (র)....কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)....কাতাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত নহে। হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ অবশ্য উহার মতন মুনকার। কারণ, আয়াত দ্বারা প্রকাশ, ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং প্রাচীরটি অত্যধিক মযবুত দৃঢ় হইবার কারণে উহাতে ছিদ্র করিতেও সক্ষম হইবে না। কিন্তু কাব আহবার হইতে বর্ণিত, ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের নিকট আসিয়া উহাতে ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিত থাকে এমন কি উহাতে ছিদ্র হইতে অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাহারা বলেন চল ফিরিয়া যাই আগামী কল্য আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আসিয়া তাহারা দেখে যে, উহা পূর্বের মত হইয়া আছে। অতঃপর তাহারা পুনরায় আবার ছিদ্র করিতে থাকে এবং অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে তাহারা ঠিক সেই কথা বলে যাহা প্রথম দিন বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা পর দিন আসিয়াও দেখে যে উহা পূর্বের ন্যায় মযবুত হইয়া আছে। এইভাবে ছিদ্র করিতে করিতে শেষ দিন তাহারা বলিবে আগামী কাল ইনশাআল্লাহ উহা ছিদ্র করিয়া ফেলিব। পরদিন তাহারা আসিয়া দেখিবে প্রাচীরটি যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনি রহিয়াছে। অতএব সেইদিন তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আবূ হুরায়রা (রা) সম্ভবত কাব আহবার হইতেই উদ্ধৃত রেওয়ায়েতটি শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে তিনি অন্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে কোন রাবী উহাকে মারফু হাদীস ধারণা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বলিয়াছেন উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৯]

উপরে আমরা যেই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছি সে ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে আর না উহাতে ছিদ্র করিতে পারিয়াছে। উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতটির মারফু হওয়ারও বিষয়টি সঠিক নহে। ইহার সমর্থনে ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, সুফিয়ান (রহ.)....উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

[৪৮] *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, ১৬তম খণ্ড, হাদিস নং-১০৬৩২, পৃ.৩৭০।

[৪৯] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৭-১৯৮।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِىَّ - □- اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ». وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ».

অর্থাৎ, একবার নবী করীম (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন তাহার মুখমন্ডল লাল ছিল এবং তিনি এই কথা বলিতেছিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমাগত বিপদের জন্য সমস্ত আরববাসীদের জন্য অকল্যাণ আসন্ন। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এত খানী খুলিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি একটি চক্র বানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে ভাল ও সৎলোকের উপস্থিতিতেও কি আমরা ধ্বংস ইয়া যাইব। তিনি বলিলেন হাঁ, যখন অসৎ ও খবীস লোকের আধিক্য হইবে।[৫০] হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ই ইমাম যুহরী (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র)-এর সনদে হাবীবাহ এর উল্লেখ নাই। অবশ্য ইমাম মুসলিম (রা.) এর সনদে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীসটির সনদে আরো এমন কি বৈচিত্র রহিয়াছে যাহা সাধারণত সনদে খুব কম-ই থাকে যেমন, ইমাম যুহরী উরওয়াহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ উভয়ই তাবেয়ী সনদের মধ্যে চার জন সাহাবী মহিলা রহিয়াছেন যাহারা পর্যায়ক্রমে একজন অপরজন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। চার জনের দুইজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পালক কন্যা এবং অপর দুইজন তাঁহার বিবি।[৫১]

মোটকথা, কুরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না। তেমনি এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরী। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

অর্থ: "সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব এ অবস্থায় যে একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব।"[৫২]

---

[৫০] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৬৫০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২৫৮৯; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, হাদিস নং-৭৪১৬, পৃ.১৬৫।

[৫১] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৮।

[৫২] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯৯।

আলোচ্য আয়াতেও প্রথম বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ মাজুজকে তরঙ্গ মালার ন্যায় দলে দলে ছাড়িয়া দিব ثُمَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ তাহার পর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে অর্থাৎ অতঃপর তাহাদিগকে আমি একত্রিত কিয়ামত কায়েম হবে فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অতঃপর তাহাদিগকে আমি একত্রিত করিব। অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামত দিবসে সকল মানব দানব একত্রিত হইয়া যাইবে। ইবনে জারীর (র)....বনী ফাযারা গোত্রের জনৈক শায়খ হইতে وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একে অপরের সহিত মিলিত হয়ে যাবে। তখন ইবলীস বলিবে আচ্ছা, আমি যাই, দেখি ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তখন পূর্ব দিকে রওনা হইবে সেই দিকে গিয়া সে দেখিবে ফিরিশ্তারা পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে অতঃপর পশ্চিম দিকে রওনা হইবে সেই দিকেও দেখিবে ফিরিশ্তারা পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখন ইবলীস বলিবে হায়। পলাইবার যে কোন পথই নাই। অতঃপর সে ডানে ও বামে যতদূর সম্ভব যাইবে সেই দিকেও সে দেখিবে, ফিরিশ্তারা যমীন ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ সে অতিসরু একটা পথ তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইবে এবং সে তাহার সকল অনুসারীদিগকে লইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে। হঠাৎ তারা আগুন দেখতে পাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা একজন দোযখের প্রহরীকে উপস্থিত করিবেন। তিনি তাহাকে বলিবেন, হে ইবলীস। তোমার প্রতিপালকের নিকট কি তোমার এক বিশেষ মর্যাদা ছিল না? তুমি কি বেহেশতে ছিলে না? তখন সে বলবে এখন ধমক দেওয়ার সময় নয়। এখন যদি আল্লাহর কোন ইবাদত করিবার সুযোগ থাকে তবে তাই বলুন, আমি এমনই ইবাদত করিব যে, তাহার মাখলূখের মধ্যে কেহ তদ্রুপ ইবাদত করে নাই। তখন তিনি বলিবেন, হা আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নির্দেশ হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করিবে, কি নির্দেশ হইয়াছে? তিনি বলিবেন, তাহার নির্দেশ হইল, তুমি জাহান্নামে প্রবেশ কর। তখন সে হা করিয়া থাকিবে। উক্ত ফিরিশ্তা তখন তাহার ডানার সাহায্যে ইবলীস ও তাহার অনুসারীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। তখন জাহান্নাম এমন ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিবে যে সকল ফিরিশ্তা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর সন্মুখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বড়ই নম্রতা সহকারে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। ইবনে আবু হাতিম (রহ.) ইয়াকূব কুম্মী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে জারীর (রহ.) ইয়াকূব, হারূন, আনতারা ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।[৫৩]

ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حَتى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحق

"অবশেষে যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে মুক্তি দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসবে।"[৫৪]

---

[৫৩] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৯-২০০।

[৫৪] আল কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯৬-৯৭।

আল্লাহ তা'আলার বর্ণনার ন্যায় ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ যেমন অবহিত তেমন তো আর কেউ নয় এবং বাস্তব ঘটনার সঠিক সংবাদ অন্য কেউ দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই আসমান-যমীনের যাবতীয় অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা ঘটবে সব কিছুর জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে।

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عُبَيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابْن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض، يلعبون، فقال ابن عباس: هكذا

অর্থাৎ, ইবনে জারীর (রহ.) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহ.) .... আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, একবার ইবনে আব্বাস (রা.) কিছু বালককে দেখিতে পাইলেন যে, তারা একজন অপরজনের উপর গড়িয়ে পড়তেছে। এমনটি দেখে তিনি বললেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ ঠিক এমনভাবে বের হবে।"[৫৫]

আল হাদিসে যুলকারনাইন প্রসঙ্গ

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁদের স্বীয় গ্রন্থ যথাক্রমে 'সহীহুল বুখারী, 'সহীহ মুসলিম' ও 'সুনানুত তিরমিযী'তে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে কতিপয় হাদিস উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নে ধারাবাহিক আলোচনা করা হলো:

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: قَالُوا {يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ} [الكهف: ৯৪] قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي القَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} [الكهف: ৮৪]. (فَأَتْبَعَ سَبَبًا) - إِلَى قَوْلِهِ - (ائْتُونِي زُبَرَ الحَدِيدِ): «وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ وَهِيَ القِطَعُ» {حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ} [الكهف: ৯৬] يُقَالُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الجَبَلَيْنِ، وَالسُّدَّيْنِ الجَبَلَيْنِ {خَرْجًا} [الكهف: ৯৪]: «أَجْرًا»، {قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف: ৯৬]: " أَصْبُبْ عَلَيْهِ رَصَاصًا، وَيُقَالُ الحَدِيدُ، وَيُقَالُ: الصُّفْرُ " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «النُّحَاسُ» {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} [الكهف: ৯৭] " يَعْلُوهُ، اسْتَطَاعَ اسْتَفْعَلَ، مِنْ أَطَعْتُ لَهُ، فَلِذَلِكَ فُتِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ "، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا): أَلْزَقَهُ بِالأَرْضِ، وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَهَا، وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ، حَتَّى صَلُبَ وَتَلَبَّدَ، {وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ} [الكهف: ৯৮] {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} [الأنبياء: ৯৬] قَالَ قَتَادَةُ: " حَدَبٌ: أَكَمَةٌ " قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ البُرْدِ المُحَبَّرِ، قَالَ: «رَأَيْتَهُ»

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলার বাণী: তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে। [আল-কাহাফ, ৯৪] আল্লাহ তা'আলার বাণী: আর তারা তোমাকে যুলকারনাইন

[৫৫] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৭৩।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বল, ‘আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি’। আমি তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং সববিষয়ের উপায়- উপকরণ দান করেছিলাম।” [আল-কাহাফ, ৮৩-৮৪] আয়াতে سَبَبًا অর্থ চলাচলের পথ ও রাস্তা। তোমরা আমার কাছে লোহার টুকরা নিয়ে আস (১৮ঃ ৮৩-৯৬) এখানে زُبَر শব্দটি বহুবচন। একবচনে زُبْرَةٌ অর্থ টুকরা। অবশেষে মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার স্তুপ দু’পর্বতের সমান হল। (১৮ : ৯৬) তখন তিনি লোকদের বললেন, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। এ আয়াতে الصَّدَفَيْنِ শব্দের অর্থ ইবন আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী দু’টি পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। আর السُّدَّيْنِ এর অর্থ দু’টি পাহাড়। خَرْجًا অর্থ পারিশ্রমিক। যুল কারনাইন বললঃ তোমরা হাঁফরে ফুঁক দিতে থাক। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস। আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। (১৮ : ৯৬) قِطْرًا অর্থ সীসা। আবার লৌহ গলিত পদার্থকেও বলা হয়। এবং তামাকেও বলা হয়। আর ইবন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ তাম্রগলিত পদার্থ বলেছেন। (আল্লাহর বাণী) এরপর তারা (ইয়াজুজ মাজুজ) এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না। (১৮: ৯৭) অর্থাৎ তারা এর উপরে চড়তে সক্ষম হল না। اسْتَطَاعَ শব্দটি طعت له থেকে باب استفعل আনা হয়েছে। একে أسطا ও يَسْطِيعُ যবরসহ পড়া হয়ে থাকে। আর কেহ কেহ একে أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ রূপে পড়েন। (আল্লাহর বাণীঃ) তারা তা ছিদ্রও করতে পারল না। তিনি বললেন, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। (১৮: ৯৮-৯৮) دكاء অর্থ মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। نَاقَةٌ دَكَاءُ বলে যে উটের কুঁজ নেই। الدكداكُ مِنَ الأَرضِ যমীনের সেই সমতল উপরিভাগকে বলা হয় যা শুকিয়ে যায় এবং উঁচু নিচু না থাকে। (আল্লাহর বাণী:) আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য, সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব, এ অবস্থায় যে, একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে। (১৮:৯৯) (আল্লাহর বাণী:) এমন কি যখন ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চ ভুমি থেকে ছুটে আসবে (২১ : ৯৬) কাতাদা (রহঃ) বলেন, حَدَبٍ অর্থ টিলা। এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি প্রাচীরটিকে কারুকার্য খচিত চাদরের মত দেখেছি। নবী (সা.) বললেন, তুমি তা ঠিকই দেখেছ।”[৫৬]

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: « ' اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُ ا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ»

অর্থাৎ, “যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্ঠের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে (ছিদ্র হয়ে) গেছে। এ কথার বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলির অগ্রভাগকে তাঁর সাথের

[৫৬] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৩৭।

শাহাদাতের আংগুলির অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমানেই মানুষের ধ্বংস নেমে আসবে।)[৫৭]

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « حَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ»

অর্থাৎ, "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এ বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতি ধারণ করে দেখালেন। অর্থাৎ তিনি নিজ শাহাদাত আঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাংগুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।"[৫৮]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟، قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ [ص:১৩৯]: " أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ " فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ»

অর্থাৎ, "আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা (হাশরের দিন) ডাকবেন, হে আদম (আলাইহিস সালাম)! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ বলবেন জাহান্নামী দলকে বের করে দাও। আদম (আলাইহিস সালাম) বলবেন, জাহান্নামী দল কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় (চরম ভয়ের কারণে) ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তাঁর গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন (২২: ২)। সাহাবাগণ বলবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (প্রতি হাজারের মধ্যে একজন) আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে। তারপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মত) সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক

---

[৫৭] সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-৩৩৪৬, পৃ.১৩৮; মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আবু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী* (বৈরূত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-২১৮৭, পৃ.৪৮০।

[৫৮] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-৩৩৪৭, পৃ.১৩৯; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, হাদিস নং-৭৪২০, পৃ.১৬৬।

চতুর্থাংশ হবে। (আবূ সাঈদ (রা.) বলেছেন, আমরা এ সুসংবাদ শুনে) আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। একথা শুনে আমরা আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কালো পশম অথবা কালো ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি সাদা পশম।"[৫৯]

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِىَّ -□- اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ « لَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ». وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً. قُلْتُ يَا ولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ».

অর্থাৎ, যাইনাব বিনতে জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন, "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত ফিতনায় আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজ এর দেয়াল এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। এ সময় সুফইয়ান নিজ হাত দ্বারা (নিজ হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একত্র করে গোলাকার বানিয়ে দেখালেন) দশের গিট বানালেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে নেক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার অধিক পরিমাণে হবে।[৬০]

ফিতনাসমূহ নিকবর্তী হওয়া ও ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খুলে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.) আরো একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তা হলো:

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِىِّ -□- ثْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -□- يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ « هَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ». وَحَلَقَ عِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيهَا. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ».

অর্থাৎ, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী যাইনাব বিনতে জাহশ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হলেন। তখন তার বারাকাতময় চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বলছিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আরব বিশ্বের আগত অকল্যাণের দরুন বড়ই পরিতাপ যা প্রায় ঘনিয়ে আসছে। আজ ইয়াজুজ মাজুজ এর প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এ সময় তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলির দ্বারা বেড় বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের মাঝে অনেক

[৫৯] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-৩৩৪৮, পৃ.১৪০।

[৬০] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, হাদিস নং-৭৪১৬, পৃ.১৬৫।

সৎ লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার অধিক পরিমাণে বেড়ে যাবে।[৬১]

উপরিউক্ত বর্ণনা ছাড়াও একাধিক হাদিসে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো:

ইমাম আহমদ ..... আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি,

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، عَلَى النَّاسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ } فَيَغْشَوْنَ الْأَرْضَ وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهِ حَتَّى يَتْرُكُوهُ يَبَسًا حَتَّى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ لَيَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهَرِ فَيَقُولُ قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءٌ مَرَّةً حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا أَحَدٌ فِي حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ ثُمَّ يَرْمِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخْتَضِبَةً دَمًا لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ قَبْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ كَنَغَفِ الْجَرَادِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي أَعْنَاقِهِمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى لَا يُسْمَعُ لَهُمْ سًّا فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ أَلَا رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ فَيَنْظُرَ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُوُّ قَالَ فَيَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ مُحْتَسِبًا لِنَفْسِهِ قَدْ أَظُنُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَقْتُولٌ فَيَنْزِلُ مْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَلَا أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ فَيَخْرُجُونَ مِنْ مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيَهُمْ فَمَا يَكُونُ لَهَا رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ فَتَشْكَرُ عَنْهُ كَأَحْسَنِ مَا تَشْكَرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ النَّبَاتِ أَصَابَتْهُ قَطُّ

অর্থাৎ, "ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করা হবে। অতঃপর তারা মানুষের কাছে বের হয়ে আসবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ অতঃপর তারা মানুষকে চতুর্দিকে হতে ঘিরে ফেলবে এবং মুসলমানগণ তাদের শহর ও কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং তাদের জীবজন্তুও সাথে নিয়ে যাবে। ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীর পানি পান করতে থাকবে এমনকি তারা যে কোন নদীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তারা এর পানি পান করে একে শুষ্ক করে ফেলবে। এমনকি পরে যারা এ নদীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তারা এটিকে দেখে বলবে, এখানে কোন দিন হয়ত পানি ছিল। অবশেষে শহর কিংবা কিল্লা ব্যতিত অন্যত্র মানুষ থাকবে না। সকলকে তারা ধ্বংস করে ফেলবে। তখন তারা বলবে, পৃথিবীর সকল বাসিন্দা তো আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি, অবশিষ্ট আছে কেবল আসমানের অধিবাসী। এ বলে তাদের একজন একটি বর্ষা নেড়ে এটি আসমানের দিকে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর এর মাথা রক্ত মিশ্রিত হয়ে ফিরে আসবে। আল্লাহর পক্ষ হতে এটি একটি পরীক্ষা হবে। হঠাৎ তাদের কাঁধে ফোঁড়া বের হয়ে আসবে এবং এতে সকলেই একই সাথে মৃত্যুবরণ করবে। তাদের আর কোন সাড়া শব্দ থাকবে না। এমন সময় মুসলমানরা বলবে, এমন কি কোন বীর পুরুষ আছে যে, আমাদের

[৬১] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, হাদিস নং-৭৪১৮, পৃ.১৬৬।

সাথে তার জীবনকে হাতে রেখে শহরের বাহিরে এ শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করবে? তখন এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিজেকে মৃত মনে করে বের হয়ে পড়বে এবং বের হয়ে গিয়ে দেখবে তারা সকলেই মৃত। অতঃপর সে ঘোষণা করবে, মুসলমান ভাইগণ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ সংবাদ শ্রবণ করে তারা সকলেই শহর ও কিল্লা ছেড়ে বাহিরে চলে আসবে। তাদের জীব-জন্তু বাইরে এসে চরিতে থাকবে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের মাংস ব্যতিত অন্য কোন খাবার থাকবে না। জীবজন্তু তাদের মাংস আহার করে খুব হৃষ্টপুষ্ট হবে। এবং ঘাস ও লতা-পাতার তুলনায় ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্ঠির মাংসের অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।"[৬২] ইবনে মাজাহ (রহ.) ইবনে ইসহাক (রহ.) হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বিশর (রহ.) ..... ইবনে হারমালার খালা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

بَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبٍ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: لَا عَدُوَّ، وَإِنَّكُمْ لَنْ زَالُونَ تُقَاتِلُونَ عَدُوًّا حَتَّى يَأْتِيَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْعُيُونِ، شُهْبُ الشِّعَافِ، وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

অর্থাৎ, "একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বিচ্ছুর দংশনে একটি আঙ্গুলে পট্রি বাঁধিয়া খুৎবা দান করতে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি বললেন, তোমরা বল যে, এখন তোমাদের কোন শত্রু নেই কিন্তু তোমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করতে থাকবে এমনকি ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে। তাদের মুখমণ্ডল চওড়া হবে, চক্ষু হবে ক্ষুদ্র এবং মুখমণ্ডল ঢালের ন্যায় চ্যাপ্টা হবে এবং প্রত্যেক উচ্চস্থান হতে দৌড়ে দৌড়ে বের হবে।"[৬৩]

উপরিউক্ত হাদিসসমূহ ব্যতীত ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে আরো একটি দীর্ঘ হাদিসের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد، عن هُشَيْم، عن العَوَّام، عن جَبَلَة بن سُحَيْم، عن مُؤثر بن عَفَازَةَ، عن ابن مسعود، عن رسول الله ﷺ قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى ، عليهم السلام، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال: لا علم لي بها (٩) . فردوا أمرهم إلى موسى، فقال: لا علم لي بها (٨) . فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال: أما وَجْبَتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيها عهد إلي ربي أن الدجال خارج".

قال: "ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص" قال: "فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرًا، فتعال فاقتله". قال: "فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم". قال: "فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب يَنسلون، فيطؤون بلادهم، لا (٩) يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه". قال: "ثم يرجع الناس

[৬২] *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১১৭৩০, ১৮তম খণ্ড, পৃ.২৫৮।

[৬৩] *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৫২৯।

إليّ يشكونهم، فأدعو الله عليهم، فيهلكهم ويميتهم، حتى تَجوى الأرض من نَتْن ريحهم، وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم، حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إليّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك، أن الساعة كالحامل المُتِمّ، لا يدري أهلها متى تَفْجُؤهم بولادها ليلا أو نهارا".

ورواه ابن ماجه، عن محمد بن بشار، عن يزيد بن هارون، عن العَوَّام بن حَوْشَب، به، **نحوه وزاد:** "قال العَوَّام، ووجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: { حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ } .

অর্থাৎ, ইমাম আহমদ (রহ.) ..... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মিরাজ রাত্রে ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। এবং কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে সে বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করলেন। ইবরাহিম (আ.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। মুসা (আ.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও বললেন, আল্লাহ ব্যতিত এর সঠিক সময় কেউই জানে না, তবে আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে তখন আমার নিকট দু'টি খেজুরের ডাল থাকবে এবং সে আমাকে দেখার সাথে সাথেই শিশিরের ন্যায় গলে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন এমন কি গাছ ও পাথর ডেকে বলবে, হে মুসলিম! আমার নিচে কাফির আশ্রয় গ্রহণ করেছে তুমি এসে তাকে হত্যা কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন এবং লোকজন তাদের ঘরে ফিরে যাইবে। ঈসা (আ.) বলেন, অতঃপর ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হতে নেমে আসবে এবং শহর ও গ্রাম পদদলিত করে চলবে এবং যা কিছু তাদের সম্মুখস্থ হবে সব কিছুই ধ্বংষ করে চলবে। তাদের সম্মুখের নদী, নালার সকল পানি পান করে শুষ্ক করে ফেলবে। সকল মানুষ তাদের ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। তখন আমি আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতী করে দু'আ করলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন। সারা জনবসতী দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠবে। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং পচাগলা লাশসমূহকে নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ঈসা (আ.) বলেছেন, আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, যখন এ সকল ঘটনা ঘটবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এমনই নিশ্চিত যেমন গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের সময় সম্পন্ন হবার পর সন্তান প্রসব করা নিশ্চিত। দিবানিশি যে কোন সময়ে সে সন্তান প্রসব করতে পারে। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আওয়াম ইবনে হাওশাব (রহ.) হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) হাদীসের সমর্থনে **حَتى** إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ **وَهُمْ مِنْ كُل حَدبٍ يَنْسِلُونَ** আয়াতটিও উল্লেখ করেছেন।[৬৪]

ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة، به. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف **كذلك**.

وقد روى ابُن جرير وابن أبي حاتم، من حديث مَعْمَر، عن غير واحد، عن حميد بن هلال، عن أبي الصَّيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج، حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع

[৬৪] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৭৫-৩৭৬।

فؤوسهم، فإذا كان الليل قالوا: نجيء غدا فنخرج، فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان، فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدا فنخرج إن شاء الله. فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه، فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة، فيشربون ماءها، ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان هاهنا مرة ماء، ويفر الناس منهم، فلا يقوم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مُخَضَّبة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم، عليه السلام، فيقول: "اللهم، لا طاقة ولا يَدَين لنا بهم، فاكفناهم بما شئت"، فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف، فيفرس رقابهم، ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر، ويبعث الله عينا يقال لها: "الحياة" يطهر الله الأرض وينبتها، حتى أن الرمانة ليشبع منها السَّكن". قيل: وما السَّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت. قال: "فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصَّريخ أن ذا السُّويقَتَين يريده. قال: فيبعث عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة، أو بين السبعمائة والثمانمائة، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا يمانية طيبة، فيقبض فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عَجَاج الناس، فيتسافدون كما تَسَافَدُ البهائم، فَمَثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولي هذا شيئا -أو بعد علمي هذا شيئا-فهو **المتكلف**.

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار، لما شهد له من صحيح الأخبار.

অর্থাৎ, ইবনে জারীর (রহ.) জাবালাহ (রহ.) হতে এ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব সম্পর্কে বহু হাদিস ও সালফের বক্তব্য বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর ও ইবনে হাতিম (রহ.) ..... আবু সাইফ (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাব (রা.) বলেছেন, যখন ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকবর্তী হবে তখন তারা প্রাচীর খুঁড়িতে থাকবে এবং পাশ্ববর্তী লোকেরা তাদের কুঠারাঘাতের শব্দ শুনতে পাবে। রাত্র হবার পর তাদের একজন বলবে, আগামীকাল এসে প্রাচীর ছিদ্র করে ফেলব। কিন্তু পরদিন এসে তারা দেখতে পাবে, প্রাচীর সম্পূর্ণ অক্ষত হয়ে গেছে। তারা পুনরায় তা খুঁড়তে শুরু করবে এবং পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাদের কুঠারাঘাতের শব্দ শুনতে পাবে। কিন্তু রাত্র হলে তারা চলে যাবে। আর একজন একথাই বলবে আমরা আগামীকাল আসব এবং প্রাচীর খুঁড়িয়া 'ইনশাআল্লাহ' বের হয়ে যাব। পরদিন এসে বাস্তবিক প্রাচীরটিকে অপরবর্তীতাবস্থায় দেখতে পাবে। অতঃপর তারা তা খুঁড়িয়া বের হয়ে যাবে। তাদের প্রথম দলটি বের হয়ে একটি নদীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে এবং এর সম্পূর্ণ পানি পান করে ফেলবে। অতঃপর অপর একটি দল অতিক্রম করার সময় এর কাঁদাও চেটে খাবে। তৃতীয় দলটি অতিক্রম কালে বলবে কোন সময় হয়ত এখানে পানি ছিল। মানুষ তাদেরকে দেখে পালাতে আরম্ভ করবে। তারা কোন মানুষ না দেখে আসমানের দিকে বর্ষা নিক্ষেপ করবে এবং বর্ষাটি রক্তাক্ত হয়ে তাদের নিকট ফিরে আসবে। তখন তারা বলতে থাকবে আমরা আসমান ও যমীনের সকলের উপর বিজয়ী হয়েছি। এমন সময় ঈসা (আ.) আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করবেন যে, "হে আল্লাহ! তাদের মুকাবিলা করার আমাদের কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী তাদের সাথে মুক্তি দান করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কাঁধে ফোঁড়া বের করবেন।

এবং এতে তাদের মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর একপ্রকার পাখি প্রেরণ করবেন। তারা তাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সঞ্জীবনী নহর প্রবাহিত করবেন। এটি যমীনকে পবিত্র করে এ থেকে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করবে। এবং এতে এতই বরকত হবে যে, একটি আনার একটি বাড়ির লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে। এ পরিস্থিতিতেই হঠাৎ এক সময় এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিবে যে, 'যুস্ সুওয়াইকাইন (ذُوا السُّوَيقين) ঈসা (আ.) এর মুকাবিলা করবার জন্য আসতেছে। এ সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথেই ঈসা (আ.) সাতশত কিংবা সাত-আট শতের মাঝামাঝি একটি অগ্রগামী সেনাবাহিনী তাদের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করবেন। পথে হঠাৎ এক সময় ইয়ামান হতে একটি মনোমুগ্ধকর বায়ু প্রবাহিত হবে এবং প্রত্যেক মু'মিনের মৃত্যু ঘটবে। এরপর পৃথিবীতে কেবল নিকৃষ্ট লোক অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করবে। তখন কিয়ামত এতই নিকটবর্তী হবে যেমন গর্ভবর্তী ঘোড়ী তার প্রসবকাল অত্যাসন্ন যার মালিক এ অপেক্ষায় তার পাশে ঘুরতে থাকে যে কখন সে প্রসব করে। কাব (রা.) বলেন, আমার এ বক্তব্য ও ইলমের পর কেউ অন্য কথা বলবে সে বানোয়াটকারী। কাব (রা.) এর বর্ণিত এ ঘটনা তার বর্ণিত ঘটনাসমূহের মধ্যে উত্তম ঘটনা। কারণ এর সমর্থনে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে নববীতে বর্ণিত ঈসা (আ.) বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ করবেন।[৬৫]

وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق، وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي عُتبَة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "ليُحَجَّنَّ هذا البيت، وليُعْتَمَرنّ بعد خروج يأجوج ومأجوج". انفرد بإخراجه البخاري.

অর্থাৎ, ইমাম আহমাদ (রহ.) ..... আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ঈসা (আ.) হজ্জ করবেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার পর তিনি উমরাহ পালন করবেন। হাদিসটিকে কেবল ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[৬৬]

পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ইয়াজুজ-মাজুজ মূলত হিংস্র, অত্যাচারী ও বর্বর সম্প্রদায়। তারা শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করে তাদের বাড়ি-ঘর, ফল-ফসল, গবাদিপশু ইত্যাদি জ্বালিয়ে দিত। তাদেরকে যুলকারনাইন একটি প্রাচীরের মাধ্যমে আবদ্ধ করে দেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তারা পৃথিবী থেকে আড়াল হয়ে যায়। যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখন তাদেরকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন।

[৬৫] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৭৬।
[৬৬] *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৭৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইয়াজুজ-মাজুজ দমনে যুলকারনাইন এর ভূমিকা

যুলকারনাইন ছিলেন আল্লাহর কর্তৃক মনোনীত ইসলামের প্রচারক ও শক্তিধর শাসক। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পর্যটন ও পরিভ্রমণের শক্তি দান করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শক্তিধর শাসক হিসেবে তিনি অত্যাচারীদের নির্যাতন-নিবর্তন থেকে অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করেন। সামাজিক দুর্নীতি দমনে ব্যবস্থা নেন। সমাজে আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান জারী করেন। জনগণের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করেন এবং দুর্বৃত্ত ও অপরাধীদের শায়েস্তা করেন। আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে নিরীহ জনগণকে রক্ষাকল্পে তিনি যে প্রাচীর নির্মাণ করেন, এতে সাধারণ জনগণের সহায়তা গ্রহণ করেন। এতে জাতীয় সমস্যা সমাধানে জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় সম্পৃক্ততা যে অতি জরুরি তিনি তা অনুধাবন করেন। যুলকারনাইন তাঁর শাসনামলে একাধিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। তন্মধ্যে ইতিহাসে 'ইয়াজুজ-মাজুজ' দমন অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ইয়াজুজ-মাজুজ দমনে যুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٣) قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ أَجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤) **قَالَ** مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦) **فَمَا** اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} - {قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

অর্থ: "অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন'? সে বলল, 'আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব'। 'তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও'। অবশেষে যখন সে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে দিল, তখন সে বলল, 'তোমরা ফুঁক দিতে থাক'। অতঃপর যখন সে তা আগুনে পরিণত করল, তখন বলল, 'তোমরা আমাকে কিছু তামা দাও, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই'। এরপর তারা (ইয়া'জূজ ও মা'জূজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না। সে বলল, 'এটা আমার রবের অনুগ্রহ।

অতঃপর যখন আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য'।"[৬৭]

হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির (রহ.) এর নিম্নলিখিত বাক্য থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, আল্লাহর বাণী: حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ "সে যখন দুই প্রাচীরের (পর্বতের) মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো।" এখানে দুটি প্রাচীরের উদ্দেশ্য দুটি পাহাড়। পাহাড় দুটি পরস্পর মুখোমুখি এবং মধ্যস্থলে আছে উন্মুক্ত স্থান। এই উন্মুক্ত স্থান থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজেরা তুর্কি বসতি ও শহরের ওপর আক্রমণ করতো, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো, কৃষিতে ও মানুষদের ধ্বংস করতো।[৬৮]

আলোচ্য আয়াতে سُدٌّ (পেশ যোগে) ও سَدٌّ (যবর যোগে) শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ প্রাচীর বা প্রতিবন্ধক। ইকরামা বলেছেন, মানব নির্মিত প্রতিবন্ধককে বলে سَدٌّ এবং سُدٌّ বলে প্রাকৃতিক অন্তরায়কে। এখানে 'سَدَّيْنِ' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দুই বৃহৎ পর্বতের মধ্যবর্তী ওই স্থানকে, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন একটি সুবৃহৎ প্রাচীর। উল্লেখ যে, ওই সুবৃহৎ প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিলো আর্মিনিয়া ও আজারবাইজানে। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন মন্তব্য করেছেন, তুরস্কের শেষ প্রান্তে রয়েছে দু'টি বৃহৎ পর্বতমালা। ওই পর্বতমালার অপর পাশে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজদের বসবাস। আলোচ্য আয়াতে ওই পর্বতমালার কথাই বলা হয়েছে। এই মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের স্বীয় তাফসীরে।[৬৯]

'مِنْ دُوْنِهِمَا' অর্থ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে। لَا يَفْقَهُونَ قَوْلًا অর্থ যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের কথা অন্য অঞ্চলের লোক বুঝতো না। তারাও বুঝতো না অন্য এলাকার লোকের ভাষা।[৭০]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যোদয়ের স্থান ভ্রমণ শেষ করে অন্য এক পথ ধরে চলতে লাগলেন এবং অবশেষে প্রাচীরের ন্যায় দু'টি পাহাড়ের নিকট পৌঁছলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গিরীপথ ছিল এই গিরীপথের মাধ্যমেই ইয়াজুজ মাজুজ তুরকিস্তানে প্রবেশ করিত। তারা সেখানে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিত। ক্ষেত খামার জীবজন্তু ও ধ্বংস করিত এবং মানুষকে হত্যা করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত তারা মানুষেরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ইরশাদ হয়েছে,

---

[৬৭] আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ৯৩-৯৯।

[৬৮] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১০৩।

[৬৯] *আত-তাফসীর আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৫।

[৭০] প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৫।

"إن الله تعالى يقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بَعْثَ النار. فيقول: وما بَعْثُ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمّتين، ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج".

অর্থাৎ, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামের অংশ আপনি পৃথক করে রাখুন। তিনি বলবেন, জাহান্নামের অংশ কি পরিমাণ? তিনি বললেন প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং একজন জান্নাতে। এ সময় শিশু বৃদ্ধ আতঙ্কগ্রস্ত হবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে তারা যে দিকে থাকবে তাদের সংখ্যাই হবে অধিক অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ।"[৭১]

প্রাচীরের বিবরণ ও তাঁর অবস্থান

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে যুলকারনাইনের প্রাচীরের উল্লেখ থাকলেও তার স্থান ও অবস্থানের কোনো বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্ববিদগণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিরিখে কয়েকটি বৃহদাকার প্রাচীরের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নিজস্ব ধারণাপ্রসূত ও আনুমানিকভাবে সেগুলোকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মাওলানা আব্দুল হক দেহলভী (রহ.) স্বীয় তাফসীরে হক্কানীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং এইসূত্রে পাঁচটি প্রাচীরের উল্লেখ করেছেন।[৭২] নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

১. চীনের প্রাচীর: এই প্রাচীরকে চীনের রাজা 'ফাগফুর' ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৩৫ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিল। যার দৈর্ঘ্য ছিল বারশত হতে পনেরশত মাইল পর্যন্ত। সেই প্রাচীরের পৃষ্ঠদেশে কতিপয় জঙ্গী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, যারা চীনে এসে লুটতরাজ করত। তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলা হয়। এই বক্তব্য শুদ্ধ নয়। কেননা এই প্রাচীর ইট ও পাথরের দ্বারা নির্মিত ছিল আর তা নির্মাণ করেছিল একজন কাফের বাদশাহ। অথচ যুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল লৌহ ও তাম্র দ্বারা নির্মিত এবং তিনি ছিলেন মুসলমান। আর এই ঘটনা ঈসা (আ.) মাত্র দুশত পয়ত্রিশ বছর পূর্বের। অথচ যুলকারনাইনের ঘটনা তাঁর দুই হাজার বছর পূর্বের।

২. সমরকন্দের প্রাচীর: সমরকন্দের নিকট অবস্থিত প্রাচীর। এটি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর যা লোহার পাত এবং ইটের সমন্বয়ে তৈরিকৃত। অনেক উঁচু এবং সুদৃঢ় প্রাচীর এটি। এ প্রাচীরের মধ্যে তালাবদ্ধ একটি ফটকও রয়েছে। খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ স্বপ্নে এ প্রাচীরটিকে ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে তা অনুসন্ধানের জন্য

---

[৭১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৫৩০; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২২২। উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা হাকেম আন-নিসাবুরী (রহ.) বলেন, শায়খাইনের শর্ত মোতাবেক এ হাদিসটি সহীহ। কিন্তু ইবনে কাসীর (রহ.) এর উল্লেখিত আলোচ্য হাদিসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম যাহবীও একই মত পোষণ করেন। [দ্র. *আল-মুসতাদরাক*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৬১০।]

[৭২] মাওলানা মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী, *তাফসীরে ফাতহুল মান্নান* (তাফসীরে হক্কানী) (বালুজিস্থান: দারুল উলুম জুহদান, ২০০৯ খ্রি.), সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৯৩।

পঞ্চাশজন লোকের একটি কাফেলা প্রেরণ করেন। তারা সে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করে এসে তার বিবরণ প্রদান করেছেন। 'তাঈ' পাহাড়ের গিরিপথ বন্ধ করার জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ এই প্রাচীরকেই যুলকারনাইনের প্রাচীর বলে মত পেশ করেছেন। ইয়েমেনের কোনো এক হিময়ারী বাদশাহ এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। কতিপয় ওলামা বলেছেন যে, এই হিময়ারী বাদশাহই যুলকারনাইন ছিলেন এবং تبع يمانى তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যার উপর তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। এ কারণেই কতিপয় আলেম সমরকন্দের প্রাচীরকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

৩. আজারবাইজান প্রাচীরঃ এ প্রাচীর আজারবাইজানের উপকণ্ঠে بحيرة طرسنان এর পাদদেশে কুবুক পাহাড়ের জেটি ও অন্য জাতির আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই প্রাচীর আজারবাইজান ও আরমেনিয়ার দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। পাথর ও সীসা ঢালাই করে এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। যার উচ্চতা তিনশত গজ বা হাত। বাদশাহ নওশেরওয়া এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। আজও এই প্রাচীর বিদ্যমান। কেউ কেউ এটাকে যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর বলে ধারণা করে থাকেন।

৪. তিব্বত প্রাচীরঃ তিব্বতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের মাঝে এ প্রাচীর অবস্থিত। এটা হলো খোরাসানের শেষ কিনারা। এই পাদদেশ দিয়ে তুর্কিরা লুণ্ঠন চালাতো। এ কারণে ফজল ইবনে ইয়াহইয়া বরমকী একটি তোরণ নির্মাণ করে এটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এটি কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের প্রচীর নয়। কেননা এটা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে নির্মিত হয়েছে।

৫. এশিয়ার প্রাচীরঃ পৃথিবীর ইতিহাসের পঞ্চম বৃহত্তর প্রাচীর রোম উপসাগরের পূর্বপ্রান্তরে এশিয়া মাইনরের কোনো এক ভূখণ্ডে অবস্থিত। তবে এটা জানা যায়নি যে, এ প্রাচীর কে কখন নির্মাণ করেছে এবং তা আজও বিদ্যমান রয়েছে কিনা? সর্বসম্মতিক্রমে এটাও কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়।

মোটকথা এ সবগুলোই হলো ঐতিহাসিক কিসসা কাহিনী যা কখনোই নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য হতে পারে না। এগুলোই পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পাঁচটি প্রাচীর। যা ইতিহাস ও ভূগোলের বই পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। লেখকগণ এর মধ্য হতে কোনো কোনোটিকে স্বীয় ধারণা ও অনুমান নির্ভর করে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের প্রাচীর সাব্যস্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে এই সবগুলো স্বীয় কল্পনাপ্রসূত দাবি। কারো নিকটেই কোনো ধরনের দলিল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তাই কুরআনে বর্ণিত প্রাচীর নির্ধারণের জন্য কুরআন ও হাদীসে এই প্রাচীরের কি কি বৈশিষ্ট বর্ণিত রয়েছে তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে যাতে করে এই প্রাচীর নির্ধারণ করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের বৈশিষ্ট্যঃ

যুলকারনাইনের নির্মিত এ ঐতিহাসিক প্রাচীরের যে সকল বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা হলো:

১. এই প্রাচীরের নির্মাতা আল্লাহ তা'আলার কোনো মকবুল নেককার বান্দা এবং মুমিন ব্যক্তি। তিনি নেক আমলকারী ঈমানদারদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ শুনাবেন এবং কাফের ও জালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় দেখাবেন।

২. এর নির্মাতা হবেন এমন এক মর্যাদাবান বাদশাহ, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবাই যার অনুগত থাকবে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বপ্রকার জাহেরী ও বাতেনী উপকরণ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- **إنا** مَكَّنَّا فِي الأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلّ অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সবাই তার অনুগত হবে যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং সমর্থনও তাঁর পক্ষে থাকবে, বিজয় ও সফলতার পতাকা তার হাতে থাকবে। তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ে নীরব থাকবে।

৩. ধাতুর তৈরি সেই প্রাচীরটি তামা গলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইট অথবা পাথর দ্বারা সেই প্রাচীরের দুই প্রান্ত দুই দিকে দু'টি পাহাড়ের সাথে মিলিত আছে। প্রাচীরটি অনেক উঁচু এবং শক্ত ও সুগঠিত। অস্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ কারামত রূপে এটি নির্মিত হয়েছে। কারণ এত উঁচু প্রাচীর যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লৌহ ফলক দিয়ে বানানো হয়েছে এবং যার নির্মাণের সময় এমনভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছে যে, প্রত্যেকটি লৌহ ফলক প্রজ্বলিত আগুন হয়ে উঠেছে। আবার তার মধ্যে হাজার হাজার টন গলানো সীসা ঢালা হয়েছে এই সকল কর্ম-কাণ্ড স্পষ্টভভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ নয়, এরূপ বিপুল আয়োজনে প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে কোনো প্রাণীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এই আগুনের কাছে গিয়ে ফুঁক দিয়ে প্রজ্বলিত করা এবং গলানো তামা তার উপর ঢেলে দেয়াটা স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব নয়। সুতরাং এই আশ্চর্যজনক প্রাচীর সম্পর্কে একথা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না যে, এটা সেই নেককার বাদশাহর একটি কারামত ছিল অথবা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে এটা ছিল তার একটি মু'জিজা। কারণ যখন এত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত লোহার প্রাচীর আগুনে পরিণত হয়ে যায় তখন কারো ক্ষমতা থাকে না যে তার নিকটে গিয়ে তার উপরে গলানো সীসা ঢালতে পারে। এটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার খাছ রহমত যে তিনি এই কাজে নিয়োজিত লোকদের দেহ আগুনের প্রচণ্ড তাপ থেকে হেফাজত করেছেন এবং তারা এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. এই ধাতু নির্মিত প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ মাজুজ আবদ্ধ আছে। তারা এর উপর আরোহণও করতে পারে না এবং কোনো সিঁড়ি লাগিয়ে সেখান থেকে এপারে নেমেও আসতে পারে না। এই প্রাচীরে তারা কোনো ছিদ্রও করতে পারে না। তবে কিয়ামতের কাছাকাছি এক সময়ে তারা এই প্রাচীর ছিদ্র করে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে। হাদীস নববীতে এ কথার উল্লেখ রয়েছে।

৬. হাদীস নববীতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জমানায় এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ সামান্য ছিদ্র করতে সক্ষম হয়েছে।

৭. সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন বের হয়ে আসার জন্যে এই প্রাচীরটি খুঁড়তে থাকে। কিন্তু প্রাচীরটি আবার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় পূর্বের ন্যায় পুরু এবং মোটা

হয়ে যায়। তবে কিয়ামতের পূর্বে তারা একদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলে সেই প্রাচীরটি খুঁড়তে শুরু করবে। তখন ইনশাআল্লাহ এর বরকতে সেই প্রাচীরে প্রশস্ত এক ছিদ্র হয়ে যাবে এবং পরের দিন তারা প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসতে সক্ষম হবে।

৮. ইয়াজুজ-মাজুজ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চেয়েও তারা শক্তিতে অনেক বেশি হবে এবং সংখ্যার দিক থেকে তারা এত অধিক হবে যে তাদের মধ্যে এবং সাধারণ আদম সন্তানের মধ্যে সেইরূপ আনুপাতিক হার হবে যেরূপ এক হাজার এবং এক এর অনুপাত। এরা সবাই কাফের সুতরাং সবাই জাহান্নামী।

৯. ইয়াজুজ-মাজুজের বহির্গমন হবে ঈসা (আ.) এর আগমনের জামানায়। সেই সময় ঈসা (আ.) তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগণকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা কোনো দূর্গ অথবা বাড়িতে হেফাজতে থাকবে।

১০. ঈসা (আ.)-এর বদদোয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজ অস্বাভাবিকভাবে একসঙ্গে সবাই মারা যাবে। তাদের ঘাড়ে আল্লাহ তা'আলা মহামারী স্বরূপ এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দিবেন যার কারণে তাদের মৃত্যু হবে।

এ দশটি বৈশিষ্ট্য হলো যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের। প্রথম পাঁচটি বৈশিষ্ট কুরআন পাকে উল্লেখ হয়েছে এবং পরের পাঁচটি বিখ্যাত হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।[৭৩]

যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থান

বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকগণ এবং ভূগোল বিশারদগণ একটি সন্দেহ উত্থাপন করে থাকেন যে, আমরা সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও তো যুলকারনাইনের প্রাচীর দেখতে পাইনি এবং কোথাও ইয়াজুজ-মাজুজের সন্ধানও পাইনি।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে আল্লামা আলুসী (রহ.) তার তফসীরগ্রন্থে লিখেছেন এবং আল-হুছুনুল হামিদিয়া গ্রন্থে আল্লামা হুসাইন জসর তরাবলুসী উল্লেখ করেছেন। জবাবে বলা হয়েছে যে, যে প্রাচীর এবং যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সঠিক। এ বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্তব্য এবং তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ। তবে প্রাচীরটির অবস্থানস্থল আমাদের জানা নেই। এটা সম্ভব যে আমাদের এবং সেই কওম ও প্রাচীরের মাঝখানে বড় বড় পাহাড় এবং বড় বড় সমুদ্রের আড়াল হয়ে রয়েছে। কথাটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর ভূগোল বিশারদগণ যে বলেছেন, আমরা সারা দুনিয়ায় তা তন্ন করে খুঁজেছি এবং আমরা দুনিয়ার স্থল-ভাগ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল কোথাও বাকি রাখিনি। কথাটি নিছক অযৌক্তিক, তাই এ কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সকল ভূ-পৃষ্ঠের খোঁজ করা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বসবাসযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠ দেখাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর

[৭৩] আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ১ম সংস্করণ, ২০২০ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৪৫৮-৪৫৯।

অনেক অঞ্চল এখনও এমন আছে যেখানে আজও মানুষ পদচারণা করতে পারেনি। এখনও ভূ-পৃষ্ঠে এমন সব পাহাড় এবং উপত্যকা রয়ে গেছে যেখানে এই সকল ভূ-তত্ত্ববিদ পৌঁছতে পারেননি। বিশেষ করে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল। সেখানে বরফে ঢাকা এমন সব পাহাড় বিদ্যমান আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। একথা ভূ-তত্ত্ববিদগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলেও এই জাতি থাকতে পারে এটা অসম্ভব কিছুই নয়।[৭৪]

السَّدَّانِ جَبَلَانِ مَنِيفَانِ فِي السَّمَاءِ مِنْ وَرَائِهِمَا وَمِنْ أَمَامِهِمَا الْبُلْدَانُ، وَهُمَا بِمُنْقَطَعِ أَرْضِ **التُّرْكِ مِما** يَلِي أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ. وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ أَنَّهُمَا جَبَلَانِ مِنْ وَرَاءِ بِلَادِ التُّرْكِ.

অর্থাৎ, "কুরআন মাজিদের بين السدين 'প্রাচীর দুটির মধ্যবর্তী স্থান' বলে যে দুটি প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই পাহাড় যাদের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। পাহাড় দুটি আকাশছোঁয়া উঁচু। পাহাড় দুটির পেছনেও জনপদ আছে এবং তাদের সামনেও জনপদ আছে। পাহাড় দুটি মঙ্গোলিয়ান ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এই প্রান্তটি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে মিশেছে। "যে দুটি পর্বতের মধ্যস্থলে যুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মিত হয়েছে তা তুর্কি গোত্রগুলোর মধ্যে অবস্থিত। (অর্থাৎ, প্রাচীরটি নির্মাণ করা হয়েছে তাদের এদিকে আসার প্রতিবন্ধকরূপে।)"[৭৫]

الأَظْهَرُ أَنَّ مَوْضِعَ السَّدَّيْنِ فِي نَاحِيَةِ الشَّمَالِ، وَقِيلَ: جَبَلَانِ بَيْنَ أَرْمِينِيَّةَ وَبَيْنَ أَذْرَبِيجَانَ، وَقِيلَ: هَذَا الْمَكَانُ فِي مَقْطَعِ أَرْضِ التُّرْكِ، وَحَكَى مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي/ تَارِيخِهِ أَنَّ صَاحِبَ أَذْرَبِيجَانَ أَيَّامَ فَتْحِهَا وَجَّهَ إِنْسَانًا إِلَيْهِ مِنْ نَاحِيَةِ الْخَزَرِ فَشَاهَدَهُ وَوَصَفَ أَنَّهُ بُنْيَانٌ رَفِيعٌ وَرَاءَ خَنْدَقٍ عَمِيقٍ وَثِيقِ مَنِيعٍ، وَذَكَرَ ابْنُ خردا [ذبة] فِي كِتَابِ الْمَسَالِكِ وَالْمَمَالِكِ أَنَّ اثِقَ بِاللَّهِ رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ فَتَحَ هَذَا الرَّدْمَ فَبَعَثَ بَعْضَ الْخَدَمِ إِلَيْهِ لِيُعَايِنُوهُ فَخَرَجُوا مِنْ بَابِ الأَبْوَابِ حَتَّى وَصَلُوا إِلَيْهِ وَشَاهَدُوهُ فَوَصَفُوا أَنَّهُ بِنَاءٌ مِنْ لَبِنٍ مِنْ حَدِيدٍ مَشْدُودٍ بِالنُّحَاسِ الْمُذَابِ وَعَلَيْهِ بَابٌ مُقْفَلٌ، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ الإِنْسَانَ لَمَّا حَاوَلَ الرُّجُوعَ أَخْرَجَهُمُ الدَّلِيلُ عَلَى الْبِقَاعِ الْمُحَاذِيَةِ لِسَمَرْقَنْدَ، قَالَ أَبُو الرَّيْحَانِ: مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ مَوْضِعَهُ **فِي الرُّبْعِ** شَّمَالِيِّ الْغَرْبِيِّ مِنَ الْمَعْمُورَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

অর্থাৎ, যুলকারনাইনের প্রাচীর পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানচিত্র যারা দেখেছেন তারা জানেন যে, সাইবেরিয়ার পরে উত্তর দিকে যে সকল বরফের পাহাড় রয়েছে সেগুলো বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে এবং কোনো মানুষ সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। এই সকল পাহাড়ের ওপারে মাটি বিদ্যমান রয়েছে। সেই জমিন প্রশস্ত রেখার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এই সকল বরফের পাহাড়ের নীচে কোনো নীচু ভূমি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। নীচু এবং সমতল হওয়ার কারণে এই ভূমিতে বরফ এতটা কম থাকতে পারে যা মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হয়। আর সেখানেই হয়তো ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি বসবাস করছে। আমাদের এবং তাদের মাঝখানে এভাবেই সমুদ্র অথবা বরফের পাহাড় আড়াল হয়ে রয়েছে। তবে যুলকারনাইনের যুগে হয়তো কোনো উপত্যকা পথে রাস্তা ছিল। আর ইয়াজুজ-মাজুজ সেই পথে পাহাড়ের দিক থেকে এসে আশেপাশের লোকদের উপর

[৭৪] *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবউল মাসানী*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.৩৫৩-৩৫৪।

[৭৫] *আল-বাহরুল মুহিত ফীত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ.২২৪।

হত্যাযজ্ঞ চালাতো। আর জুলকারনাইন এই অবস্থা দেখে উপত্যকার রাস্তা প্রাচীরের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়ে পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাদেরকে ধাওয়া করে দেন। এরপর সেই প্রাচীরের কারণে তাদের এদিকে আসা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন হয়তো বায়ুমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলীয় কোনো ঘটনার কারণে বরফ গলে যাবে এবং তখন ইয়াজুজ-মাজুজ যুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবীর লোকদের দিকে চলে আসবে এবং এখানে এসে উৎপাত চালাবে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কুরআন ও হাদীসে একথার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।[৭৬]

ইবনে হিশাম 'তুর্ক' নামকরণের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন- "এদের মধ্যে একটি দল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। যুলকারনাইন যখন আরমেনিয়ায় (অর্থাৎ, আরমেনিয়া থেকে সামনে গিয়ে অবস্থিত দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে) প্রাচীর নির্মাণ করতে শুরু করলেন, তিনি তাদেরকে প্রাচীরের এ-পাশে ছেড়ে দিলেন। (অর্থাৎ, তাদেরকে সমগোত্রীয় ইয়াজুজ ও মাজুজদের সঙ্গে প্রাচীরের ভেতরের দিকে আটকালেন না।) তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দেয়ার ফলে তাদের নাম হয়েছে তুর্ক (যাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে)।"[৭৭]

"কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের তৃতীয় অভিযান কোন দিকে হয়েছিলো তার প্রতি ইঙ্গিত করে নি। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এটা বুঝা যায় যে, এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো উত্তর দিকে এবং ওখানেই তিনি ককেশাস পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। আর যে উদ্দেশ্যে যুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন, এই একই উদ্দেশ্যে অন্য বাদশাহ ও সম্রাটগণও প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। যেমন, চীনের অধিবাসীরা মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছে। মঙ্গোলিয়ানরা এটিকে আনকুরাহ বলেন, আর তুর্কিরা এটিকে বলে বুকুরকাহ। 'নাসিখুত তাওয়ারিখ' গ্রন্থের রচয়িতা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। আর এই একই কারণে কোনো কোনো অনারব বাদশাহ দারবান্দ (বাবুল আবওয়াব) এর প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। এ রকম আরো প্রাচীর আছে, যা উত্তর দিকেই অবস্থিত।"[৭৮]

আর এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে ককেশাস অঞ্চলে বা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী যে দারবান্দ (বাবুল আবওয়াব) তার সম্পর্কে একটি নিবন্ধ আছে। এই নিবন্ধে বলা হয়েছে, "এখানে যে দারবান্দ প্রথম ইয়াযদিগার তা পুনরায় পরিষ্কার করিয়েছিলেন এবং তার সংস্কার করিয়েছিলেন। এই প্রাচীরটিকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।"[৭৯]

---

[৭৬] ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযী, *আত-তাফসির আল-কাবির* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), ২১তম খণ্ড, পৃ.৪৯৮।

[৭৭] মালেক ইবনে হিশাম, *আত-তিজান* (ইয়েমেন: মারকাযুদ দারাসাতু ওয়াল আবহাসিল ইয়েমিনিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৭ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ.২৭৩।

[৭৮] *আকিদাতুল ইসলাম ফি হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম* (সংক্ষিপ্ত), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮।

[৭৯] এনসাইক্লোপিডয়া অব ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ.৯৪০।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের আরেক নিবন্ধে বলা হয়েছে- "রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফায় ইয়াজুজ ও মাজুজের যে সাগরের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাস্পিয়ান সাগর (বাহরে খাযার)।"[৮০]

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه، ووجه معه جيشًا سرية، لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلاد، ومن مُلك إلى مُلك، حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابًا عظيمًا، وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك. وأن عنده حرسًا من الملوك المتاخمة له، وأنه منيف عال، شاهق، لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين،

অর্থাৎ, "একবার খলীফা ওয়াসিক তার রাজত্বকালে বহু সাজ-সরঞ্জাম দিয়া একটি সেনাবাহিনীসহ তার মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজনকে প্রাচীরের খবর লইতে প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট উহার সঠিক তত্ত্ব জানাইতে পারে। তাহারা রওয়ানা হইলেন এবং শহরের পর শহর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীরের নিকট পৌঁছলেন। এবং লোহা তামা দ্বারা নির্মিত প্রাচীরটি দেখিতে পাইলেন। তাহারা বর্ণনা করিয়াছে যে তাহারা প্রাচীরের একটি মস্ত বড় দরজা এবং উহাতে বিরাট একটি তালা ঝুলিতে দেখিয়াছে। প্রাচীরে ব্যবহৃত ইটের অবশিষ্ট ইট একটি বুরুজের মধ্যে রয়েছে। তথায় পাহারার জন্য একটি চৌকিও আছে। প্রাচীরটি অতিশয় উঁচু। কোন উপায়েই উহার উপর আরোহণ করা সম্ভব নহে। আর সেই সকল পাহাড়ে আরোহণ করাও সম্ভব নহে যাহা প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে দূর দূরান্ত পর্যন্ত অবস্থিত। ইহা ছাড়া তারা আরো বহু আশ্চার্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা দুই বৎসর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৮১]

মোটকথা কুরআন এবং হাদীসে যে বিষয়ের খবর দেওয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং তা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং যা সম্ভব ও স্বাভাবিক এবং যা সন্দেহাতীতভাবে শরিয়ত সম্মত তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ এবং অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যেই আমরা বিশ্বাস করি যে, কিয়ামতের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে যুলকারনাইনের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে। আর এই যে, ভূগোল বিশারদ এবং গবেষকদের দাবি যে তারা দুনিয়ার সমগ্র ভূ-খণ্ডের ব্যাপারে অবগত হয়ে পড়েছেন- এই দাবির সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।[৮২]

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায় যে, ইয়াকুত হামাবি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুজামুল বুলদানে' একটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন; যা গবেষকেরও অভিমত। অভিমতটি নিম্নরূপ:

---

[৮০] এনসাইক্লোপিডয়া অব ইসলাম, ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কিত নিবন্ধ, ১ম খণ্ড, পৃ.১১৪২।

[৮১] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯৬।

[৮২] *তাফসীরে নূরুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পারা- ১৬, পৃ. ৩৫-৩৭।

قد كتبت من خبر السدّ ما وجدته في الكتب ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات فيه، والله أعلم بصحته، وعلى كلّ حال فليس في صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز.

অর্থাৎ, "আমি কিতাবসমূহে প্রাচীর সম্পর্কে যে কাহিনী পেয়েছি তা এখানে লিখে দিয়েছি। আমি যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছি সেগুলোর ভিন্নতা ও পার্থক্যের ফলে কিছুতেই আমি সেগুলোর বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করতে পারি না। বর্ণনাগুলো শুদ্ধ না অশুদ্ধ সে-ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে সর্বাবস্থায় (বর্ণিত বর্ণনাসমূহে) প্রাচীরের বিষয়টি বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারিমে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।"[৮৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দমনে যুলকারনাইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুলকারনাইন দু'পর্বতের অধিবাসীদের ক্ষতি, বর্বরতা ও হিংস্রতা থেকে রক্ষা করতে জনপদ বাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ককেশাস অঞ্চলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন। ইতিহাসে যা যুলকারনাইনের প্রাচীর হিসেবে পরিচিত। এ প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কিয়ামতের আলামতের মধ্যে অন্যতম একটি আলামত হলো আল্লাহর ইচ্ছায় এ প্রাচীর ভেদ করে ইয়াজুজ-মাজুজ একদিন পৃথিবীতে চড়িয়ে পড়বে। তখনই আল্লাহর ওয়াদা যে সত্য তা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হবে।

[৮৩] *মুজামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২০০।

উপসংহার

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযাহ। যা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ঘটনা প্রবাহ এবং ভবিষ্যতের সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ। ইতিহাস চর্চায় আল কুরআন উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। আল কুরআনের দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো মানুষের সত্যের পাঠগ্রহণের মাধ্যম। মূল উদ্দেশ্য শিরক ও পাপাচারের ভয়াবহতা বর্ণনা এবং কাফির, মুশরিক ও অবাধ্যদের পরিণতি উপস্থাপন করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত জীবনব্যবস্থার দিকে আহবান করা। আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আল-কাহাফে 'যুলকারনাইন' এর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রাচীন আরবের একজন ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী ও শক্তিধর বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত বান্দার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তন্মধ্যে যুলকারনাইন অন্যতম।

আল কুরআন যুলকারনাইনকে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী গুণে গুণান্বিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে পৃথিবীর কতৃত্ব, রাজত্ব ও বিভিন্ন উপায়-উপকরণ দান করেছিলেন। তিনি এসব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পরিভ্রমণের মধ্যে অন্যতম একটি দিক ছিল দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসী ইয়াজুজ-মাজুজের হিংস্রতা ও ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে সাধারণ মানুষের জন্য প্রাচীর নিমার্ণ করা।

যুলকারনাইন ইবরাহিম (আ.) এর হাতে ইসলাম কবুল করেন এবং ইসমাঈল (আ.) এর সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বাদশাহ। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা উপদেশ দিতেন, তিনিও সে উপদেশ গ্রহণ করতেন। তাঁকে আল্লাহ ভালবাসতেন, তিনিও আল্লাহকে ভালবাসতেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করতেন। তিনি তাঁর শাসনাধীন রাজ্যসমূহে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যুলকারনাইন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ের আরব ও অনারবের সকল রাজা, বাদশাহ তাঁর অনুগত ছিলেন। তিনি মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত

প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সকল জাতির ভাষাজ্ঞান ছিল। তিনি যখন কোন জাতির সাথে যুদ্ধ করতেন তাদের ভাষায় তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হতেন।

যুলকারনাইনের পূর্ণ জীবনই ছিল আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের পথে মেহনত, মানব-সেবা, ত্যাগ ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবনপথের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ৫শ বছর রাজত্ব করার পর দুমাতুল জান্দাল নামক জায়গায় তিনি ইন্তিকাল করেন। দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত তাঁর লোহা-তামার সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত প্রাচীর অনন্ত কাল ধরে তাঁর স্মৃতির সাক্ষী হয়ে থাকবে।

সর্বোপরি, এটি একটি জ্ঞান গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক বিষয়। আধুনিক ইতিহাসে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে যুলকারনাইন সম্পর্কে অনেক তথ্য, উপাত্ত ও অজানা তথ্যের উন্মেষ ঘটানো হয়েছে। যুলকারনাইনের পরিচয়, জীবনী ও কল্যাণমুখী জনহিতকর কর্মসমূহ, রাজ্য বিজয়, শাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অলৌকিক কার্যাবলী আলোচনার মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য আলোচ্য গবেষণাকর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে এই গবেষণাকর্মটি আধুনিক ইতিহাসে যুলকারনাইনের উদঘাটনের দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে। তাঁর জীবনী অনুসরণ ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যে কোনো গবেষক এ বিষয়টি আরও উন্নত, ফলপ্রসূ গবেষণা করে দেশ ও জাতির খেদমতে পেশ করতে পারবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন ও তাফসীর

১. আল কুরআনুল কারীম [বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ]

২. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত -তাবারী — *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন* (বৈরূত: মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.)।

৩. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইব্‌ন কাছীর — তাফসীরুল কুরআনিল আজীম (বৈরূত: দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.)।

৪. তাফসীর ইবনে কাসীর (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.)।

৫. আল্লামা আবুল ফযল সিহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আল আলুসী — রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনুল আজীম ওয়া আস সাবউল মাসানী, ১২তম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.)।

৬. শায়েখ আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন নাফসী — তাফসীরে নাফসী (বৈরূত: দারুল কাতিবিল আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি.)।

৭. আব্দুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে আস সাদী — তাফসীরুস সাদী (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.)।

৮. আল্লামা ইবনুল আরাবী — *আহকামুল কোরআন* (কায়রো: ইসা আল বারী আল হালবী এন্ড কোং, ১৯৬৯ খ্রি.)।

৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী — *তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন*, (মদীনা মোনাওয়ারা : বাদশাহ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)।

১০. শায়েখ সাইয়েদ মুঈনুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল হাসানী আল হুসাইনী আল ইজী আশ শাফিয়ী — জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১ম খণ্ড (পাকিস্তান: ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.)।

১১. দারুযাহ মুহাম্মদ ইয্‌যাত — আত তাফসীর আল হাদীস, ৫ম খণ্ড (কায়রো: দারু ইহইয়াইল আল কুতুবিল আরাবী, ১৩৮৩ হি.)।

১২. আবু জাফর আত তাবারী — *তাফসীরে তাবারী* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.)।

১৩. আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী ও জালালুদ্দিন সুয়ুতী — *তাফসীরে জালালাইন*, ৫ম খণ্ড (আল মাকতাবাহ আশ শামেলাহ)।

১৪. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবী বকর ইবনে ফারাহ আল কুরতুবী — তাফসীরুল কুরতুবী (আল মাকতাবাহ আশ শামেলাহ), ১১তম খণ্ড।

১৫. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল আন্দালুসী — তাফসীরুল বাহরিল মুহিত (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড।

১৬. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী — তাফসীরে মাযহারী, ৭ম খণ্ড (ঢাকা: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.)।

১৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী — *সহীহুল বুখারী* (বৈরূত: দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.)।

১৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী — *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারুল জাবাল, তা.বি.)।

১৯. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস সিজিস্তানী — *সুনানে আবী দাউদ* (বৈরূত: মাকতাবুল আসরিয়্যাহ, তা.বি.)।

২০. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী — *সুনানে তিরমিযী* (বৈরূত: দারুল গুরুব আল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.)।

২১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল কাযভীনী — *সুনানে ইবনে মাজাহ* (হালব: দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল আরাবিয়্যাহ, তা.বি.)।

২২. আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন নাসায়ী — *সুনানুন নাসায়ী* (হালব: মাকতাবুল মাতলু'আতি আল ইসলামী, ১৯৮৬ খ্রি./ ১৪০৬ হি.)।

২৩. মালিক ইব্ন আনাস — *আল মুয়াত্তা* (বৈরূত: মুয়াছ্ছাছাতু যায়িদ ইব্ন সুলতান আন নিহইয়ান, ১৪২৫ হি.)।

২৪. ইমাম আমদ ইব্ন হাম্বল — *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূত: মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি. / ২০০১খ্রি.।

২৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী — *আদাবুল মুফরাদ* (বৈরূত: দারুল বাসায়ির আল ইসলামী, ১৯৮৯ খ্রি./১৪০৯ হি.)।

২৬. আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন নাসায়ী — *সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী* (হালব: মাকতাবুল মাতলু'আতি আল ইসলামী, ১৯৮৬ খ্রি./১৪০৬ হি.)।

২৭. আল হাকিম মুহামুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ — *আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন* (বৈরূত: দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./১৯৯০ খ্রি.)।

২৮. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ আবু হাতিম আত্তামিমী আল বাসাতি — *সহীহ ইবনি হিব্বান* (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি./১৪১৪ হি.)।

২৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্ন খুযায়মা — *সহীহ ইবনি খুযায়মা* (বৈরূত: আল মাকাতাবুল ইসলামী, তা.বি.)।

৩০. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বাকর আল বায়হাকী — *শু'আবিল ঈমান* (রিয়াদ: মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.)।

৩১. আহমাদ ইব্ন হুসাইন আবু বাকর আল বায়হাকী — *আস সুনানুল কুবরা* (বৈরূত: দারুল কিতাব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.)।

৩২. সুলায়মান আহমাদ ইব্ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত তিবরানী — *আল মুজামুল কাবীর* (কাহেরাহ: মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.)।

৩৩. সুলায়মান আহমাদ ইব্ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত তিবরানী — *আল মুজামুল আওসাত* (কাহেরাহ : দারুল হারামাইন, তা.বি.)।

৩৪. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত তিবারানী — *আল মুজামুস সগীর* (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫ খ্রি.)।

৩৫. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ দারিমী — *সুনানুদ দারিমী* (সৌদি আরব: দারুল মুগনী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪১২হি./২০০০খ্রি.)।

৩৬. আবু ইয়া'লা আহমাদ ইব্ন আলী আল মাওসিলী — *আল মুসনাদ* (বৈরূত: দারুল মামুন লিত তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪খ্রি.)।
৩৭. আবু ইয়ায়লী আহমাদ ইব্ন আলী আল মাওছিলী — *আল মুজামু আবূ ইয়ায়লী আল মাওছিলী*, (ফায়সালাবাদ : ইদারাতুল উলুম আল উছরিয়্যাহ, ১৪০৭হি.)।
৩৮. আবু নাঈম আহমাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ — হুলইয়াতুল আওলিয়া (বৈরূত: দরুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯হি.)।
৩৯. ইব্ন আবী শায়বা — *আল মুসন্নাফ* (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.)।
৪০. আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আশ শামী, — *শারহুস সুন্নাহ* (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি./১৯৮৩খ্রি.)।
৪১. আলী ইব্ন হিসামুদ্দীন — *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল*, (বৈরূত: মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি.)।
৪২. শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আয যাহাবী — *আদ দীনার মিন হাদীসিল মাশায়িখিল কিবার* (কাহিরা : মাকাতাবুল কুরআন, তা.বি.)।
৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন আলী আশ শাওকানী — *ফাতহুল কাদীর* (বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ১৪১৪ হি.)।
৪৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী — *উমদাতুল ক্বারী* (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৯৭৯খ্রি.)।
৪৫. আল্লামা ইব্ন হাজার অসকালানী — *ফাতহুল বারী* (আল কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫২ খ্রি.)।
৪৬. ইমাম মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর — *আন নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস আল আছার* (বৈরূত: আলা মাকাতাবুল আছরিয্যাতুছাইদা ২০০৮খ্রি.)।
৪৭. আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইব্ন আবু বকর আল হায়সামী — *মাজমাউয যাওয়ায়িদ* (কায়রো: মাকতাবুল কুদসী, ১৪১৪হি./১৯৯৪ খ্রি.)।
৪৮. শায়েখ রাগিব আল ইস্পাহানী — আল উযমাহ (রিয়াদ: দারুল আসিমাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.)।

সিরাত

৪৯. ইব্ন হিশাম, — *আস সিরাহ্ আন নাবাবিয়্যাহ* (দামেশ্ক: দারুল খাইর, ১৯৯৯ খ্রি.)।
৫০. অধ্যাপক এ.টি.এম মুসলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত — *সীরাত বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.)।
৫১. তফাজ্জল হুসাইন — *হযরত মুহাম্মাদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট ১৯৯৮ খ্রি.)।
৫২. আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসীর আদ দামেশকী — আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০১৯ খ্রি.)।
৫৩. — আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ঢাকা: ইফাবা, ১ম প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রি.)।
৫৪. জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী — আস-সামারিখী ফী ইলমিত তারিখ (বৈরূত:

মাকতাবাতুল আদব, তা.বি.)।

অভিধান

৫৫. আব্দুল আজীজ সাইয়্যেদুল আহলী — *কামূছুল কুরআন আও ইছলাহুল ওয়াজূহি ওয়ান নজায়িরি ফিল কুরআনিল কারীম* (বৈরূত: দারুল উলুম লিল মালায়ীন, ১৯৮০ খ্রি.)।

৫৬. শাইখ কামেল মুহাম্মদ আল জাযযার — *আল মু'জামুল ফারীদ লিমাআনী কালিমাতি কুরআনিল মাজীদ* (কায়রো: দারুত তাওযী ওয়ান্নশরিল ইসলামিয়া, ২০০৬ খ্রি.)।

৫৭. জুবরান মাসউদ — *আর রায়িদু মু'জামুন আলিফবাইয়্যুন ফিল লুগাতি ওয়াল আলাম* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২০০৫ খ্রি.)।

৫৮. ইব্রাহীম ইব্ন আস সুরী আবূ ইসহাক আয যুজাজ — *না'আমিল কুরআন ওয়া ইরাবুহূ* (বৈরূত: আলিমুল কুতুব, ১৪০৮হি./১৯৮৮ খ্রি.)

৫৯. আবু আব্দুল্লাহ 'আমির আব্দুল্লাহ ফলিহ — *মু'জামু আলফাজিল আকিদাহ* (রিয়াদ : মাকতাবুল উলীবাহ, ১৪১৭হি./ ১৯৯৭ খ্রি.)।

৬০. ড. রুহী বা'আলা বাক্কী — *আল মাওরিদ* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৫ খ্রি.)।

৬১. ইবনে মানযুর, মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম আল আফরীকী — *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩খ্রি./ ১৪১৩হি.)।
লিসানুল আরব (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রি.)।

৬২. আহমদ মুখতার আব্দুল হামিদ — আল মু'জামু লুগাতিল আছরিয়্যাহ মু'আছারাহ (বৈরূত: আলিমুল কুতুব ১৪২৯হি./২০০৮খ্রি.)।

৬৩. ইবন রুশদ আল হাফীদ — *বিছায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ* (বৈরূত: দারুল মারিফাহ, ১৯৭৮ খ্রি.)।

৬৪. শামছুদ্দীন আল রামেলী — *নেহায়েত আল মুহতাজ আল শরহিল মিনহাজ*, ৭ম খণ্ড (মিশর: মুস্তফা আল বাবী আল হালবী লাইব্রেরী ও প্রেস, ১৩৮৭ হি.)।

৬৫. আমর বিন হজম — *আল মুহাল্লা*, ১১তম খণ্ড (মিশর : আল জামহুরীয়া আরাবীয়া প্রেস, ১ম সং, ১৩৮৭ হি./ ১৯৭০ খ্রি.)।

৬৬. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত) — *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১ খ্রি.)।

৬৭. আবু তাহের মেসবাহ — *আল মানার* (ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.)।

৬৮. জুবাঈদী — *তাজুল উরুস* (মিশর: আল খাইরীয়া প্রেস, ১৩০৬ হি.)।

৬৯. শামছুদ্দীন রামলী — *মিহায়াতুল মুহতাজ* (মিশর : মুস্তফা বাবী হালবী লাইব্রেরী, ১৩৮৯ খ্রি.)।

৭০. ইবরাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য — *আল মুজামুল ওসীত* (কায়রো: দারুদ দাওয়াহ, তা.বি.)।

৭১. — *আল মুনজিদ ফীল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল*

মুফাছ্ছারাহ (বৈরূত: দারুল মাশায়িক, ২০০১ খ্রি.)।

৭২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস — *সংসদ বাংলা অভিধান* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩তম সং, ২০০৯ খ্রি.)।

আরবি গ্রন্থসমূহ

৭৩. মুহাম্মদ খয়রু রমাদান ইউসুফ — যুলকারনাইন আল ক্বাইদ আল ফাতেহ ওয়াল হাকেমুস সালেহ দিরাসাতান তাহলিলিয়্যাতান মুকারাতান আলা দুইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াত তারিখ (দামেশক: দারুল ক্বলাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.)।

৭৪. মানসুর আব্দুল হাকিম — যুলকারনাইন আল মালিকুল আদিল আল্লাযি থ্বফা বিল আরদ (কায়রো: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮০ খ্রি.)।

৭৫. আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী — আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন (কায়রো: আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাতি লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.)।

আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন (সৌদি আরব: মাজমুউল মালাকি ফাহাদ, ১ম সংস্করণ, তা.বি.)।

৭৬. মান্না আল কাত্তান — মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন (কায়রো: মাকতাবাতু ওহাবাহ, তা.বি.)।

৭৭. ড. সুবহী সালিহ — মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন (বৈরূত: দারুল ইলমি লিল মালায়িন, ১০ম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি.)।

৭৮. রাগিব আল-ইসফাহানী — আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, তা. বি.)।

৭৯. আহমাদ মোল্লাজিওন — নূরুল আনোয়ার (পাকিস্তান: জামি'আ ইসলামিয়া, তা.বি.)।

৮০. মুহাম্মদ আলী সাবুনী — আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন (পাকিস্তান: মাকতবাতুল বুশরা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.)।

৮১. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী — **মাদারেজুন নবুওয়াত**, অনু. মাওলানা মমিনুল হক (ঢাকা: সিরহিন্দ প্রকাশনা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি)।

৮২. আয-যারকাশী, আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে বাহাদুর — **আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন**, সম্পা. মুহাম্মাদ আবুল ফযল (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৩৯১ হি.)।

৮৩. তাহের আল-কুরদী — তারিখুল কুরআনিল কারীম, সম্পা. মুস্তফা মুহাম্মাদ ইয়াগমুর (জেদ্দা: মাকতাবাতুল ফাতহ, ১৯৪৬ খ্রি.),

৮৪. তাক্বী উসমানী — 'উলূমুল কুরআন (করাচি: মাকতাবা দারুল উলুম, ২০১২ খ্রি.)।

৮৫. জিয়াউদ্দীন বারানী — তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ১ম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.)।

৮৬. আহমদ মা'আরুফ আল-উসায়রী — মুজিযুত তারিখীল ইসলামী মুনজু আদম আলাইহিস সালাম ইলা আসরিনাল হাদীর (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মুলুক, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.),

৮৭. উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাসীর — *কিতাবু উনওয়ানুল মাজীদ* (সৌদি আরব: মাতবাআতু দারাতুল মালেক আব্দুল আজিজ, ১৯৮২ খ্রি.)।

৮৮. আহমদ শিবলী — *আত তারিখ আল ইসলামী* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.)।

বাংলা বই পুস্তক

৮৯. মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি — *কাসাসুল কুরআন*, ১ম খণ্ড (লাহোর: মুশতাক বুক কর্ণার, তা.বি.)।

৯০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ — আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সপ্তদশ সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.)।

৯১. মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি — *কাসাসুল কুরআন*, অনু. মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ২০১৫ খ্রি.)।

৯২. মাওলানা মুহাম্মদ শামছুল হক, — *হযরত সোলায়মান (আঃ) ও যুলকারনাইনের জীবনী* (ঢাকা: মাতাবাতুস সোলায়মান, ১ম সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.)।

৯৩. আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ লুৎফুল আলম (রহ.) — কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.)।

৯৪. ইমরান হোসেন নযর — ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক যুগে ইয়াজুজ ও মাজুজ (ঢাকা: মুসলিম ভিলেজ, ৩য় সংস্করণ, ২০২০ খ্রি.)।

৯৫. শাইখ খালিদ আর রাশিদ — প্রতীক্ষিত মাহদী দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ (ঢাকা: হাসানাহ পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ২০২০ খ্রি.)।

৯৬. আল্লামা ইবনে কাসীর ও মাওলানা হিফযুর রহমান — সহজ কাসাসুল আম্বিয়া, সম্পা. হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: আল কাউসার প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.)।

৯৭. সম্পাদনা পরিষদ — ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), ৮ম খণ্ড,

৯৮. ড. এম. দেলওয়ার হোসেন — ইতিহাসতত্ত্ব (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭ খ্রি.)।

৯৯. মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া — ইতিহাসতত্ত্ব (ঢাকা: আবিস্কার পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ২০১৯ খ্রি.)।

১০০. ড. মো: আখতারুজ্জামান — মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি.)।

১০১. মো: আয়েশ উদ্দিন — রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.)।

১০২. মোবাশ্বের আলী — গ্রীসের ঐতিহাসিক (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রি.)।

গ্রীসের ইতিহাস (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০১৭

খ্রি.)।
১০৩. মো: রমজান আলী আকন্দ — ইতিহাস পরিচিতি (ঢাকা: প্রগতি পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.)।
১০৪. শাহেদ আলী — ইতিবৃত্ত (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২য় সংস্করণ, ২০১৮ খ্রি.)।
১০৫. অশীনদাস গুপ্ত — ইতিহাস ও সাহিত্য (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯ খ্রি.)।
১০৬. আবুল হোসেন ভট্টাচার্য — ইতিহাস কথা কয় (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ১ম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.)।
১০৭. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, কাসিম আবদুল্লাহ ইবরাহিম, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সালিহ — ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা: মুহাম্মদ পাবলিকেশন, ২০২২ খ্রি.)।

ইংরেজী গ্রন্থ

১০৮. Sailendra Biswas — *Samsad English Bangla Dictionary* (Calcata: Shahitha Songsod, 22nd edition, 1988 AD).
১০৯. Abdullah Yousuf Ali, — The English Translation and Meanings of the Holy Quran, (USA: The Institute of Islamic Knowledge, 1997),
১১০. R. Flint — *History of Philosophy of History* (New York, 1894)
১১১. C.H. Oman — *On the Writing of History* (New York, 1939)
১১২. R.G. Collingwood — *The Idea of History* (London: Oxford Paperbacks, 1973)
১১৩. E.H. Carr — *What is History* (Cambridge: a Pelican Book, 1961)
১১৪. Ibn Khaldun — *The Muqaddimah* (United State: Princeton University Press, 1st Princeton Classics edition, 2015)

পত্র-পত্রিকা

১১৫. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
১১৬. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।
১১৭. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।
১১৮. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা।
১১৯. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা।
১২০. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

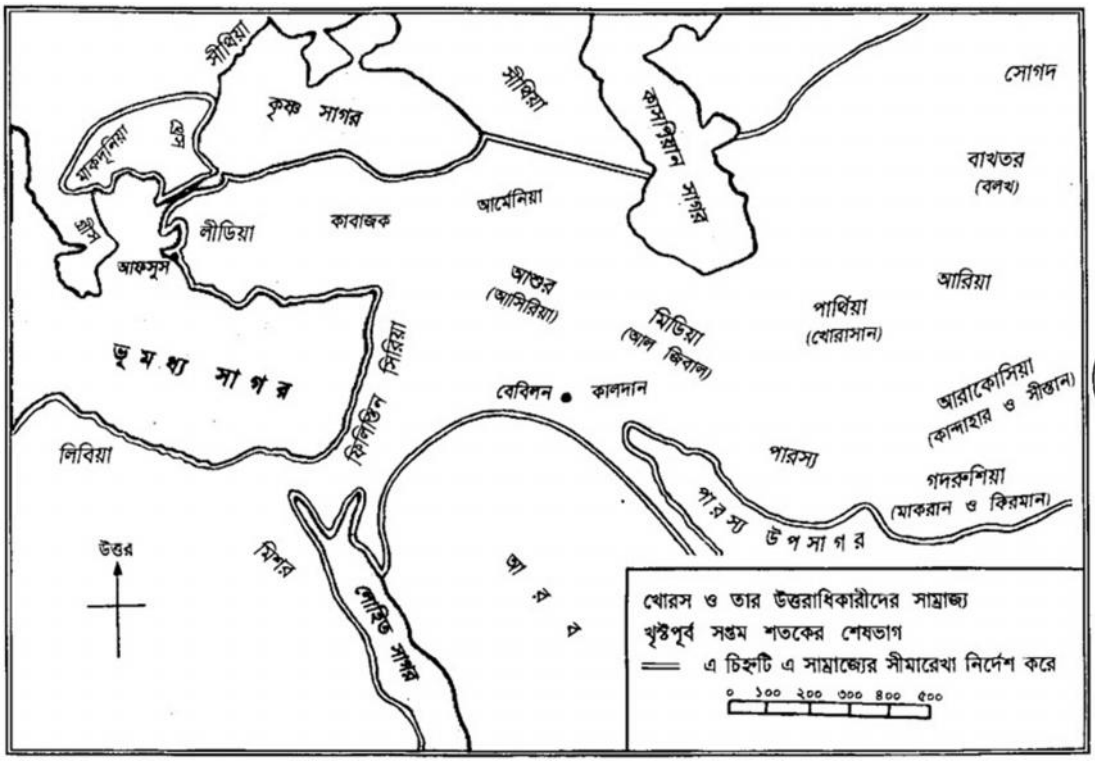

যুলকারনাইনের কাহিনী সংক্রান্ত মানচিত্র

Silver tetradrachm of Alexander the Great shown wearing the horns of the ram-god Zeus-Ammon.

রাশিয়ার ডারবেন্টের ক্যাস্পিয়ান গেট, সাসানিড পার্সিয়ানদের দ্বারা নির্মিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ; যাকে আলেকজান্ডারের গেটস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। [সূত্র: উইকিপিডিয়া, যুলকারনাইন]

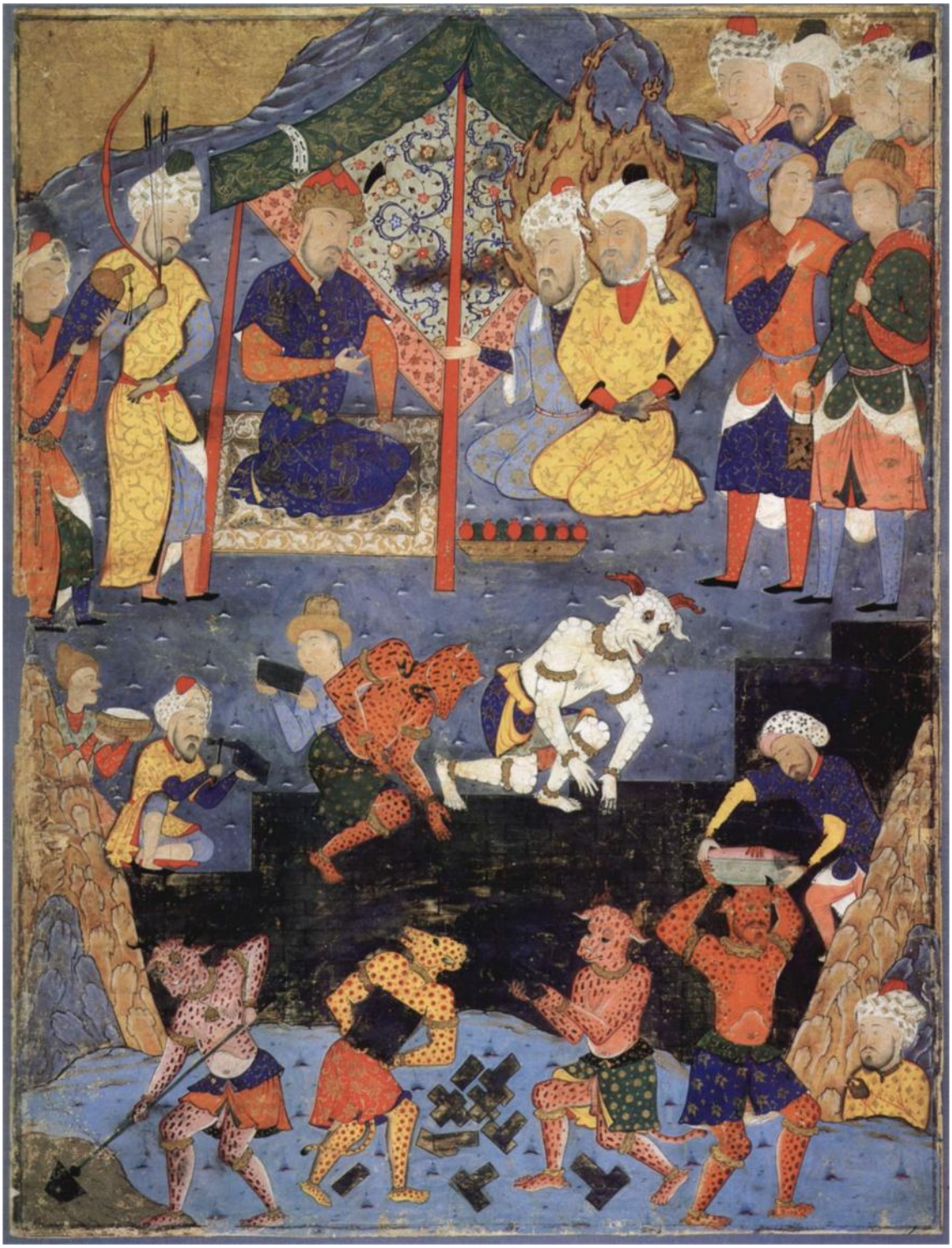

যুলকারনাইন ইয়াজুজ ও মাজুজকে দূরে রাখার জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। ফালনামার 'ফার্সি মিনিয়েচা' বই থেকে সাফাভিদ শাহ তাহমাস্পস (১৫২৪-১৫৭৬) অনুলিপিটি সংগ্রহ করেন। যা বর্তমানে Chester Beatty Library, Dublin এ সংরক্ষিত। [সূত্রঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Dhu_al-Qarnayn]

The relief of a winged genie, or according to some scholars, Cyrus the Great, in Pasargadae. The two horns of the Hemhem crown have been related to the name "Dhu al-Qarnayn".

[Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Dhu_al-Qarnayn]

দারিয়াল গিরিখাত: যা জর্জিয়া ও রাশিয়ার সীমন্তবর্তী তেরেক নদীর তীরে অবস্থিত। এটি আইবিরিয়ান গেঁস বা ককেশীয় গেঁস নামেও পরিচিত। জোসেফাস লিখেছেন যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট একটি অজানা পাস বা উপত্যকায় লোহার গেট তৈরি করেছিলেন। যা দ্বারা ল্যাটিন এবং গ্রিক লেখক দরিয়ালকে চিহ্নিত করেছেন। এটি ১৩ কিলোমিটার (৮.১ মাইল) দীর্ঘ এবং কিছু কিছু জায়গায় এটি ১৮০০ মিটার খাড়া (৫৯০০ ফুট) লম্বা হতে পারে। [সূত্র: উইকিপিডিয়া/দারিয়াল গিরিখাত]